বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

কোর্স কোড : SSC 2681

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) প্রোগ্রাম

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

কোর্স কোড : SSC 2681

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) প্রোগ্রাম

রচনায়

ড. ইকবাল হুসাইন
মো. আব্দুস সাত্তার
সুদীপ রায়
তপন কুমার পালিত
ড. মোঃ জাকিরুল ইসলাম
শাহীনা আক্তার
মারুফ মিয়া
রণজিত কুমার নাথ

সম্পাদনায়

ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
ড. আশফাক হোসেন
মেসবাহ-উস-সালেহীন
ড. প্রিয়ব্রত পাল
ড. শান্তনু মজুমদার

সমন্বয়কারী

ড. ইকবাল হুসাইন
ওপেন স্কুল, বাউবি

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

কোর্স কোড : SSC 2681
এসএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : জুলাই-২০১৭
পুনঃমুদ্রণ : মার্চ-২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২৫
(বাউবি কর্তৃক গঠিত ‘বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটি’র তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত)

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শরিফুল ইসলাম

© **বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

ISBN : 978-984-34-3137-0

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
মোল্লা প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
হাসেম রোড, মাতুয়াইল, ঢাকা।

সূচিপত্র

ইউনিট- ১ : ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় ---১-২৭

পাঠ-১.১ : ভাষা আন্দোলনের পটভূমি -- ২

পাঠ-১.২ : ভাষা আন্দোলন -- ৪

পাঠ-১.৩ : পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি -- ৮

পাঠ-১.৪ : ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন --১২

পাঠ-১.৫ : সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫) ---১৬

পাঠ-১.৬ : ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন ---২০

পাঠ-১.৭ : উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান---২২

ইউনিট- ২ : ১৯৭০ এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ--- ২৮-৫৩

পাঠ-২.১ : ১৯৭০ সালের নির্বাচন--২৯

পাঠ-২.২ : অসহযোগ আন্দোলন -- ৩২

পাঠ-২.৩ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা -- ৩৬

পাঠ-২.৪ : প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধ---৪০

পাঠ-২.৫ : মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা---৪৪

পাঠ-২.৬ : মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত ---৪৯

পাঠ-২.৭ : স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ --৫১

ইউনিট- ৩ : সৌরজগৎ ও ভূ-মণ্ডল ---৫৪-৭৩

পাঠ-৩.১ : সৌরজগৎ এবং গ্রহসমূহ -- ৫৫

পাঠ-৩.২ : পৃথিবী ও এর আকৃতি-- ৫৮

পাঠ-৩.৩ : অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা -- ৬২

পাঠ-৩.৪ : স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা --- ৬৫

পাঠ-৩.৫ : পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি-- ৬৮

পাঠ-৩.৬ : জোয়ার-ভাটা-- ৭১

ইউনিট- ৪ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু---৭৪-৯৫

পাঠ-৪.১ : ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা --৭৫

পাঠ-৪.২ : ভূ-প্রকৃতি--- ৭৭

পাঠ-৪.৩ : ভূমি ব্যবহার---৮১

পাঠ-৪.৪ : বাংলাদেশের জলবায়ু-- ৮৬

পাঠ-৪.৫ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ -- ৮৯

ইউনিট- ৫ : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদ--৯৬-১১৭

পাঠ-৫.১ : নদী ব্যবস্থা ---৯৭

পাঠ-৫.২ : নদ-নদী ও জনবসতি ---১০১

পাঠ-৫.৩ : পানি ও মৎস্য সম্পদ --১০৪

পাঠ-৫.৪ : বনজ সম্পদ ---১০৭

পাঠ-৫.৫ : খনিজ সম্পদ --১১০

পাঠ-৫.৬ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব --১১৪

ইউনিট- ৬ : বাংলাদেশে পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ -- ১১৮-১২৯

পাঠ-৬.১: পরিবারের ধারণা ও ধরন ---১১৯

পাঠ-৬.২: বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো -- ১২২

পাঠ-৬.৩: সামাজিকীকরণের ধারণা ও এর বাহনসমূহ--১২৪

পাঠ-৬.৪: সামাজিকীকণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা --১২৭

ইউনিট- ৭ : রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন-- ১৩০-১৪৩

পাঠ-৭.১: রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি ---১৩১

পাঠ- ৭:২: নাগরিকতা--- ১৩৪

পাঠ- ৭.৩: আইন --- ১৩৭

পাঠ- ৭.৪: সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা -- ১৩৯

পাঠ- ৭.৫: বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ---১৪১

ইউনিট- ৮ : বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা --১৪৪-১৫৯

পাঠ- ৮.১: আইন বিভাগ ---১৪৫

পাঠ- ৮.২: নির্বাহী বা শাসন বিভাগ --১৪৭

পাঠ- ৮.৩: বিচার বিভাগ ---১৪৯

পাঠ- ৮.৪: সরকারের তিন বিভাগের সম্পর্ক-- ১৫২

পাঠ- ৮.৫: কেন্দ্রীয় প্রশাসন---১৫৪

পাঠ- ৮.৬: বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি --- ১৫৬

ইউনিট- ৯ : বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন ---১৬০-১৭১

পাঠ- ৯.১: গণতন্ত্র ---১৬১

পাঠ- ৯.২: রাজনৈতিক দল -- ১৬৪

পাঠ- ৯.৩: বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন --১৬৬

পাঠ- ৯.৪: নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি --- ১৬৮

ইউনিট- ১০ : জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ---১৭২-১৭৯

পাঠ- ১০.১: জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি--- ১৭৩

পাঠ- ১০.২: বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ ---১৭৫

পাঠ- ১০.৩: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা--------------------------------------১৭৭

ইউনিট- ১১ : জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ---------- ১৮০-১৯৫

পাঠ ১১.১: জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ের বণ্টন ---------- ১৮১

পাঠ ১১.২: জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ ---------- ১৮৫

পাঠ ১১.৩: বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন ---------- ১৮৭

পাঠ ১১.৪: বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ---------- ১৯২

ইউনিট- ১২ : অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি ---------- ১৯৬-২১৭

পাঠ ১২.১: মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন ---------- ১৯৭

পাঠ ১২.২: মাথাপিছু আয়ের ধারণা ---------- ১৯৯

পাঠ ১২.৩: দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহ ---------- ২০১

পাঠ ১২.৪: বিভিন্ন দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা ---------- ২০৪

পাঠ ১২.৫: বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ---------- ২০৬

পাঠ ১২.৬: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ ---------- ২০৯

পাঠ ১২.৭: উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি ---------- ২১২

পাঠ ১২.৮: উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ---------- ২১৫

ইউনিট- ১৩ : বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা ---------- ২১৮-২২৯

পাঠ ১৩.১: সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ও বাংলাদেশ সরকারের আয়-ব্যয় ---------- ২১৯

পাঠ ১৩.২: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ---------- ২২১

পাঠ ১৩.৩: বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ---------- ২২৩

পাঠ ১৩.৪: দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা ---------- ২২৬

ইউনিট- ১৪ : সামাজিক পরিবর্তন ---------- ২৩০-২৩৯

পাঠ ১৪.১: সামাজিক পরিবর্তন ---------- **২৩১**

পাঠ ১৪.২: সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ ---------- **২৩৩**

পাঠ ১৪.৩: সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব ---------- **২৩৬**

ইউনিট- ১৫ : সামাজিক সমস্যা ---------- ২৪০-২৫০

পাঠ ১৫.১: সামাজিক সমস্যা ---------- **২৪১**

পাঠ ১৫.২: সামাজিক সমস্যার কারণ ---------- **২৪৩**

পাঠ ১৫.৩: সামাজিক সমস্যার ধরন ---------- **২৪৫**

পাঠ ১৫.৪: সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায় ---------- **২৪৭**

<u>মানবণ্টন</u>

পূর্ণমান : ১০০

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় **কোর্স কোড : SSC 2681**

১) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন – ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)

০৯টি প্রশ্ন হতে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ নম্বর।

প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

ক. জ্ঞানমূলক
খ. অনুধাবনমূলক
গ. প্রয়োগমূলক
ঘ. উচ্চতর দক্ষতামূলক

২. বহুনির্বাচনী (নৈর্ব্যক্তিক/MCQ) প্রশ্ন – ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)

৪০টি প্রশ্ন থাকবে, সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় **কোর্স কোড : SSC 2681**

জাতীয় জীবনের উন্নয়নে ও গতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ও প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সমকালীন চাহিদা ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প নেই। এ বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে *বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়* বইটি।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে এসএসসি প্রোগ্রামের স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে *বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়* বইটি রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণে বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্সবইটি মোট ১৫ টি ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিট আবার কতগুলো পাঠে বিন্যস্ত। প্রতিদিন গড়ে একটি করে পাঠ অধ্যয়ন করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কোর্সটি সম্পন্ন হবে।

প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা এবং পাঠসমূহের শিরোনাম দেয়া হয়েছে। ইউনিটটি অধ্যয়নে ক'দিন ব্যয় হবে তা ও ইউনিটের শুরুতে বলা আছে। প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি না শিক্ষার্থী তা যাচাই করতে পারবেন। প্রতিটি পাঠের শেষে ঐ পাঠের সার-সংক্ষেপ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন এবং ইউনিটের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়নে সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

কোর্সটি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীরা যাতে এ বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল:

- ইউনিটের শিরোনাম, ভূমিকা এবং পাঠ-শিরোনাম পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- কোনো পাঠের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হবে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। কঠিন বিষয়গুলো আয়ত্ত করার জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- বিষয়বস্তু ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি পাঠে "শিক্ষার্থীর কাজ" সংযোজন করা রয়েছে। পাঠের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে "শিক্ষার্থীর কাজ" সম্পন্ন করুন।
- অধ্যয়ন শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন এবং ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। চূড়ান্ত মূল্যায়নে সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এগুলোও সঠিকভাবে অনুশীলন করুন। প্রয়োজনে আপনার স্টাডি সেন্টারের টিউটর এবং সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন। দেখবেন সমাধানের পথ সহজ হয়ে গেছে।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সব আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে পরিচিত হতে হবে। এতে পূরো কোর্স-মডিউল এর কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং কোনটি উত্তরমালা সে সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এ পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	শিক্ষার্থীর কাজ	সারসংক্ষেপ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

কোর্স সমাপ্তির সময়	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮৫ দিন**

অডিও/ভিডিও	**শিক্ষার্থীবন্ধুরা,** বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের *বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়* কোর্সটি নতুন প্রণীত। এ কোর্সের ভিডিও প্রোগ্রাম প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অচিরেই এ কোর্সের ভিডিও প্রোগ্রাম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হবে। কোর্স সংশ্লিষ্ট ভিডিও-অডিও প্রোগ্রাম বাউবি-টিউব, বাউবি'র ওয়েব টিভি এবং ওয়েব রেডিও'তেও নিয়মিত প্রচারিত হয়। বাউবি'র ওয়েব সাইটে কোর্সটির 'ই-বুক' রয়েছে। উল্লিখিত মাধ্যমগুলোর যেকোনোটি থেকে আপনি আপনার শিখন প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ করতে পারেন।

সহায়তা প্রয়োজন হলে পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:	**আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স-টিউটর** **অথবা,** **ড. ইকবাল হুসাইন** ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয়

ইউনিট
১

ভূমিকা

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করাকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বাধিকারের প্রশ্নে এই অঞ্চলের জনগণকে শুরুতেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে সংকটের শুরু। ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষার অধিকার আদায় করতে গিয়ে শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। তাদের রক্তের বিনিময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অর্জন করে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার অধিকার। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নীতির কোনো পরিবর্তন হয় নি। ফলে স্বাধিকার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। এরই পথ ধরে ছয় দফা ও এগার দফার আন্দোলন বিকশিত হয়। ধারাবাহিক পরিণতিতে সংঘটিত হয় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১: ভাষা আন্দোলনের পটভূমি
পাঠ-১.২: ভাষা আন্দোলন
পাঠ-১.৩: পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি
পাঠ-১.৪: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন
পাঠ-১.৫: সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫)
পাঠ-১.৬: ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন
পাঠ-১.৭: উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-১.১ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও তাদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উর্দু, বাংলা, তমদ্দুন মজলিস, রোমান হরফ

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান ছিল। কিন্তু এত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি এসময়ে পূর্ব বাংলায় গঠিত বিভিন্ন সংগঠনও এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে *তমদ্দুন মজলিশ* গঠিত হয়। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল বাঙালির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন যা এই আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি

ভাষার ওপর আঘাত একটি জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতেরই শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত করা হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে জনগণকে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সাংস্কৃতিক প্রশ্ন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো পরের দিকে গুরুত্ব পেয়েছিল বেশি। বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলনের মুখে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি এবং কবি গোলাম মোস্তফাকে সম্পাদক করে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে। দেড় বছর ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার প্রচুর সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয়। নতুন ভাষার নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা'। কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নকে কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়। এ সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহ্বান জানায়। এই রিপোর্টটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পছন্দ হয় নি বলেই তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে শুরু থেকেই যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মধ্য থেকে জন্ম নিতে থাকে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর আহ্বায়ক মনোনিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। ১৯৫১ সালে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি সংসদ' নামে আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনটি ক্রমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। সংসদের নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসত। এ সমস্ত সংগঠনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে ভাষা প্রশ্নের গুরুত্ব মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে পূর্ববাংলায় সব ধরনের উন্নতি থেমে যাবে। তমুদ্দুন মজলিশ পুস্তিকা প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় পূর্ববাংলার শিক্ষার বাহন, আইন আদালত ও অফিসের ভাষা বাংলা করতে হবে। এভাবে ভাষা আন্দোলনের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। যার শক্তির উপর দাঁড়িয়ে রূপলাভ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা শুরু করে। এ দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে তারা উর্দু করতে চায়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। এদেশের মানুষের কাছে এই অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায় মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এরই পরিণতিতে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন কোনটি?

ক) তমদ্দুন মজলিশ
খ) রেনেসাঁ সোসাইটি
গ) সাহিত্য সংসদ
ঘ) রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ

২। কার নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়?

ক) অধ্যাপক নুরুল হক ভূইয়া
খ) অধ্যাপক আবুল কাশেম
গ) মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
ঘ) কবি গোলাম মোস্তফা

পাঠ-১.২ ভাষা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ২১শে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রভাষা, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, সালাম, বরকত, রফিক

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৩৭ সাল থেকে ভাষা বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক মনোনীত হন নূরুল হক ভূঁইয়া। পরবর্তীকালে এ উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আশ্বাস দেন যে, মানি অর্ডার, ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজি-উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় লেখা হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্যে হতে 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সদস্যদের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়। এই সংবাদ ঢাকায় পৌছুলে এদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন।

২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। শুরু হয়ে যায় একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি। নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন তীব্রতর হলে নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনে রাজি হন। কিন্তু ৬ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। পরিষদের বিরোধী দলের প্রতিবাদের ফলে প্রস্তাবটি পরিষদে উত্থাপিত হলেও বাস্তবায়ন হয় নি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কঠোর নীতি

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন 'উর্দুই এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। আন্দোলনকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনমনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এ সময়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। তখনও ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন কর্মসূচি

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়কে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। এই সময়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আকরাম খানকে সভাপতি করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি গঠনের প্রতিবাদ জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদে সভাসমাবেশ চলতে থাকে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের এক উক্তিকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপলাভ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন

খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনিও জিন্নাহর মতো ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। এবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ৩১ জানুয়ারি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকার আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার কৌশল গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন আন্দোলন দমন করার জন্য ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর মাধ্যমে ঢাকায় যেকোনো প্রকার সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা সরকারি এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নিতে পারে নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলে সভা করে তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আবদুল মতিন, ওলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতারা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে জোড়ালো মত দেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বর) ছাত্রদের সমাবেশে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগ দেয়।

সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিকেলে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভার দিকে প্রতিবাদ মিছিল অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। মাতৃভাষার দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন– আবুল বরকত, আবদুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার এবং আহত হন কয়েকজন ছাত্রীসহ অনেকে। সে সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা শহীদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও

কয়েকজন শহীদ হন। অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেই স্থানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩ ফেব্রুয়ারিতে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে।

পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফুলার রোডে একজন কিশোর নিহত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ডা. সাঈদ হায়দারের নকশা অনুসারে রাতে মেডিকেল কলেজের গেইটের সামনে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি তা উদ্বোধন করা হয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহীদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ১৯৭২ সালে পূর্বের নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহীদ মিনারটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষিত হয়। নিম্নে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগঠিত গণআন্দোলন। এটি শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠে নি। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। বাঙালিরা অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

দ্বিতীয়ত, ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, ভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনগণের মানসিকতা ও স্বার্থ উপেক্ষা করে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দলটি শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে। এরপর আর কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয় নি।

ভাষা আন্দোলনের শহীদগণ

চতুর্থত, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৬২ সালে সংবিধানে তা বহাল থাকে।

পঞ্চমত, যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য, ভাষা বৈষম্য তুলে ধরে। যা ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় যার প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন।

ষষ্ঠত, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ দলীয়ভাবে তাদের স্টাডি সেন্টারে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন একটি প্রভাত ফেরি আয়োজন করবে এবং প্রভাতফেরি শেষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবে।

সারাংশ

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ সময় পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজজীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসকদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ কোনো সহানুভূতি পায় নি। তাই তাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তারা হয়েছে সংঘবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে বুকের রক্ত দিয়ে। এই ঘটনা পূর্ববাংলার জনগণের মনের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকার আদায়ের সব আন্দোলনে একুশের চেতনা সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন কোথায়?
i. রমনার রেসকোর্স ময়দানে
ii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে
iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) নূরুল আমিন খ) খাজা নাজিমুদ্দিন
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) চৌধুরী খালিকুজ্জামান

৩। বর্তমান শহীদ মিনারের নকশা ও পরিকল্পনা কার?
ক) হামিদুর রহমান খ) ডা. সাঈদ হায়দার
গ) আবুল হাশিম ঘ) গোলাম মাহবুব

৪। কত খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি দেয়া হয়?
ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৯৯

সৃজনশীল প্রশ্ন

অ, আ, ক, খ আমার দুঃখীনি বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার রক্তাক্ত বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার গর্বিত বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার অহংকারী বর্ণমালা

ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে ছিলেন? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট কী? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অংশটুকু আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. আপনি কি মনে করেন যে আমার বর্ণমালা অহংকারী ও গঠিত? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১.৩ পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানি শাসকরা কীভাবে পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করার চিন্তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার জনগণ কতটা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈষম্য, পাট, চা, সেনাবাহিনী, শোষণ

ভূমিকা

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় নি। বরং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিতে পূর্ব বাংলাকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় যার সফল পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয়পদেই নিয়োগ দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব বাংলার মতামত উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এবং পরে তা ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়।

প্রশাসনিক বৈষম্য

১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের মন্ত্রীপরিষদ, পররাষ্ট্র, কৃষি, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, তথ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ৬৯ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন পাঞ্জাবি। বাঙালি ছিলেন মাত্র ৩ জন। বেসামরিক সিএসপি কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৯৪৮-৬৩ পর্যন্ত ৩৪৬ জনের মধ্যে মাত্র ১২৬ জন (৩৬.৪%) ছিলেন বাঙালি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন ২১৮ জন (৬৩.৬%)।

সামাজিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। সরকারের অর্থনৈতিক এবং পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান প্রথম থেকেই বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে দু'ধরণের সমাজজীবন পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের জীবনযাপন উন্নতমানের হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল বৈষম্যের শিকার। বাঙালিরা যাতে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে না পারে এজন্য তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগগ্রস্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যেও দামের পার্থক্য থাকতো, যাতে তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সেবার জন্য অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ফলে সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক উন্নত।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য ছিল। ক্ষমতার শীর্ষে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। তাদের এই বৈষম্যমূলক নীতি সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত বাঙালি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ক্রমশ এই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানি শাসনামলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ছিল ভয়াবহ। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নি। পূর্ববাংলা ছিল সম্পদশালী। এই সম্পদ এদেশবাসী ভোগ করতে পারত না। পাকিস্তানি শাসকরা তা ছিনিয়ে নিত। পুরো পাকিস্তানের আয়ের ৬০ ভাগ আয় হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হতে। অথচ আমাদের অঞ্চলে এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় করা হতো। আর বাকি সব নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ যেত পূর্বপাকিস্তান থেকে। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানকে আমদানি দ্রব্যের মাত্র ২৫ ভাগ দেয়া হতো।

শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তারও মালিকানা থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। কৃষি উন্নয়নের জন্য যে ঋণ পাওয়া যেত তার সিংহভাগ কৃষিভিত্তিক অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে এবং এ আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপলাভ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রেও বাঙালিরা সুস্পষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের বেলায় **১৬টি** কেন্দ্রের মধ্যে **১৩টিই** অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের ফলে **১৯৪৭-৪৮** খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় যেখানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল; সেখানে প্রায় বিশ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার পূর্ববাংলার চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। **১৯৫৫-৫৬** থেকে **১৯৬৬-৬৭** সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে ২০৮৪.৬ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ হলেও পূর্ব পাকিস্তানে করা হয়েছে মাত্র ৭৯৭.৬ মিলিয়ন রুপি অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

চাকুরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। পূর্ববাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা চাকরির প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। সিভিল, মিলিটারি ও অন্যান্য চাকরির মূল নিয়োগ দানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে নিজেদের মতো করে নীতি নির্ধারণ করা সহজ হতো। দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনীর সকল পর্যায়ের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের প্রধান দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন পূর্ববাংলার সংবাদপত্রে দেয়াই হতো না। এ ছাড়াও মনোনয়ন বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হতেন পশ্চিম পাকিস্তানি। এসব কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পক্ষে উচ্চ পদে নিয়োগ পাওয়া ছিল খুব কঠিন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ। এদের ভাষা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অন্যদিকে পাকিস্তানের বাকি ৪৫ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরনের। এদের মধ্যে মাত্র ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতির সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে বাঙালিদের পাকিস্তানি করণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এই বৈষম্য বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। তাই পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ এবং পরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে পূর্ববাংলার জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আর একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একই রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের এমন ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চলে। যতদিন পর্যন্ত এই বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয় নি ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে নি। কিন্তু ক্রমে পাকিস্তানিদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে কয়েক পর্যায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়–

প্রথমত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রতিবাদ গড়ে ওঠে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে নিয়ে। ৫৫% লোকের বাংলা ভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে **১৯৪৮** ও **১৯৫২** সালে ব্যাপক আন্দোলন দেখা যায়। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় প্রতিবাদ ছিল **১৯৫৪** সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা হয়। শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে চির বিদায় নেয়।

তৃতীয়ত, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির বিরুদ্ধে বাঙালিরা আবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। **১৯৬২** সালে আইয়ুব খানের সংবিধানের বিরুদ্ধে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন ক্রমে শিক্ষা রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে ছয় দফা ভিত্তিক, আগরতলা মামলা বিরোধী সর্বোপরি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের মাধ্যমে বৈষম্য বিরোধী প্রতিক্রিয়া সফল হয়।

চতুর্থত, পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ছিল **১৯৬৬** সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

পঞ্চমত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বাঙালির রায় ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। যদিও বাঙালি জাতিকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাঙালি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ বৈষম্য-এর একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অভিন্ন দেশ পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পূর্ববাংলা সমান দৃষ্টি ও সহানুভূতি পায় নি। তার বদলে সম্পদশালী পূর্ববাংলাকে শোষণ করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ববাংলা। অবশেষে বাঙালিদের কাছে পরিষ্কার হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষকের চেহারা। তারা ক্রমে আন্দোলনমুখর হয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের জন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবি ও পাঠান বাদে বাংলাসহ অপরাপর জাতির চাকুরির জন্য শতকরা কতভাগ কোটা নির্ধারণ করা হয়?

ক) ৫ খ) ২৫
গ) ৩৫ ঘ) ৬৫

২। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য করে?

i. অর্থনৈতিক
ii. প্রতিরক্ষা
iii. সাংস্কৃতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ১৯৭৪-৪৮ অর্থ বছরের পূর্ব বাংলায় শিক্ষিতের হার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে–

ক) কম খ) অনেক কম
গ) বেশি ঘ) অনেক বেশি

৪। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা কোন বৈষম্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক) শিক্ষা খ) সাংস্কৃতিক
গ) চাকুরি ঘ) সামাজিক

পাঠ-১.৪ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কীভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	যুক্তফ্রন্ট, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, ২১ দফা

ভূমিকা

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। মূলত এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের পরাজয় ও নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উত্থানের সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও বড় রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হবে। ইতোমধ্যেই ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো ছিল-

ক. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ,

খ. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি,

গ. মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী এবং

ঘ. হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার করা হয় ২১ দফা। ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবিতে গণমানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরে। এই দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
৩. পাটের ব্যবসায় জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা

৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ করা
১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা
১৭. বাংলা ভাষা করার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

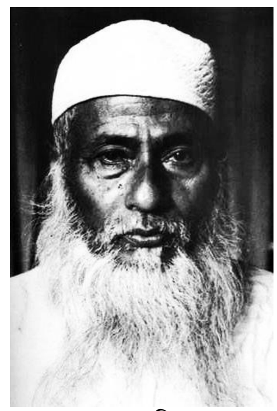
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিল ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী ২টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পরাজিত হন। মূলত মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ও নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতাই মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এ অঞ্চলের মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্টের

নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে।

মন্ত্রিসভা গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রির দায়িত্ব ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। মে মাসে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। তাই শুরু থেকেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ সময়ে এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা সফরে দুই বাংলা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই বাংলা যে অভিন্ন তা বর্ণনা করেন।

তার এই বক্তৃতার সূত্র ধরে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সুযোগ পেয়ে যান। তারা দেখতে পেলেন এই বক্তৃতার রেশ ধরে ফজলুল হককে অপসারণ করা যেতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। প্রচার করা হয় ফজলুল হক ভারতের কাছে পূর্ববাংলা বিক্রি করে দিতে চান। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হতে থাকে।

মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে। এই সময়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন। এ শাসন জারি ছিল ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পরাজয় কারণসমূহ চিহ্নিত করে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানি শাসক চক্রের শাসন ও শোষণে মানুষ মুসলিম লীগের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। এভাবে পূর্ববাংলার কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। কিন্তু মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। তখন পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কত দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে?
ক) ৬ খ) ৮ গ) ১১ ঘ) ২১

২। কত খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৪৯ গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৫৪

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর লিখ।
বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে তথা জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়।

৩। পাকিস্তানের ইতিহাসে উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথম জোটবদ্ধ দলটি কত খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে অংশ নেয়?
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬ গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৭০

৪। উক্ত নির্বাচনে জয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন কে?
ক) এ কে ফজলুল হক খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) আবু হোসেন সরকার ঘ) সৈয়দ আজিজুল হক

পাঠ-১.৫ সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান জারি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান, সামরিক শাসন, আইয়ুব খান, মৌলিক গণতন্ত্র

ভূমিকা

একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর বিভিন্ন পর্যায় হতে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে সংবিধান প্রণয়নের জোড়ালো দাবি ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এটি ছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সংবিধান। এ সংবিধানের মাধ্যমে 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন করা হয় এবং নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। সংবিধানে সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃতি হয়। বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। তবে এই সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব বাংলার সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিস্থিতি অনুধাবন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা নতুন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনিহার কারণে এই কাজে বিলম্ব হয়।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম। মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তাদের সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ হয় এবং কমিটির সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হয়।

মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমিমাংসিত থেকে যায়। ১৯৫৫ সালে গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান চালু ছিল মাত্র দু বছর। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয়। সংবিধান স্থগিত করার সাথে সাথে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ

গোলাম মুহাম্মদের পদত্যাগের পর ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর অগণতান্ত্রিক আচরণ ও হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রে তিনটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের মধ্যে গোলযোগে পরিষদ কক্ষেই ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আহত হন এবং পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট মির্জা বেসামরিক শাসন অবসানের উদ্যোগ নেন।

সামরিক শাসন জারি

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসন ব্যবস্থায় একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। সংবিধান বাতিল, আইন পরিষদ ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার গণতন্ত্র বিরোধী উপরিউক্ত কার্যক্রমে প্রধান সহযোগী ছিলেন আইয়ুব খান। উচ্চবিলাসী আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ২১ দিনের মাথায় ইস্কান্দর মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালে 'পোডো' (Public Office Disqualification Order, PODO) এবং 'এবডো' (Elective Bodies Disqualification Order, EBDO) নামক দুটি আদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে একটি নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তাঁর এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানের দুই অঞ্চল থেকে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচন করা হয়। আইয়ুব খান ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরগুলো ছিল :

১. ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে),
২. থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়) এবং তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে),
৩. জেলা পরিষদ,
৪. বিভাগীয় পরিষদ।

এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকতেন। এরাই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৯৬০ সালে এসব মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন ও ১৯৬২ সালের সংবিধান

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ পূর্ব-পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এই খবর পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকার গ্রেফতার নির্যাতন চালালে ছাত্র গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ একটি সংবিধান ঘোষণা করেন।

সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীসভা ও গভর্ণরের ক্ষমতা সংকোচিত করা হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করা হয়। বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়।

প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আইয়ুব খান ও পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালান। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপলাভ করে। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। ৮ জুন সামরিক আইন স্থগিত করে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কমিশন রিপোর্ট বাতিল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৬২ সালে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এ অবস্থায় আইয়ুব খান 'রাজনৈতিক দলবিধি' প্রবর্তন করে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটান। আইয়ুব খান নিজে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী দল সক্রিয় হয়। এসময়ে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। এই ফ্রন্ট খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party, COP) নামে একটি জোট গঠন করে। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আইয়ুব খান ফাতেমা জিন্নাহকে সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলও সরকারী দলের পক্ষে যায়। অবৈধ প্রভাব ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করেই আইয়ুব খান নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করেন। ফলে ১৯৬৫ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ভারত লাহোর আক্রমণে অগ্রসর হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত 'তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত অবস্থা প্রকাশিত হয়। তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ একটি গনতান্ত্রিক দেশে সামরিক শাসন কী কী সংকট সৃষ্টি করতে পারে তার উপর একটি বিতর্কসভা আয়োজন করুন।

সারাংশ

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার বিরোধী কার্যকলাপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের সূচনা করে। নানা রকম কূটকৌশল ও দমন নীপিড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে তা আইয়ুবের শাসন ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫০

গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৬২

২। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো–

ক) EBDO আদেশ জারি খ) PODO আদেশ জারি

গ) ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যু ঘ) সামরিক শাসন জারি

৩। কোন সমস্যার কারণে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

ক) তাসখন্দ খ) বাংলা

গ) পাঞ্জাব ঘ) কাশ্মীর

৪। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে–

ক) আদর্শ গণতন্ত্র খ) অভিনব গণতন্ত্র

গ) সার্বজনীন গণতন্ত্র ঘ) প্রচলিত গণতন্ত্র

পাঠ-১.৬ ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছয় দফা দাবি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছয় দফা উত্থাপন করার পর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- এগার দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ছয় দফা, লাহোর, আগরতলা, এগার দফা

ভূমিকা

পাকিস্তানি শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সোচ্চার হন।

ঐতিহাসিক ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। বিরোধী দলের এই সম্মেলন চলাকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখান করেন। প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল সম্মেলন বর্জন করেন। তারপর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে ঢাকায় চলে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ছয় দফাতে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবী। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ-

ছয় দফার কর্মসূচিসমূহ

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২. শুধু দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. দেশের দুই অংশে সহজেই বিনিময়যোগ্য অথচ পৃথক দুটো মুদ্রা থাকবে। অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই দেশের দুটি রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থাসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. আঞ্চলিক সরকারে হাতে থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য করার ও আদায়ের ক্ষমতা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা আলাদা হিসেব থাকবে। প্রয়োজনে দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্র বৈদেশিক মুদ্রা পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী অর্থাৎ মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

প্রতিক্রিয়া

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ বিরোধী দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়। ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দিতে থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করা হয়। ছয় দফার পক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানে দিন দিন ছয় দফা জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। আইয়ুব খানের সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়। তারা ধরপাকড় শুরু করে এবং ছয় দফাকে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের উপর শুরু হয় হয়রানি ও নির্যাতন। বিক্ষুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পালন করে প্রতিবাদ দিবস। ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদী মানুষ মিছিল বের করে। এই দিন পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক মানুষ আহত হয়। পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ৮ জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত

আগরতলা মামলা চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। প্রতিবাদী মানুষ আসামীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপলাভ করে। একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তি লাভ করেন। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

সার্জেন্ট জহুরুল হক

এগার দফা আন্দোলন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। এ সময়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এগার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগার দফা কর্মসূচির ভেতর ছয় দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশকিছু দাবি। এগার দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ক্রমে ছয় দফা ও এগার দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ছয়দফা উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীগণ একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। এই দাবি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করলে পাকিস্তানি শাসকবর্গ ভীত হয়ে পড়ে। তারা আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বিরোধী দলের অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এই দমন নীতি তাদেরকে আরও প্রতিবাদী করে তোলে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে। তবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এতে থেমে যায় নি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্ররা উত্থাপন করে এগার দফা দাবি। ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন ক্রমে গণআন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ছয় দফা কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে?

i. আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি
ii. মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন
iii. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　খ) i ও iii　গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii

২। আগরতলা ভারতের কোন রাজ্যের রাজধানী?

ক) আসাম　খ) ত্রিপুরা　গ) বিহার　ঘ) পশ্চিবঙ্গ

৩। ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয় কোন সম্মেলনে?

ক) ঢাকা　খ) লাহোর　গ) আগরতলা　ঘ) রাজশাহী

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব 'ম' একটি অঞ্চলের বিরোধী দলীয় নেতা। তিনি শাসক শ্রেণির বৈষম্যমূলক নীতি তথা শোষণের হাত থেকে জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি শাসক শ্রেণিকে কয়েকটি দাবি পেশ করেন। কিন্তু তারা দাবি না মেনে উক্ত নেতাকে একটি মামলায় কারাবন্দী করে প্রহসনমূলক বিচারের মুখোমুখি করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ক. EBDO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত দফাসমূহের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ উল্লিখিত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কী পাকিস্তানি শাসনের সমাধি তৈরি করেছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১.৭ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট কী ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণঅভ্যুত্থান, ডাকসু, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, আসাদ, মতিউর

ভূমিকা

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবার একসাথে আন্দোলনে নামে। আইয়ুব খানের পতনের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সূত্রপাত করে। তাদের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০ এর দশকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল আগরতলা মামলা দায়ের ও নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার, ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। আর এ অভ্যুত্থানের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোন আস্থা ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতম হচ্ছিল। আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েও আন্দোলন থামাতে পারে নি।

১৯৬৮ সালের একটি ঘটনা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তোলে। এ সময় আইয়ুব খান তাঁর শাসনকালের উন্নয়ন দশক (১৯৫৮-১৯৬৮) পালনের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের নিকট আইয়ুব খানের শাসন ছিল শোষণ বঞ্চনা আর নির্যাতনের দশক। এই উন্নয়নের দশক পালন মানুষকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ায় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি মিলে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট অংশ মিছিল করে গভর্নর হাউস ঘেরাও করলে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে ৮ ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আওয়ামী লীগের ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১দফা দাবি পেশ করে।

এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক একটি মোর্চা গঠন করে ৮ দফা দাবি পেশ করে। এরপর 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ডাক' এর আহ্বানে ১৪ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।

ধর্মঘটে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে বাধার সৃষ্টি করলে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র জনতা। পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিল আরও দুর্বার রূপ নেয়। মিছিলকারীরা সেক্রেটারিয়েট ভবন আক্রমণ করে এবং একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঢাকা নগরী বিপ্লবী মিছিলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবার মিছিল সরকারী পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও সরকার সমর্থক দৈনিক *মর্নিং নিউজ* অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদিন আন্দোলন ছিল ছাত্র ও আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ তারিখে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। মিছিলে যোগ দেয় রিকশা ও মোটর যানের চালক আর শ্রমিক সম্প্রদায়। আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন পুলিশকে সাহায্য করার জন্য শহরে ই.পি.আর নামানো হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। এতে আন্দোলন না থেমে আরও বেগবান হয়। মিছিলে যোগ দিতে থাকে অধিকহারে যুবক ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহুসংখ্যক মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হন।

মতিউর

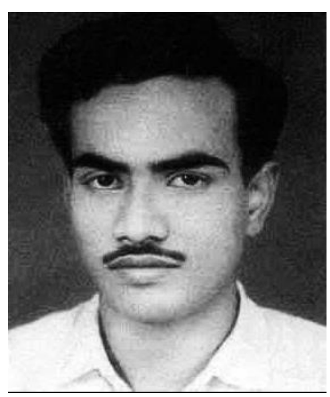

শহীদ আসাদ

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া

শহীদ ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।

এরপর আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। আইয়ুব খান অবস্থা বেগতিক দেখে বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন।

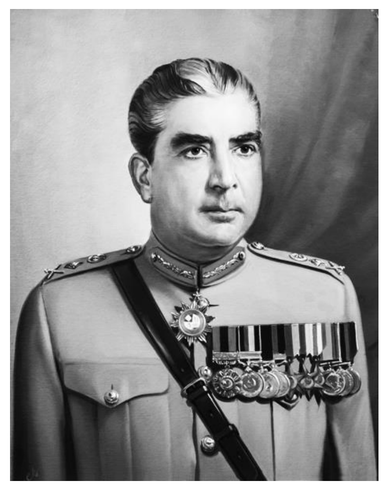

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ছয় দফা ও এগার দফার দাবি আদায় মূখ্য হয়ে উঠেছিল। গোলটেবিলের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে সরিয়ে দিয়ে ড. এম এন হুদাকে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাতেও গণআন্দোলন শান্ত হয় নি। তখন তিনি ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে।

গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় তার সাফল্যজনক পরিণতি আইয়ুব খানের পতন। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময় এ ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা যে ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সারাংশ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আইয়ুব খানের দমন নীতি, শোষণ নিপিড়ন, নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানিদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত গণরোষ বিপ্লবী করে তোলে প্রতিবাদী মানুষকে। মানুষের মিছিলের জোয়ারে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠে। আন্দোলনে শরিক হয় সমগ্র পূর্বপাকিস্তান। পুলিশ আর সৈন্যরা গুলি চালিয়েও থামাতে পারে নি আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে সরকারি প্রশাসন। গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আইয়ুব খান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বা ‘ডাক’ এর ‘৮’ মহাত্ম হলো–

i. পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল

ii. প্রতিষ্ঠা ৮ই জানুয়ারি

iii. দাবির সংখ্যা ৮টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি কেন বিখ্যাত?

ক) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যাহার খ) শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি প্রদান

গ) সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা ঘ) আইয়ুব খানের পদত্যাগ

৩। ২৪ জানুয়ারিকে ‘গণঅভ্যুত্থান দিবস’ হিসেবে পালন করা হয় কারণ ঐদিন–

i. সেক্রেটারিয়েট ভবনে আগুন লাগানো হয়

ii. দৈনিক মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন লাগানো হয়

iii. সর্বস্তরের মানুষের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাম্প্রতিক সময়ে মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়। সরকারের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার এবং রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে এ আন্দোলন দানা বাধে। সরকার এ আন্দোলন দমন করতে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করলে শেষ পর্যন্ত সরকার পতনের এক দফার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন রচিত হয়। এ পর্যন্ত কয়েকটি দেশে জনতার বিজয় নিশ্চিত হয়।

ক. ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ কী? ১

খ. ৭ মার্চের ভাষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. বর্ণিত আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান আমলের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন কী পরবর্তীতে স্বাধীকার অর্জনে প্রভাববিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১	:	১. ক	২. খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২	:	১.ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩	:	১. ঘ	২. গ	৩. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪	:	১. ঘ	২. খ	৩. ক	৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫	:	১. গ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬	:	১. খ	২. ক	৩. গ	

ইউনিট
২

১৯৭০ এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : ১৯৭০ সালের নির্বাচন

পাঠ-২.২ : অসহযোগ আন্দোলন

পাঠ-২.৩ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

পাঠ-২.৪ : প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ

পাঠ-২.৫ : মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা

পাঠ-২.৬ : মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত

পাঠ-২.৭ : স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ

পাঠ-২.১ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি, নির্বাচন পদ্ধতি, আসন বণ্টন প্রভৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইন কাঠামো আদেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ, এক ইউনিট, আইন কাঠামো আদেশ, নির্বাচনী ইশতেহার, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভূট্টো, আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, সাইক্লোন।

ভূমিকা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেশটির কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন চালু ছিল। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রথম দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে।

১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের সময় ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। স্বভাবতঃই নির্বাচন অনুষ্ঠান ও জাতীয় পরিষদ গঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি সামরিক আইনের অধীনে বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে জারি করেন। ২৮ নভেম্বরের (১৯৬৯) বেতার ভাষণে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইয়াহিয়া খান দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

প্রথমত: তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয়ত: 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা দেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেওয়া হয়।

২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) ইয়াহিয়া খান আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যেমন,

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার,
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন,
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা,
৪. বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা এবং
৫. পাকিস্তানে একটি ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ঘোষণা করা হয় 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal Frame Work Order, LFO)।

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

নির্বাচন

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭ টি নারী আসনসহ মোট বরাদ্দকৃত আসন ছিল ১৬৯ টি। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি'র (পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি) নূরুল আমিন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে)। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

পর্যালোচনা

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রায় সবগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে দেশের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কোনো মিল ছিল না।
৩. পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুল রায় ছিল ৬ দফার প্রতি গণরায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাঙালির ম্যান্ডেটস্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে প্রত্যাখান করে।

নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতি

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দুই মেরুতে অবস্থান করে। আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ন রাখে। পক্ষান্তরে পিপিপি সহ অন্যান্য দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। ভুট্টো হুমকি দেন যে, তাঁর মতামত গ্রহণ করা না হলে তাঁর দল জাতীয় সংসদে অধিবেশন বয়কট করবে। প্রত্যুত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগও তাদের দাবিতে অটুট থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর দাবিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ১ মার্চ (১৯৭১) এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পুরো পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় মার্চের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে নিজের ভাষায় একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। এক ব্যক্তি এক ভোট ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করায় এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন ও ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি সাধারণ ও ৭টি মহিলা আসন লাভ করার মাধ্যমে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের অবসানের পর কে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন?

ক) টিক্কা খান খ) জুলফিকার আলী ভূট্টো

গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) ইয়াহিয়া খান

নিচের ছকটি দেখে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

নির্বাচন	মোট আসন সংখ্যা	আওয়ামীলীগ	পিপলস পার্টি
জাতীয় পরিষদ	৩১৩	১৬৭	৮৮
প্রাদেশিক পরিষদ	৩০০	২৮৮	-

২। উদ্দীপকে (ছকে) কত সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হয়েছে?

ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৬৫

গ) ১৯৭০ ঘ) ১৯৭৩

৩। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক) পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে খ) পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়

গ) পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ঘ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়

পাঠ-২.২ অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পূর্ব পাকিস্তান, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন, টিক্কা খান, পল্টন ময়দান, স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ৭ মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা।

৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে পুরো পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১ তারিখেই পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ “স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ” গঠন করে। অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র গণজমায়েত শেষে ডাকসু'র ভিপি আ স ম আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় ‘স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। ইশতেহারে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করা হয়। এখানে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করার প্রতি জোর দেওয়া হয়। তখন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সকল কর্মপন্থা ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করতে হবে;
২. আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি বাহিনী গঠন করতে হবে;
৩. সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে, ইত্যাদি।

২ মার্চ হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। তখনকার আন্দোলন কর্মসূচিতে ছিল : ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা থেকে বেলা ২:০০ টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। পাশাপাশি ৭ মার্চ বেলা ২ টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কথাও বলা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ (১৯৭১) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। একই দিন জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান।

শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ

হরতাল ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহিংসতার দিকে মোড় নিতে শুরু করে। পুরো পূর্ব বাংলার মানুষ আন্দোলনে ফুঁসে উঠতে শুরু করে। এমনি পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন-

ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;

খ) অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;

গ) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং

ঘ) (জাতীয় অধিবেশনের পূর্বেই) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এই শর্তগুলো মানলেই যে শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন এমন নিশ্চয়তা তিনি ভাষণে দেননি। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন। বিশেষ করে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে তিনি উচ্চারণ করেন। এই ভাষণে তিনি যে সংগ্রামের ঘোষণা দেন, তার সূচনা ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিব যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন তা না পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল অসহযোগ। ইতোমধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি শীর্ষক ইশতেহার প্রচারের ফলে স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন, এমনটাই ছিল জনপ্রত্যাশা। কিন্তু স্বাধিকার, স্বাধীনতা অর্জন কিংবা আলাদা কোনো দেশ সৃষ্টির দাবির বিষয়ে তিনি তার ভাষণে স্পষ্ট করে কিছু না বলায় পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী মানুষ কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। এই ভাষণের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নতুন প্রস্তাবনা ও সমঝোতার প্রচেষ্টা

পূর্ব পাকিস্তানে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, গোটা বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমনি মুহূর্তে ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি করেন। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান সমঝোতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন জেনারেলসহ ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আগত। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলাকালেই ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান বুঝতে পারেন এই সংকট আর রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার সাধ্য তাদের নেই। তাই সামরিক হামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনকে দমনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আসা হয় আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে। পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর পরিচালিত হিংস্র সেই হামলার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ইয়াহিয়া খান আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐদিন মধ্য রাতেই ৩ ব্যাটেলিয়ান পাকিস্তানি সৈন্য 'অপারেশন সার্চলাইটে' অংশ গ্রহণ করে। তারা ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানদার বাহিনীর নির্মম আক্রমণে প্রাণ হারায় প্রায় বিপুল সংখ্যক নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালি। এভাবেই তারা সংঘটিত করে ইতিহাসের বর্বরতম এক গণহত্যা। এ বিভৎস হত্যা ও ধবংসযজ্ঞের ঘটনায় গোটা জাতি বিস্ময়বিমুঢ় হয়ে পড়ে।

ঐদিন রাত ১:৩০ টায় পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে শেখ মুজিবকে আত্মগোপন করার জন্য তার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী ও সুহৃদগণ পরামর্শ দিলেও তিনি তা না করে নিজ গৃহে অবস্থান করেন। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে সহজেই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়েই তাঁকে বন্দি রাখা হয়। ৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বিভিন্ন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তার বন্দি হওয়ার খবরটি প্রকাশিত হলে জাতি তা জানতে পারে। গ্রেফতারের পূর্বে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা নেতা হিসেবে আন্দোলনের কোনো দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন কিনা, এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা নেতা হিসেবে আন্দোলনের কোনো দিকনির্দেশনা না দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার ফলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ কী ধরনের সংকট তৈরি হয় তার উপর একটি রচনা তৈরি করবেন।

সারাংশ

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে লাগাতারভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। যা ইতিহাসে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে আছে। ১৫ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খান আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার অভিনয় করেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করলে ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। এ অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্থ জাতিকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান না করেই শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ চরম সংকটে নিপতিত হয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শেখ মুজিব ০৭ মার্চ কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন?

ক) ঢাকার গুলিস্তানে
খ) পাকিস্তানের লাহোরে
গ) ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
ঘ) চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে

২। কোন সভা থেকে ‘স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়?

ক) ০৩ মার্চের জনসভা থেকে
খ) ০৭ মার্চের জনসভা থেকে
গ) ১৭ মার্চের জনসভা থেকে
ঘ) ১৭ এপ্রিলের জনসভা থেকে

৩। ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর পরিচালিত অপারেশনের নাম কী?

ক) অপারেশন ক্লিনহার্ট
খ) অপারেশন জ্যাকপট
গ) অপারেশন মুনলাইট
ঘ) অপারেশন সার্চলাইট

পাঠ-২.৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের ঘটনা জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করতে পারবেন;
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বাধীনতার ঘোষণা, জিয়াউর রহমান, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশীদের উপর নির্মম গণহত্যা চালায়। ২৬ প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। আওয়ামী লীগের প্রধান সারির নেতৃবৃন্দ জীবনের নিরাপত্তা ও কৌশলগত কারণে আত্মগোপনে চলে যান। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা না পাওয়ায় তাদের কেউ কেউ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয়ের জন্য রওয়ানা দেন। এ ভাবেই বাঙালি জাতির জীবনে এক চরম ক্রান্তিকাল উপস্থিত হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাদের দাবি অনুযায়ী ঘোষণাটি ই পি আর-এর ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামে তাঁর ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগী জহুর আহমেদ চৌধুরী কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটি সরকারি বাহিনীর ওয়্যারলেস ব্যবস্থা, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তারাও দায়িত্বরত ছিলেন, ব্যবহার করে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণ করা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়।

এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদ এর লেখা "তাজউদ্দিন আহমেদঃ নেতা ও পিতা' শীর্ষক গ্রন্থে (পৃ. ৪৪-৪৫ দ্রষ্টব্য) ২৫ মার্চ কালরাত ও শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার এ ঘোষণা বিষয়ে সংশয় তৈরি হয়। তার বর্ণনা মতে, পুরো জাতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেই গ্রেফতার হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালি জাতির এক মহাদুর্যোগকালে চট্টগ্রামস্থ সেনাবাহিনীর অষ্টম রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান কাণ্ডারী হিসেবে হাজির হন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় হত্যাকান্ডের সংবাদ শুনেই চট্টগ্রামে প্রথম প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'We revolt' বলে তিনি পকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। জিয়া তাঁর অধীনস্ত সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যদের পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দেন। মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী অফিসারগণ তাঁদের রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেনেন্ট কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া ও

অন্যান্য অবাঙালি অফিসারদের গ্রেফতার ও হত্যা করেন। উল্লেখ্য যে, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জিয়াকে বিদ্রোহ করতে কেউ নির্দেশ দেয়নি বা আহ্বান জানায়নি। দেশের জন্য নিজের যে কর্তব্যবোধ তা থেকেই দেশ মাতৃকার চরম দুর্দিনে জিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে একটি অস্থায়ী বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে জিয়াউর রহমান এই অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে নিজ নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। জিয়াউর রহমানের প্রদত্ত ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ: "প্রিয় সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, প্রভিশানাল প্রেসিডেন্ট এবং লিবারেশন আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ', এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি, বাংলাদেশ স্বাধীন। আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করছি। আমাদের যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আমাদেরই হবে।" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, জিয়ার পূর্বোক্ত ঘোষণাটি অন্য কারো লেখা ছিল না। তিনি নিজেই এ ঘোষণাটি লিখেছিলেন। প্রথম ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি কৌশলগত কারণে এর আংশিক সংশোধন করেন এবং দ্বিতীয় ঘোষণাটিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন। প্রথম ঘোষণায় তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করলেও পরবর্তী ঘোষণায় তিনি নিজেকে 'প্রভিশনাল কমান্ডার-ইন-চিফ অব দ্যা বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি' হিসেবে উল্লেখ করেন।

জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ইংরেজি ও বাংলা দু'ভাষাতেই পঠিত হয়েছিল। ঘোষণায় তিনি বাংলাদেশে পরিচালিত পাশবিক গণহত্যার বিরুদ্ধে যার যার দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের সকল সরকারের কাছেও আবেদন জানান। তিনি বাংলাদেশের সার্বভৌম ও আইনানুগ সরকার বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জাতির স্বীকৃতির দাবিদার বলে উল্লেখ করেন। জিয়া তাঁর ঘোষণায় আরো বলেছিলেন, 'আমরা কুকুর-বিড়ালের মতো মরব না, বরং বাংলা মায়ের যোগ্য নাগরিক হিসেবে মরব।"

মেজর জিয়া তাঁর বেতার ঘোষণায় শেষ শত্রুটি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন। মেজর জিয়ার নির্দেশে পরবর্তীতে তাঁর পূর্বোক্ত ঘোষণাটি কিছুক্ষণ পরপর বেতার থেকে নিউজ বুলেটিন আকারে প্রচার করা হয়। ৩০ মার্চ একই বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের আরেকটি বিবৃতি প্রচারিত হয়, যাতে তিনি পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে দেওয়া জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালি জাতির চরম দুর্যোগ মুহূর্তে কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিটার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসা জিয়ার কণ্ঠস্বর 'আমি মেজর জিয়া বলছি' দীর্ঘ সংগ্রামের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ বাঙালি জাতিকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাঁর স্বাধীনতার এ ঘোষণা দিশেহারা মানুষকে স্বস্তি দিয়েছিল, উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশি-বিদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের লেখনীর আলোকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বস্তুত, জিয়ার

এই স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের মানুষদের জন্য এক মুক্তিবার্তা। এই বার্তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের বীর জনতা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

জিয়াউর রহমান ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত এক অকুতোভয় বীরযোদ্ধা। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যুদ্ধ পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। **১৯৭১** সালের **১০** এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত রণাঙ্গণকে **১১**টি সেক্টরে বিভক্ত করে। **১৯৭১** সালের জুন মাস পর্যন্ত **১**নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্রগাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা) অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেজর জিয়া। **১৯৭১** সালের ৭ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নিয়মিত বাহিনীর প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে একটি ব্রিগেড তৈরি করে মেজর জিয়াকে এর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। অধিনায়ক মেজর জিয়ার নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় 'জেড ফোর্স'।

বাঙালি জাতির এক চরম ক্রান্তিকালে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ও রণাঙ্গনে নেতৃত্বদানকারী বীর যোদ্ধা হিসেবে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নিজের অক্ষয় স্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান, বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য তিনি একদিকে যেমন বাঙালি জাতির অকুণ্ঠ ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ও বীরত্বব্যঞ্জক অবদানের জন্য জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তবে **১৯৭৫** সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানকে দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের পথ সুগম করে দেন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে সবার আগে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এরপর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

শহিদ জিয়াউর রহমান

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট নামের প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তারপর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলেছিল প্রায় নয় মাস। এ যুদ্ধ আপামর জনসাধারণের কাছে মুক্তিযুদ্ধ নামেই পরিচিত। এ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সে কারণে এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ নামেও পরিচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে। এ জন্য দিবসটি আমাদের কাছে বিজয় দিবস নামে পরিচিত ।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক বিবরণ তৈরি করুন।

সারাংশ

২৫মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামের গণহত্যা শুরু করে। মেজর জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করে প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা করেন। তারপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস?

ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ

গ) ১৪ ডিসেম্বর ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

২। কে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?

ক) আতাউল গনি ওসমানি খ) মাওলানা ভাসানী

গ) শহিদ জিয়াউর রহমান ঘ) অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

৩। আকলিমা রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঘুরতে এসে জেনেছে ১৯৭১ সালে এখানেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন পুলিশ বাহিনীর অসংখ্য সদস্য। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত–

i) ২৫ মার্চ গভীর রাত

ii) অপারেশন ক্লিনহার্ট

iii) অপারেশন সার্চলাইট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৪ প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রবাসী সরকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রবাসী সরকার গঠনের পটভূমি ও সরকারের সদস্যদের নাম বর্ণনা করতে পারবেন;
- ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণালাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রবাসী সরকার, মুক্তিযুদ্ধ, ইন্দিরা গান্ধী, তাজউদ্দিন আহমদ, ১১টি সেক্টর।

প্রবাসী সরকার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকারের অবদান ছিল অতুলনীয় ও অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বিজয় অর্জনের সময় পর্যন্ত এই সরকারের কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক। প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করা, দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা ছিল এই সরকারের সাফল্য। পাশপাশি স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাও ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

পটভূমি

মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত চলে যান। তারা ১ এপ্রিল ‘ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় দিল্লি পৌঁছান। তারা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারপর তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী সরকার গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাখা হয় রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম নির্বাচিত করা হয়।

তাজউদ্দীন এই সরকারের অপর তিন মন্ত্রী নির্বাচিত করেন যথাক্রমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। তাজউদ্দীন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সংকটময় সময়ে এই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই প্রবাসী সরকারকে ভারত স্বীকৃতি প্রদান করে এপ্রিলের ৪ থেকে ৬ তারিখের মধ্যে। এপ্রিলের ৮ অথবা ৯ তারিখ তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে শুরুতে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমেদের দৃঢ়তার ফলে সরকার সুগঠিতভাবে পরিচালিত হয়।

তাজউদ্দিন আহমেদ ১২ এপ্রিল মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান	-	প্রেসিডেন্ট
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	-	ভাইস-প্রেসিডেন্ট
তাজউদ্দীন আহমেদ	-	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
খন্দকার মোশতাক আহমদ	-	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান	-	অভ্যন্তরীণ সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	-	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প

শেখ মুজিবর রহমান

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমেদ

খন্দকার মোশতাক আহমদ

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

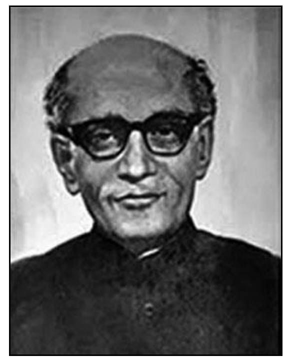
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

১৭ এপ্রিল (১৯৭১) নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। বাংলাদেশ সরকার কখনই বৈদ্যনাথতলায় অবস্থান করেননি। সরকারের প্রকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কোলকাতায়।

প্রবাসী সরকার ও মুক্তিবাহিনী

শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য সুশৃঙ্খল সামরিক কাঠামোর অধীনে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রয়োজন ছিল। এই দিকে তাজউদ্দীন আহমেদ নজর দিয়েছিলেন। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ এপ্রিল বেতারে তিনি একটি ভাষণ দেন। এখানে তিনি সারা দেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেছিলেন। সেগুলো হলো:

১. মেজর খালেদ মোশাররফ - সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চল।
২. মেজর জিয়াউর রহমান - চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চল।
৩. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল।
৪. মেজর কে এম সফিউল্লাহ - ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল।
৫. মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ - রাজশাহী অঞ্চল।
৬. মেজর নাজমুল হক - সৈয়দপুর অঞ্চল।
৭. মেজর নওয়াজেশ - রংপুর অঞ্চল।
৮. মেজর জলিল - ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চল।

প্রবাসী সরকারের দপ্তর বন্টন হলে তাজউদ্দীন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে রাখেন। ১৪ এপ্রিল কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন

সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক। মে ও জুন মাসে তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। ফোর্সগুলির নাম ছিল: ‘জেড ফোর্স’, ‘এস ফোর্স’ এবং ‘কে ফোর্স’। অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান, লেঃ কর্ণেল কে. এম সফিউল্লাহ ও লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ।

১১ থেকে ১৭ জুলাই কোলকাতায় ইতোপূর্বে গঠিত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাজউদ্দিন আহমেদ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভাতেই বাংলাদশেকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এভাবে সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড স্থাপন করার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীকে প্রবাসী প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে।

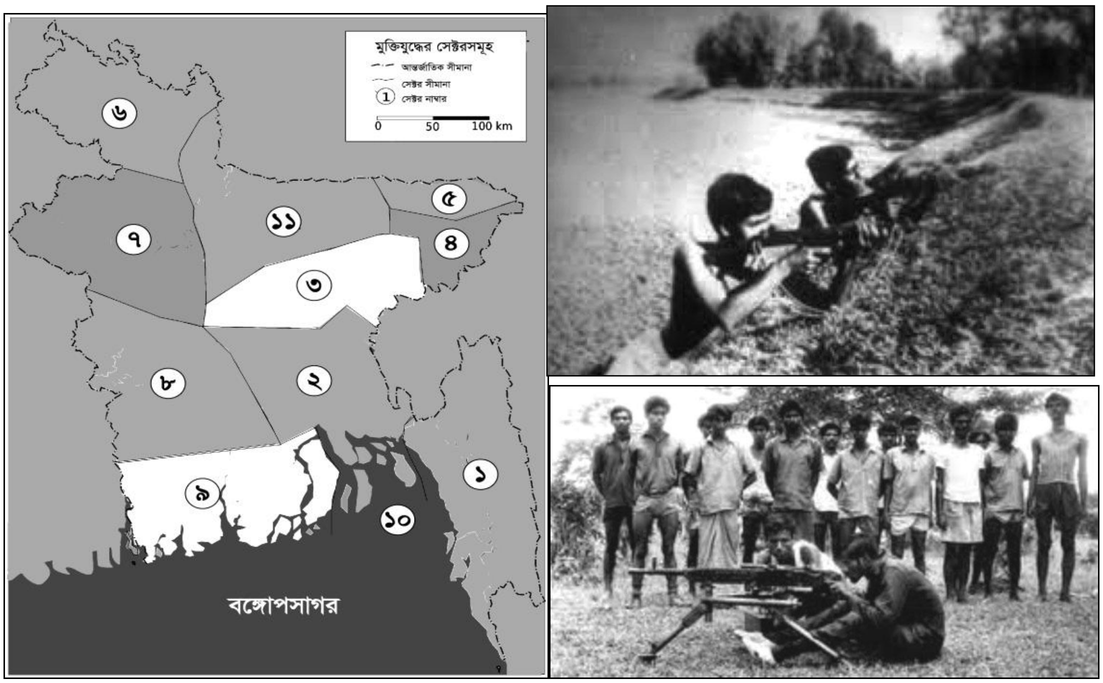

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর এবং ৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্র

অসংগঠিত বা পরে সংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিফৌজ, বা মুক্তিসেনা নামে অভিহিত করা হতো। পরে যারাই যুদ্ধ করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত বাহিনীকে মুক্তিবাহিনী হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনিয়মিত ও নিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিতদের গণবাহিনী বলা হতো। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিল সৈন্যরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপি.আর.-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকিরা গণবাহিনীতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে গণবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো।

২৮ সেপ্টেম্বর এ.কে. খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিমান বাহিনী। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করা নৌসেনাদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া নৌকমান্ডোও গঠিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তিবাহিনী। এই প্রতিরোধ যুদ্ধের গৌরবময় পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের বিজয়ের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারাংশ

২৫ মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। দেশের ভয়াবহ সংকটের মুখে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে। এরপর মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। প্রবাসী সরকার ১০ এপ্রিল সারাদেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেন। ১১ থেকে ১৭ জুলাই উক্ত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বৈদ্যনাথতলা কোন জেলায় অবস্থিত?

ক) মেহেরপুর খ) ফরিদপুর

গ) যশোর ঘ) খুলনা

২। প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল কেন?

ক) দেশের অর্থ সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার জন্য খ) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বহির্বিশ্বের সহায়তা লাভের জন্য

গ) উজ্জীবিত বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ঘ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতার জন্য

৩। সৈয়দ নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য–

i) তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা

ii) তিনি প্রবাসী সরকারের উপরাষ্ট্রপতি

iii) তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

ক) ৮ টি খ) ৯ টি গ) ১০ টি ঘ) ১১ টি

৫। মুক্তিযুদ্ধকালে ব্রিগেড ফোর্স হিসেবে কোনটি সঠিক নয় ?

ক) জেড ফোর্স খ) কে ফোর্স গ) এল ফোর্স ঘ) এস ফোর্স

পাঠ-২.৫ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও পেশাজীবী শ্রেণির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা ও ভারতের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে দালাল, রাজাকার, আলবদর-আলশামসদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বুদ্ধিজীবী, 'পূর্ববাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ', 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' তারামন বিবি, সিতারা বেগম, বামপন্থী দল, প্রবাসী বাঙালি, জর্জ হ্যারিসন, ওস্তাদ রবিশঙ্কর, ইন্দিরা গান্ধী, পিস কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, বিহারী, টিক্কা খান, নারী নির্যাতন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের অতি দ্রুত জয়লাভের কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, নারী, শ্রমিক ও আপামর জনসাধারণের সমর্থন, প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ, ভারতের সমর্থন। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

ক. ছাত্রদের ভূমিকা

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৭৫% ছিল ছাত্র, যাদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে– যেমন সেকশন কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল বেশি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ছাত্ররাই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে মাত্র তিন সপ্তাহের সামরিক ট্রেনিংকে সম্বল করে তারা নিজ জীবনকে বাজি রেখে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের পরোক্ষ ভূমিকাও ছিল। ছাত্রদের মধ্যে যারা সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কেউ শরণার্থী শিবিরে ও ইয়োথ ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে। কেউ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মুক্তি যোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করেছে।

খ. বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করা, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, প্রচার মাধ্যমকে সচল রাখার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা, রেডিওতে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রোগ্রাম প্রচার করা, প্রবাসী সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ ছিল অত্যন্ত জরুরি। এদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এসব কাজের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কেবল ১৯৭১ সালেই নয়, ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তাতেও বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেসময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পূর্ব বাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' (৬.৩.১৯৭১), 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' (৬.৩.১৯৭১) ইত্যাদি

সংগঠন। তাছাড়া শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক সমিতি, আইনজীবী সমিতি, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি ও বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির ব্যানারে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণির সদস্যবৃন্দ রাস্তায় নেমে আসেন এবং বিভিন্ন মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অসংখ্য শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অসামরিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন: প্রবাসী শিক্ষকগণ ভারতীয় শিক্ষকবৃন্দের নৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ২১ মে (১৯৭১) গঠন করেন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল কোলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'।

ভারতের শিক্ষকগণের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষকগণ শরণার্থী শিবিরে ৫৬ টি স্কুল চালু করেছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতি 'বাংলাদেশ : দ্যা রিয়েলিটি', 'বাংলাদেশ : দ্যা ট্রুথ' প্রভৃতি নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, নাট্যকার, চারু ও কারু শিল্পী প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইনটেলিজেন্টশিয়া'। এই সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত গঠনের কাজ করে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে নারী

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। কেউ সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারীরূপে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার রান্না করে, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে, সেবাদান করে ইত্যাদি নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিটি নারী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন ও স্ত্রী-এর যেকোনো একটি। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো: কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে ৪০০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

আগরতলার লেম্বুচোরা ক্যাম্পে মহিলা গেরিলা স্কোয়াড-এর আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর ট্রেনিং হয়। রণাঙ্গনের যোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। চিকিৎসার কাজে নারী চিকিৎসকগণের গৌরবময় দৃষ্টান্ত ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম। তিনিও বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন। জনমতগঠনে দেশী-বিদেশী নারী মহিলা সংগঠন যেমন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবংগ মহিলা সমিতি, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারী সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রশংসনীয় অবদান ছিল।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দল

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মস্কোপন্থী বামদলগুলো যেমন কমিউনিস্ট পার্টি (মনিসিংহ), ন্যাপ (মোজাফফর), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও কৃষক সমিতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই চারদলের প্রায় ছয় হাজার সদস্য বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা পালন করে এবং স্পেশাল গেরিলা বাহিনীর ২০০০ সদস্য ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। স্পেশাল বাহিনীর একটি দলকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ফিরে আসার পূর্বেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

চ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে (যেখানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন) বাঙালিরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন, স্মারকলিপি দেন, সংসদ সদস্যদের কাছে ধর্ণা দেন, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লন্ডনে ইউরোপের অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিরা এসে মিলিত হতেন। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিদেশের দূতাবাসসমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: কোলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের হোসেন আলী এবং অন্যান্য বাঙালি স্টাফ (১৮.০৪.৭১), নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনসুলেট জেনারেলের ভাইস কনসাল আবুল হাসান মাহমুদ আলী (২৬.০৪.৭১), লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ (১.০৮.৭১), ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসে ইকনমিক কাউন্সিল পদে কর্মরত আবুল মাল আব্দুল মুহিত (১.০৮.৭১), আবুল ফতেহ (ইরাকে কর্মরত ২১.০৮.৭১), হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (দিল্লীতে কর্মরত, ৪.১০.৭১), আবদুল মোমিন (আর্জেন্টিনায় কর্মরত, ১১.১০.৭১), ওয়ালিউর রহমান (সুইজারল্যান্ডে কর্মরত, ০৩.১১.৭১) প্রমুখ।

ছ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ বাঙালিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও সেদেশের নাগরিকেরা বাঙালিদের সমর্থনে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, মার্কিন সরকার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। যুক্তরাজ্যের নাগরিকেরা বাঙালিদের সংগে রাস্তায় নেমেছেন। পাকিস্তানে সিভিল সমাজের অনেকেই বাঙালিদের সমর্থন করতে গিয়ে জেলে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক কবি বাঙালি শরণার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকারের দানের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিতে অনশন করেছেন। বুয়েনস আয়ার্সে নোবেলজয়ী লেখক বোর্হেস, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল করেছেন। জর্জ হ্যারিসন, রিংগো স্টার, লিয়ন রাসেল, ওস্তাদ রবিশঙ্কর প্রমুখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাঙালিদের জন্য কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। জন বেজ বাংলাদেশের জন্য গেয়েছিলেন। অ্যালেন গিনসবার্গ বাংলাদেশের জন্য কবিতা লিখেছেন।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী

লে. জেনারেল টিক্কা খান ৬ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও ৭ মার্চ গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ঐ দুই পদে বহাল থাকেন। ২ সেপ্টেম্বর ডা. এ.এম. মালিক গভর্নর এবং লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়। ডা. মালিকের নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর বাঙালিদের এক মন্ত্রিসভা গঠন করার মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সকল বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক নয়। এসব বিশ্বাসঘাতক বাঙালিরাই মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সরকারের বাইরে থেকেই সৃষ্টি করেছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী, সারাদেশে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও বিডি মেম্বারদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পিস কমিটি। এসব পিস কমিটির সদস্য এবং রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ওপর চালিয়েছিল অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বাড়িঘর লুণ্ঠন ও তা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া এসব জঘন্য কাজ।

শান্তি কমিটি

৯ এপ্রিল (১৯৭১) ঢাকায় ডানপন্থী বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে ১০৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করে। ১৪ এপ্রিল কমিটির নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। পরে জেলা, মহকুমা, থানা ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি কমিটি সাধারণ মানুষের কাছে পিস কমিটি নামে বেশি পরিচিত। পিস কমিটির সদস্যদেরকে দালাল বলা হয়। এখনও মানুষ রাজাকার ও দালালকে আলাদা নামে চেনে। রাজাকার বাহিনী গঠন, রাজাকারদেরকে পরিচালনা করা, রাজাকারের অপকর্মকে সম্মতি দেয়া এবং রাজাকারকে দিয়ে লূটপাট, অগ্নিসংযোগ করা, মেয়েদেরকে ধরে আনা এসব কাজ দালালরাই করেছে।

রাজাকার বাহিনী

লে. জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ৭১' জারি করেন। তার পূর্বেই '৭১-এর মে মাসে মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ ৯৬ জন জামায়াত কর্মীর সমন্বয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে 'রাজাকার বাহিনী' গঠন করেন। পরবর্তীকালে অর্ডিন্যান্সে এই নাম গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান মোঃ ইউসুফ রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান রক্ষার সংগ্রামের নামে মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান দেওয়া, হানাদার বাহিনীকে তাদের বাড়িঘর চিনিয়ে দেওয়া, গ্রাম থেকে গরু-ছাগল-মুরগি ধরে এনে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্পে সরবরাহ করা, গ্রাম থেকে যুবতী নারী ধরে এনে আর্মি ক্যাম্পে সরবরাহ করেছে।

আলবদর বাহিনী

রাজাকার বাহিনী গঠনের পর আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। তবে রাজাকারের অধ্যাদেশের মত এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উদ্যোগ ও প্রেরণায় এই বাহিনী গঠিত হয়। আলবদরদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে পাকিস্তান বাহিনী। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরাই আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই বাহিনীর কাজ ছিল দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ভাবধারার সমর্থক ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক শ্রেণিকে হত্যা করা।

আলশামস বাহিনী ও বিহারী সম্প্রদায়

আলশামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানত অবাঙালি (বিহারি)-দের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী বাহিনী এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় এবং বাঙালি নিধনে দেয় অবাধ অধিকার। বাঙালির সম্পদ লুট করতেও এদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে বিহারী সম্প্রদায় যে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা অকল্পনীয়। শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর বাহিনী প্রধানত গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী ও দল সম্পর্কে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন।

সারাংশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, পেশাজীবী শ্রেণি, শিল্পী, খেলোয়াড়, প্রবাসী বাঙালি প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও অবদান ছিল। অনেক বিদেশী নাগরিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তান সরকারকে ও বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে–

i) কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক ii) পুলিশ ইপিআর সেনাবাহিনী iii) আলবদর আল শামসবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে কতজন নারী সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহন করেন?

ক) ২০০ জন খ) ৪০০ জন

গ) ৬০০ জন ঘ) ৮০০ জন

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন, শুধু এদেশের সর্বস্তরের জনগণই নয় অনেক দল ও সংগঠন এমনকি অনেক দেশ ও এ যুদ্ধে সহায়তা করেছে প্রতিবেশী একটি দেশ প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে সে সময় আশ্রয় দেয়। যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা তৈরির সশস্ত্র প্রশিক্ষণও দিয়েছিল।

৩। এদেশকে বেসরকারিভাবে সহযোগিতা করেছিল–

i) অধিকাংশ রাজনৈতিক দল

ii) পেশাজীবী সংগঠন

iii) সেনাবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন দেশের কথা বলা হয়েছে–

ক) চীন খ) নেপাল

গ) ভারত ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বুয়েনস আয়ার্সে মিছিল করেছেন–

i) বোহের্স ii) অ্যালেন গিনসবার্গ iii) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৬ মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরাশক্তি, চিন, আমেরিকা, মুসলিম দেশ, ভারত, সেভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ, শরণার্থী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দু'ভাগে ভাগ হয়েছিল। একভাগের নেতৃত্বে পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ও মুসলিম দেশসমূহ, অন্যদিকে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহ এবং ওআইসি বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার প্রতিবাদ করেনি বরং পাকিস্তানকে সমর্থন করতে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে।

সোভিয়েত বলয়ভুক্ত দেশসমূহ সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। মার্কিন বলয়ভুক্ত দেশসমূহ মার্কিনী সরকারের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়নি। তারা গণহত্যার নিন্দা করেছে, শরণার্থীদের সহায়তা করেছে, রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানিয়েছে। ওদিকে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। চীনের গণহত্যা সমর্থন বিশ্বজুড়ে এমনকি ভারত ও বাংলাদেশের চিনাপন্থী কমিউনিস্টদের বিপদে ফেলেছে। জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে তিন পরাশক্তির বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের সহায়তা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যের নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে বাঙালির স্বাধীকার সমস্যার সমাধান করা। বাংলাদেশের ঘটনায় ব্রিটেন সরকারিভাবে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকারের নিরপেক্ষ নীতির কারণে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকায় ও বেতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারণা সহজতর হয়েছিল এবং ব্রিটেনের মাটিকে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার জন্য কোন সরকারি বাধা বিঘ্ন ছাড়াই জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এসব অবস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন সরকার পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। এমনকি ডিসেম্বরে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে। সে সময় মার্কিন সরকারের যুক্তি ছিল যে, পাকিস্তান পুরনো বন্ধু, সিয়াটো-সেন্টোর সদস্য, সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ, তদুপরি মার্কিন-চিন সম্পর্ক উন্নয়নে পাকিস্তান তখন মধ্যস্থতা করছিল। কিন্তু তখন মার্কিন আইন পরিষদের সদস্যরা, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, গণমাধ্যম, জনসাধারণ অর্থাৎ এক কথায় সরকার ব্যতিরেকে আর সকলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে একটি অ্যাসাইমেন্ট লিখুন।

সারাংশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। ভারত ও সেভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তবে সবদেশের জনমত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। পরাশক্তিসমূহের বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোনো ভালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। সে সময় যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব কয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল–

ক) ২টি
খ) ৩টি
গ) ৪টি
ঘ) অবিভক্ত

২। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য কোন সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেয়?

ক) যুক্তরাষ্ট্র
খ) যুক্তরাজ্য
গ) সংযুক্ত আরব আমীরাত
ঘ) চিন

পাঠ-২.৭ স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো দেবার বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গেরিলা আক্রমন, ইন্দিরা গান্ধী, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী, ভারতীয় বাহিনী, যৌথবাহিনী, মুক্তিবাহিনী, সপ্তম নৌবহর, জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জেনারেল নিয়াজী, কাদের সিদ্দিকী।

পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসর দালাল, আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক যৌথভাবে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনি পরিস্থিতিতে আসন্ন পরাজয়ের মুখে পড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা। তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ১৮ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ভারতের বিমান বাহিনী। মুক্তিবাহিনী ও যৌথবাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সর্বত্র পিছু হটতে শুরু করে।

রেসকোর্সে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ

৬ ডিসেম্বর ভূটান ও ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনবার ভেটো দেয়। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর প্রেরণ করে। তার পাল্টা ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম

নৌবহর ৭ম নৌবহরের পিছু নেয়। মিত্র বাহিনী বোমা নিক্ষেপ করে মার্কিন নৌবহরের চট্টগ্রাম অবতরণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তবে এতে বন্দরের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রায় সকল ব্যবস্থাই অচল হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত জেনারেল আবদুল্লাহ নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার সৈন্য ও অফিসারসহ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।

যৌথবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জিওসি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খোন্দকার উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সূচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের 'আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়'। সে হিসেবেই ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলির বিবরণ লিখে শিক্ষককে জমা দিন।

সারাংশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথবাহিনী। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনবার ভেটো দেয়। যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বিজয় ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার যথার্থ কারণ কোনটি?

ক) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ খ) মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণ
গ) পাকিস্তানের নেপাল আক্রমণ ঘ) পাকিস্তানের ভুটান আক্রমণ

২। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে ভেটো দানকারী দেশ কোনটি?

ক) ভারত খ) চীন
গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘ) ফ্রান্স

৩। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের কত হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল?

ক) ৯০ হাজার খ) ৯১ হাজার
গ) ৯২ হাজার ঘ) ৯৩ হাজার

৪। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় দিবস কবে?

ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৭ এপ্রিল ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১	:	১. ঘ	২. গ	৩. গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২	:	১. গ	২. ক	৩. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩	:	১. খ	২. গ	৩. খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪	:	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫	:	১. ক	২. খ	৩. ক	৪. গ	৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬	:	১. ক	২. খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭	:	১. খ	২. গ	৩. ঘ	৪. ঘ	

সৌরজগৎ ও ভূ-মণ্ডল
The Solar System and the Earth

ইউনিট ৩

ভূমিকা : মহাবিশ্বের মহাকাশে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, নীহারিকা, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ও উল্কা ইত্যাদিকে জ্যোতিষ্ক বলে। যে সকল জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো আছে তাদেরকে নক্ষত্র বলে। যেমন- সূর্য। আলোকবিহীন জ্যোতিষ্ককে গ্রহ বলে। যেমন-পৃথিবী, সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়। গ্রহসমূহের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান নিজস্ব আলোকবিহীন জ্যোতিষ্ককে উপগ্রহ বলে। যেমন- চাঁদ, পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। মহাকাশে কখনও কখনও কোন জ্যোতিষ্ক কিছু দিনের জন্য দেখা যায় আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এসব জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলে। যেমন- হ্যালির ধূমকেতু ১৯৮৬ সালে একবার দেখা গিয়েছিল আবার দেখা যাবে ২০৬১ সালে। সুদূর আকাশে স্বল্পালোকিত মেঘের মত আস্তরণকে নীহারিকা বলে। এগুলো আসলে হালকা গ্যাসের অতিকায় পিণ্ড। একটি নীহারিকার মাঝে কোটি কোটি নক্ষত্র থাকতে পারে। মেঘমুক্ত রাতের আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রকে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত দীপ্তমান পথের মত দেখায় বলে একে ছায়াপথ বলে। মহাশূণ্যের কোটি কোটি নক্ষত্র, ধূলিকণা ও বিশাল বাষ্পকুন্ডসহ নীহারিকার এক একটি দলকে বলা হয় গ্যালাক্সি। একটিমাত্র গ্যালাক্সিতেই প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন। বিজ্ঞানীরা বিশ্বভ্রহ্মান্ডে কয়েক হাজার কোটি গ্যালাক্সির আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য ইউনিটে সৌরজগৎ এবং গ্রহসমূহ, পৃথিবী ও এর আকৃতি, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা, স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা, পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির কারণ ও ফলাফল এবং জোয়ার-ভাটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : সৌরজগৎ এবং গ্রহসমূহ
পাঠ-৩.২ : পৃথিবী ও এর আকৃতি
পাঠ-৩.৩ : অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা
পাঠ-৩.৪ : স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা
পাঠ-৩.৫ : পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি
পাঠ-৩.৬ : জোয়ার-ভাটা

পাঠ-৩.১ সৌরজগৎ এবং গ্রহসমূহ
The Solar System and the Plannets

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সৌরজগৎ এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- সৌরজগতের গ্রহসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সৌরজগৎ, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন।

সৌরজগৎ এবং গ্রহসমূহ

মহাকাশের অসংখ্য জ্যোতিষ্ক নিয়ে যে জগতের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিশ্বজগৎ বা বিশ্বব্রহ্মান্ড বলে। সূর্য বিশ্বজগতের কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। সংক্ষেপে সূর্য ও এর চতুর্দিকে ঘূর্ণনরত জ্যোতিষ্কমন্ডলীকে একত্রে সৌরজগৎ (**Solar System**) বলে। মহাকাশে সূর্যকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট গতিতে, নির্দিষ্ট দূরত্বে, একই সমতলে একইদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূনর্ণরত সকল গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু ও উল্কাপিন্ডের সমন্বয়ে সৌরজগৎ গঠিত হয়েছে। সৌরজগতে মোট ৮টি গ্রহ (যথা: বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন) রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্লুটো গ্রহকে বর্তমানে গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয় না, কারণ প্লুটো গ্রহের সাথে গ্রহের বৈশিষ্ট্যের মিল নেই (চিত্র-১.১.১)।

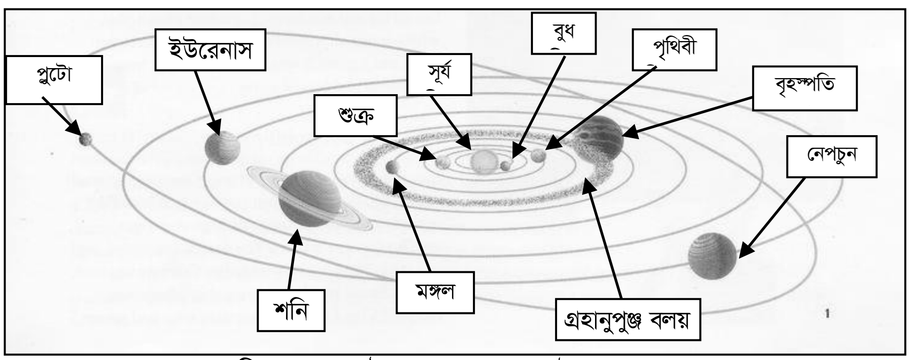

চিত্র-১.১.১ সৌরজগতের গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ

সূর্য (Sun) : সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত মাঝারি আয়তনের নক্ষত্র সূর্য। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটার এবং সূর্যের ব্যাস প্রায় ১৪,০০০০০ কিলোমিটার। সূর্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিরী থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার। সূর্য তার নিজস্ব গ্যালাক্সির চর্তুদিকে বৃত্তাকার পথে ২০ কোটি বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং নিজ কক্ষপথে প্রায় ২৫ দিনে একবার আবর্তন করে। সূর্যের কেন্দ্রভাগে তাপমাত্রা ৮ মিলিয়ন থেকে ৪০ মিলিয়ন ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা প্রায় ৫,৭০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সূর্যের বিকিরণকৃত তাপের মাত্র ২০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ পৃথিবীতে আসে। যার দরুণ ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকে।

বুধ (Mercury) : সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ। এর ব্যাস ৪,৮৫০ কিলোমিটার। সূর্য থেকে বুধের গড় দূরত্ব প্রায় ৫৮ কোটি কিলোমিটার। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে বুধের সময় লাগে প্রায় ৮৮ দিন। দিনের বেলায় বুধের তাপমাত্রা থাকে প্রায় ৪০০° সেলসিয়াসের এবং রাতে তাপমাত্রা হিমাংকের নীচে থাকে। বুধে বায়ুমন্ডল, পানি, চৌম্বকত্ব ও জীবজন্তু নেই। বুধের কোনো উপগ্রহও নেই।

শুক্র (Venus) : সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে শুক্রের সময় লাগে ২২৫ দিন। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ১০.৮ কোটি কিলোমিটার। ভোর রাতে পূর্ব আকাশে শুক্র গ্রহকে বলা হয় শুকতারা। সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম আকাশে একে বলা হয় সন্ধ্যাতারা। শুক্র গ্রহেরও কোনো উপগ্রহ নেই।

পৃথিবী (Earth) : পৃথিবীকে বলা হয় আদর্শ গ্রহ। কারণ একমাত্র পৃথিবী গ্রহেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস প্রায় ১৩ হাজার কিলোমিটার। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ।

চাঁদ (Moon) : পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব ৩,৮১,৫০০ কিলোমিটার। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে নিজ কক্ষপথে ২৯ দিনে একবার আর্বতন করে। চাঁদের ব্যাস ৩,৪৭৫ কিলোমিটার। ১৯৬৯ সালের ২১ শে জুলাই সর্বপ্রথম মানুষ চাঁদে অবতরণ করেন। চাঁদে পানি, বায়ু, উদ্ভিদ বা প্রাণী নেই। চাঁদে বহু সমতলভূমি, পাহাড় পর্বত ও বৃহদাকার গর্তের উপরিভাগ দেখা যায়। চাঁদের সবচেয়ে বড় গহ্বরটির নাম ক্লেভিউস। চাঁদের আকাশ দিনে-রাতে একই রকম কালো। চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোতে চাঁদ আলোকিত হয়। চাঁদের যে পৃষ্ঠে সূর্যালোক পড়ে সে পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১০০° সেলসিয়াস এর ওপরে এবং অন্ধকার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ১৫০° সেলসিয়াসের নীচে।

মঙ্গল (Mars) : সূর্য থেকে মঙ্গলের গড় দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস ৬,৭৮৭ কিলোমিটার। সূর্যের চর্তুদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে মঙ্গলের সময় লাগে প্রায় ৬৮৭ দিন। ডিমোস এবং ফোবোস নামক মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ রয়েছে। বৃত্তাকার কক্ষপথে ডিমোস প্রতি ৩০ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড এবং ফোবস ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে মঙ্গলকে একবার আবর্তন করে। মঙ্গলে রয়েছে সৌরজগতের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি নিকস অলিম্পিকা। মঙ্গলের বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আর্গন প্রভৃতি গ্যাস রয়েছে। মঙ্গলের আকাশ নীল, মাটি লাল ও শুষ্ক। মঙ্গলের তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস এর অধিক হয় না। তাপমাত্রা রাতে হিমাঙ্কের বহু নিচে নেমে যায়।

বৃহস্পতি (Jupiter) : সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বলে একে গ্রহরাজ বলা হয়। পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতি প্রায় ১৩০০ গুণ বড়। সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ৭৭ কোটি কিলোমিটার। বৃহস্পতির সূর্যের চারিদিকে একবার আবর্তন করতে সময় লাগে প্রায় ১২ বছর। বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা ১৬টি। বৃহস্পতির বায়ুমন্ডলে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং হিলিয়াম রয়েছে।

শনি (Saturn) : সূর্য থেকে শনির গড় দূরত্ব ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। সূর্যের চারিদিকে একবার আবর্তন করতে শনির সময় লাগে ২৯ বছর। এর ব্যাস প্রায় ১,২০,০০০ কিলোমিটার।

প্লুটো (Pluto) : প্লুটো সৌরজগতের নবম গ্রহ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ৫৯০ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস প্রায় ৬,০০০ কিলোমিটার। সূর্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্লুটোর সময় প্রয়োজন হয় ২৮৪ বছর।

ইউরেনাস (Uranus) : দূরত্বের দিক থেকে সৌরজগতের সপ্তম গ্রহ ও তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এটি সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যার নাম গ্রীক পুরান থেকে নেয়া হয়েছে। সূর্য থেকে ইউরেনাস এর গড় দূরত্ব ২৯০ কোটি কিলোমিটার। ইউরেনাস এর উপগ্রহের সংখ্যা ২৭টি। ৮৪ বছরে এটি সূর্যের চতুর্দিকে নিজ কক্ষপথে ঘুরে। এ গ্রহেরও শনির মত বলয় রয়েছে। তবে বলয়গুলো উজ্জ্বল নয়।

নেপচুন (Naptune) : দূরত্বের দিক থেকে নেপচুন সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ। সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ৪৫১ কিলোমিটার। এর ব্যায় প্রায় ৪৮,০০০ কিলোমিটার। এটি ১৬৫ বছরে একবার সূর্যের চারিদিকে নিজ কক্ষপথে ঘুরে। নেপচুনের উপগ্রহের সংখ্যা ১৪টি।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids) : মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী অংশে সূর্যের চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবর্তন করছে। এগুলোকে একত্রে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে। এদের ব্যাস ১.৬ কিলোমিটার থেকে ৮০৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়।

ধূমকেতু (Comet) : ধূমকেতু সূর্যের চারিপাশে উপবৃত্তাকারে ঘুরছে। ধূমকেতু সূর্যের নিকটবর্তী হলে প্রথমে মেঘের আকারে দেখা যায় এবং ক্রমশ উজ্জ্বল কেন্দ্রবিন্দু বা মাথা এবং কেন্দ্র থেকে উজ্জ্বল ঝাটার মতো দীর্ঘ বাষ্পপুচ্ছ বা লেজ বের হয়ে আসে। অর্থাৎ ধূমকেতুর দুটি অংশ মাথা ও লেজ। ধূমকেতুর পুচ্ছ বা লেজকে কুয়াশার আবরণের মতো মনে হয় যা মিলিয়ন কিলোমিটার দীর্ঘ হতে পারে। সূর্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে হ্যালির ধূমকেতুর সময় লাগে ৭৫ বছর। সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবী থেকে দেখা গিয়েছে। পুনরায় দেখা যাবে ২০৬১ সালে।

উল্কা (Meteor) : মেঘমুক্ত রাতের আকাশে মাঝে মাঝে দেখা যায় কোনো একটি তারা ছুটতে ছুটতে নিভে গেল বা এইমাত্র তারাটি খসে পড়ল। এগুলোকে উল্কা বলে। অনেকগুলো উল্কা এক সাথে ছুটতে থাকলে তাকে উল্কা ঝড় বলে। ১৯৯৯ সালের ১৮ই নভেম্বর পৃথিবী থেকে উল্কা ঝড় দেখা গিয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা পৃথিবী থেকে গ্রহ উপগ্রহসমূহের দূরত্বের তালিকা তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ, উপগ্রহ, অসংখ্য গ্রহাণুপুঞ্জ ও উল্কা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সৌরজগৎ। যে সকল জ্যোতিস্কের নিজস্ব তাপ ও আলো আছে তাকে বলা হয় নক্ষত্র, যেমন- সূর্য। যাদের তাপ ও আলো নেই তাদের বলা হয় গ্রহ। সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা মোট ৮টি। সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি এবং ছোট গ্রহ বুধ। যে সকল জ্যোতিষ্ক গ্রহের চর্তুদিকে পরিভ্রমণ করে তাদেরকে বলা হয় উপগ্রহ। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ৫টি (খ) ৬টি
(গ) ৭টি (ঘ) ৮টি

২। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটি?
(ক) বুধ (খ) শুক্র
(গ) বৃহস্পতি (ঘ) মঙ্গল

৩। সৌরজগতের আদর্শ গ্রহ কোনটি?
(ক) বৃহস্পতি (খ) বুধ
(গ) শুক্র (ঘ) পৃথিবী

পাঠ-৩.২ পৃথিবী ও এর আকৃতি
The Earth and Its Shape

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পৃথিবীর আকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- পৃথিবীর আয়তন, ব্যাস, ব্যাসার্ধ ও পরিধি নির্ণয় করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পৃথিবী।

পৃথিবী ও এর আকৃতি

পৃথিবীর আকৃতি বর্তুলাকার (Spherical)। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অতি সামান্য চাপা ও বিষুবরেখা বরাবর কিছুটা স্ফীত। জ্যোর্তিবিদ ইরাটোসথেনিস খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে পৃথিবীর বর্তুলাকার প্রমাণ দেন। নিম্নে পৃথিবীর বর্তুলাকার প্রমাণের কতিপয় উদহারণ উপস্থাপন করা হলো-

ক. একই দিকে যাত্রা : পৃথিবীর যে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে জাহাজ বা উড়োজাহাজ করে যাত্রা শুরু করলে এবং দিক পরিবর্তন না করে একই দিকে অগ্রসর হলে দেখা যায়, যে স্থান হতে যাত্রা শুরু করেছিল ঠিক সেই একই স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছে (চিত্র-১.২.১)। এরূপ পরীক্ষা করে ম্যাগিলান, ড্রেক ও কুক প্রমুখ নাবিকগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন পৃথিবী বর্তুলাকার।

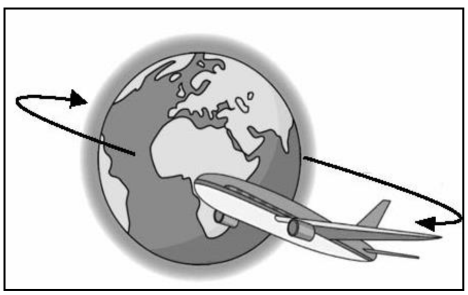

চিত্র ১.২.১ প্লেনের একই দিকে যাত্রা

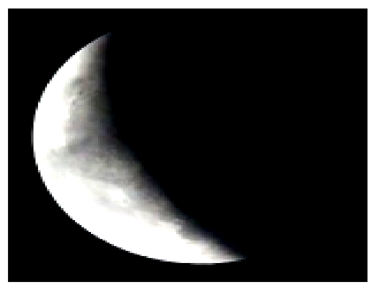

চিত্র ১.২.২ চন্দ্র গ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া

খ. চন্দ্র গ্রহণের ছবি : চন্দ্র গ্রহণের সময় পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে এবং পৃথিবীর অবস্থান থাকে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যবর্তী স্থানে। এই সময় পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে তা বর্তুলাকার দেখায় (চিত্র-১.২.২)।

গ. দিগন্ত রেখার সাহায্যে : পৃথিবীর যে কোনো উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে মনে হয়, আকাশ ও ভূ-পৃষ্ঠ একটি বৃত্তাকার রেখায় মিশে গেছে। একে বলে দিগন্তরেখা। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যতো উপরের দিকে উঠা হয়, দিগন্তরেখার পরিধিও একই হারে বাড়তে থাকে (চিত্র-১.২.৩)। দিগন্তরেখার আকারও বৃত্তাকার।

চিত্র ১.২.৩ বিভিন্ন উচ্চতা থেকে বৃত্তাকার দিগন্ত রেখা

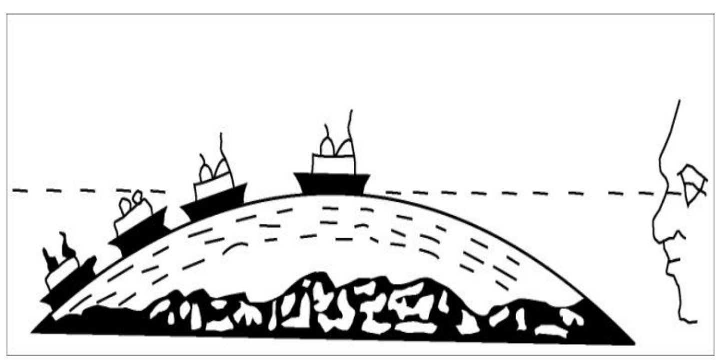

চিত্র ১.২.৪ সমুদ্রপৃষ্ঠের জাহাজের সাহায্যে পৃথিবীর গোলকত্ব পরীক্ষা

ঘ. সমুদ্রে চলমান জাহাজের ছবি : গভীর সমুদ্র হতে তীরের দিকে আসতে থাকা কোনো জাহাজের সম্পূর্ণ অংশ দেখা যায় না। প্রথমে জাহাজের মাস্তুল, পরে চোঙ, ডেক, ছাদ ও (চিত্র- ১.২.৪) তীরের কাছাকাছি আসলে সম্পূর্ণ জাহাজটি দেখা যায়। পৃথিবী সমতল হলে অনেক দূর থেকে ও সম্পূর্ণ জাহাজটি দেখা যেত।

ঙ. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় একই রকম নয়। কারণ পৃথিবী বর্তুলাকার। (চিত্র- ১.২.৫) সাধারণত পূর্বদিকের দেশসমূহে প্রথমে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় এবং পরবর্তীতে পশ্চিমের দেশগুলোতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়।

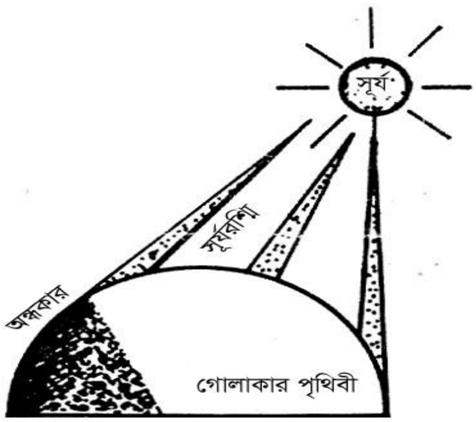

চিত্র ১.২.৫ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের ভিন্নতা

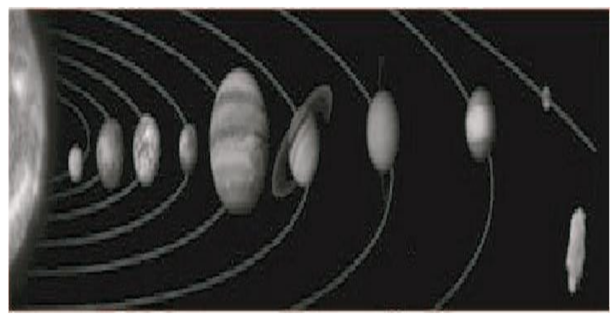

চিত্র ১.২.৬ সৌরজগতের বর্তুলাকার গ্রহ-উপগ্রহ

চ. কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে : সাম্প্রতিক সময়ে মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহ সমূহ (Satellites) থেকে প্রাপ্ত আলোকচিত্রে দেখা যায় যে, সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহের ন্যায় পৃথিবীর আকৃতি ও বর্তুলাকার (চিত্র- ১.২.৬)।

পৃথিবীর পরিধি, ব্যাস ও আয়তন

পরিধি হলো বৃত্তের চারিদিকে পরিমাণ। পৃথিবীর পরিধি হলো পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত নিরক্ষরেখার (০° অক্ষাংশ) পরিধি। পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুকে ছেদ করে যে রেখা পৃথিবীর যে কোনো দু'টি প্রান্তকে স্পর্শ করে তাকে পৃথিবীর ব্যাস বলা হয়। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হলো, এমন একটি রেখা যেটি পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দু থেকে যে কোনো একটি প্রান্ত স্পর্শ করে (চিত্র- ১.২.৭)। পৃথিবী নিজ অক্ষে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা বা ১৪৪০ মিনিট বা ১ দিন। ফলে একই জায়গায় ২৪ ঘণ্টা বা ১৪৪০ মিনিট পর সূর্য ওঠে। পৃথিবীর দুটি স্থানের মধ্যে সূর্য ওঠার সময়ের পার্থক্য থেকে পৃথিবীর পরিধি বা নিরক্ষরেখার দৈঘ্য নির্ণয় করা যায়।

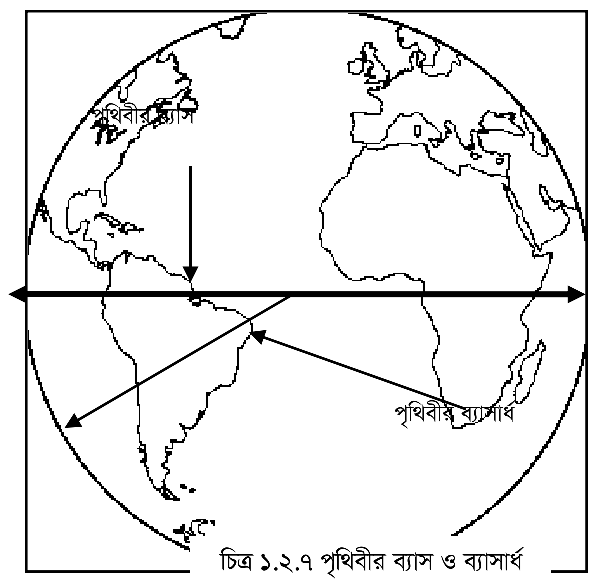

চিত্র ১.২.৭ পৃথিবীর ব্যাস ও ব্যাসার্ধ

ইরাটোসথিনিসের গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল, নিরক্ষীয় ব্যাস ৭,৯২৭ মাইল ও মেরুদেশীয় ব্যাস ৭,৯০০ মাইল। পৃথিবীর মেরু দেশীয় ব্যাস নিরক্ষীয় ব্যাসের চাইতে ২৭ মাইল কম কারণ পৃথিবী একটি অভিগত গোলক।

পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করার জন্য প্রথমে নিরক্ষরেখার উপর দুটি স্থানের মধ্যকার সূর্য উঠার পার্থক্য এবং স্থান দুটির মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এ থেকে কতটুকু দূরবর্তী স্থানের মধ্যকার সূর্য উঠার সময়ের পার্থক্য ১ মিনিট তা নির্ণয় করা হয়। এই দূরত্বকে ১,৪৪০ মিনিট বা ২৪ ঘণ্টা দ্বারা গুণ করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করা যায়। গণিতিক সূত্র অনুসারে, গোলকের

পরিধিকে পাই (π) বা এর মান ৩.১৪ দ্বারা ভাগ করলে পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করা যায়। উদাহরণ- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশে নিরক্ষরেখার উপরে দুটি শহরের একটিতে অপরটির চেয়ে ৮ মিনিট পর সূর্য ওঠে।

শহর দুটির মধ্যকার দূরত্ব ১৩৮.৫ মাইল হলে পৃথিবীর পরিধি কত কিলোমিটার? (১ মাইল = ১.৬১ কিলোমিটার)

সমাধান :

৮মিনিট ব্যবধানে সূর্য ওঠে ১৩৮.৫ মাইল দূরত্বে

১ ,, ,, ,, ,, ১৩৮.৫ ÷ ৮ ,, ,,

$\therefore$ ১৪৪০ ,, ,, ,, $\frac{১৩৮.৫\times১৪৪০}{৮}$,,

= ২৪,৯৪০ মাইল দূরত্বে

$\therefore$ পৃথিবীর পরিধি = ২৪,৯৩০ মাইল বা ২৫০০০ মাইল প্রায়

= (২৪,৯৩০ × ১.৬১) কিলোমিটার

= ৪০,১৩৭ কি. মি.

অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধি ৪০,১৩৭ কিলোমিটার

পৃথিবীর আয়তন নির্ণয় করতে প্রথমেই পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বা ২৫,০০০ মাইল এবং পৃথিবীর গড় ব্যাস প্রায় ১২,৮০০ কিলোমিটার।

পৃথিবীর আয়তন

গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে নিরক্ষীয় ব্যাস ১২,৭৫৭ কিলোমিটার। উত্তর-দক্ষিণে মেরু ব্যাস ১২,৭১৪ কিলোমিটার। পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৩৫.৫ কি.মি। সরল হিসাবে পৃথিবীর ব্যাসকে ১২,৮০০ কিলোমিটার ধরা হয়। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ ৬৪০০ কিলোমিটার।

সূত্রানুসারে, গোলকের আয়তন = ৪ × π × (ব্যাসার্ধ)^২

$\therefore$ পৃথিবীর পরিধি = ৪ × π × (ব্যাসার্ধ)^২

= ৪ × ৩.১৪ × (৬৪০০)^২ বর্গ কিলোমিটার [π= ৩.১৪]

= ৪ × ৩.১৪ × ৪,০৯,৬০,০০০ ÷ ৭ বর্গ কিলোমিটার

= ৩৬,০৪৪,৮০,০০০ ÷ ৭

= ৫১,৪৯,২৫,৭১৪.৩ বর্গ কিলোমিটার

অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের আয়তন ৫১ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৭১৪.৩ বর্গ কিলোমিটার।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা পৃথিবী যে একটি অভিগত গোলক এটি ব্যাখ্যা করবেন।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর আকার বর্তুলাকার। শুধুমাত্র উত্তর-দক্ষিণে সামান্য চাপা এবং নিরক্ষরেখা বরাবর স্ফীত। পৃথিবীর আয়তন ৫১,৪৯,২৫,৭১৪.৩ বর্গ কিলোমিটার, পৃথিবীর পরিধি ৪০,১৩৭ কিলোমিটার এবং পৃথিবীর গড় ব্যাস ১২,৮০০ কিলোমিটার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৃথিবীর গড় ব্যাস কত?
(ক) ১২৮০ কিলোমিটার খ) ১২৮০০ কিলোমিটার (গ) ১২৭০০ কিলোমিটার (ঘ) ১২০০০ কিলোমিটার

২। পৃথিবী-
i. একটি অভিগত গোলক। ii. পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে।
iii. পৃথিবী সূর্য থেকে তাপ ও আলো পায়।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) iii

৩। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ উপরের দিকে দিগন্ত রেখা কেমন হয়?
(ক) বেড়ে যায় (খ) কমে যায়
(গ) একই রকম থাকে (ঘ) সরল রেখায় পরিণত হয়

পাঠ-৩.৩ অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা
Latitude and Longitude

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা ।

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে পৃথিবী পৃষ্ঠের যে কোনো স্থানের সঠিক সময় ও অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

অক্ষরেখা (Latitude)

পৃথিবীর দুই মেরু হতে সমান দূরত্বে (পৃথিবীর মাঝখানে) পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে ঘিরে থাকা কল্পিত বৃত্তকে বলা হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বলে। নিরক্ষরেখার সমান্তরালে উত্তরে ও দক্ষিণে কতকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। এই রেখাগুলোকে অক্ষরেখা বা সমাক্ষরেখা বলে। অক্ষরেখাসমূহের দূরত্ব সর্বত্র সমান (চিত্র- ১.৩.১)। নিরক্ষেরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বের মানকে ডিগ্রিতে প্রকাশ করলে তাকে অক্ষাংশ বলে (চিত্র- ১.৩.৩)। নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখার মান ০°। নিরক্ষরেখা থেকে ৯০° উত্তর অক্ষাংশকে বলা হয় সুমেরু এবং ৯০° দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলা হয় কুমেরু। এছাড়া ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে বলা হয় যথাক্রমে- কর্কটক্রান্তি এবং ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে বলা হয় মকরক্রান্তি। ৬৬.৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলা হয় যথাক্রমে সুমেরু বৃত্ত এবং কুমেরু বৃত্ত। বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখাকে বলা হয় মহাবৃত্ত। সাধারণভাবে, ০°-৩০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে নিম্ন অক্ষাংশ ৩০°-৬০° অক্ষাংশকে বলা হয় মধ্য অক্ষাংশ এবং ৬০°-৯০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে বলা হয় উচ্চ অক্ষাংশ (চিত্র- ১.৩.২)।

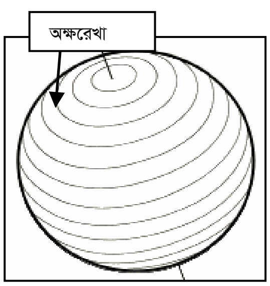

চিত্র ১.৩.১ অক্ষরেখাসমূহ

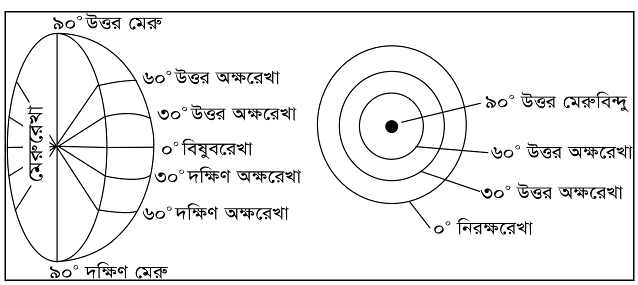

চিত্র ১.৩.২ পৃথিবীর অক্ষ ও মেরুদ্বয়

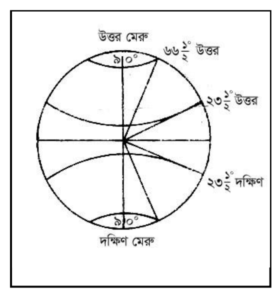

চিত্র ১.৩.৩ অক্ষাংশ

অক্ষাংশ নির্ণয় করার পদ্ধতি

প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। যথা-

১। **ধ্রুবতারার অবস্থান :** আকাশে ধ্রুবতারার সাহায্যে দিনের বেলায় কিংবা দক্ষিণ গোলার্ধে অক্ষাংশ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উত্তর গোলার্ধের কোনো স্থানে ধ্রুবতারা যত ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে সেই মানই উক্ত স্থানের অক্ষাংশ।

২। **সূর্যের অবস্থান :** আকাশে সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী সেক্সট্যান্ট নামক যন্ত্র ব্যবহার করে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। অক্ষাংশ নির্ণয়ের সূত্রটি হলো-

কোনো স্থানের অক্ষাংশ = ৯০° মধ্যাহ্নে সূর্যের উন্নতি ± বিষুবলম্ব।

সূর্য যেদিন যে অক্ষাংশের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় সেটিই ঐ দিন উক্ত স্থানের বিষুব লম্ব। বিষুব লম্ব ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্রাঘিমা রেখা (Longitude)

ভূ-পৃষ্ঠের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সংযুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয় যা নিরক্ষরেখাকে ছেদ করেছে। এ রেখাগুলোকে দ্রাঘিমা রেখা (Longitude) বা মধ্যরেখা বলে (চিত্র- ১.৩.৪)।

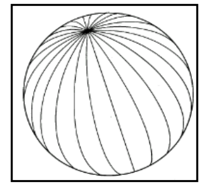

চিত্র ১.৩.৪ দ্রাঘিমা রেখা

মূল দ্রাঘিমা রেখা

লন্ডন শহরের নিকটে অবস্থিত গ্রীনিচ নামক স্থানের উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমা রেখা কল্পনা করা হয়েছে তাকে মূল দ্রাঘিমা রেখা বলে। মূল দ্রাঘিমা রেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা বলা হয়। নিরক্ষরেখার সাথে যে কোনো একটি দ্রাঘিমা রেখার ছেদবিন্দু ও মূল দ্রাঘিমা রেখার ছেদবিন্দু দুটিকে পৃথিবীর কেন্দ্রের সাথে একটি রেখা দ্বারা যোগ করলে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাকে ঐ রেখার দ্রাঘিমা বলে। মূল দ্রাঘিমা রেখার দ্রাঘিমার মান ০° ধরা হয়। মূল দ্রাঘিমা রেখা হতে ১° পর পর পূর্ব দিকে ১৮০ টি এবং পশ্চিম দিকে ১৮০টি দ্রাঘিমারেখা অঙ্কন করা যায় (১.৩.৫, ১.৩.৬, ১.৩.৭)।

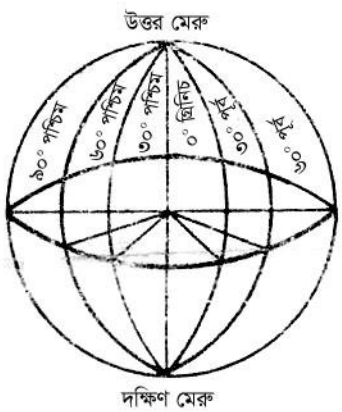

চিত্র ১.৩.৫ দ্রাঘিমা রেখা (০-৯০°)

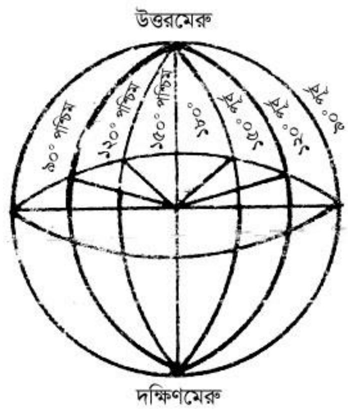

চিত্র ১.৩.৬ দ্রাঘিমা রেখা (৯০-১৮০°)

চিত্র ১.৩.৭ মূল দ্রাঘিমা রেখা

পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে এবং এই আবর্তনে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা বা ১,৪৪০ মিনিট। নিরক্ষরেখা পৃথিবীর কেন্দ্রে মোট ৩৬০° কোণ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ ৩৬০° ঘুরতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। ১° ঘুরতে সময় প্রয়োজন হয় মাত্র ৪ মিনিট। এই হিসেবে ১৫° দ্রাঘিমান্তরে সময়ের ব্যবধান হয় ১ ঘণ্টা।

দ্রাঘিমা নির্ণয়

১। যেহেতু ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য দুটি স্থানের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। এ কারণে স্থান দুটির সময়ের পার্থক্য যা হয় তাকে ৪ দিয়ে ভাগ করে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়।

২। যে কোনো স্থানের সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা অধিক হলে বুঝতে হবে স্থানটি গ্রীনিচের পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং কম হলে স্থানটি গ্রীনিচের পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রীনিচের দ্রাঘিমাকে ০° ধরে সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী অন্যান্য স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়। ক্রনোমিটার নামক ঘড়ি গ্রীনিচ সময় অনুসারে চলে। তাই এই ঘড়ি দেখে কোনো স্থানের স্থানীয় সময়ের সাথে গ্রীনিচ সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় পদ্ধতি অনুশীলন করবেন।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু হতে সমান দূরত্বে ঠিক মধ্যখানে পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে ঘিরে পূর্ণ বৃত্তের মত একটি রেখা কল্পনা করা হয়, এর নাম নিরক্ষরেখা বা বিষুব রেখা। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে অক্ষাংশ বলে। পৃথিবীর কোনো স্থান কতটা পূর্বে বা পশ্চিমে তা নির্ণয় করার জন্য ভূ-পৃষ্ঠে দুই মেরুকে সংযুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে যা নিরক্ষরেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই রেখাগুলোকে দ্রাঘিমারেখা বলে এবং ছেদবিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে দ্রাঘিমাংশ বলে। লন্ডন শহরের নিকটে অবস্থিত গ্রীনিচ নামক স্থানের উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমা রেখা কল্পনা করা হয় তাকে মূল দ্রাঘিমা রেখা বলে। মূল দ্রাঘিমা রেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সেক্সট্যান্ট নামক যন্ত্রের সাহায্যে কি পরিমাপ করা হয়?

(ক) সময় (খ) উষ্ণতা

(গ) অক্ষাংশ (ঘ) দ্রাঘিমাংশ

২। পৃথিবীর দুই মেরু হতে সমান দূরত্বে পূর্ব-পশ্চিমে পূর্ণ বৃত্তের মত পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে কি বলে?

(ক) মেরুরেখা (খ) মূল মধ্যরেখা

(গ) নিরক্ষরেখা (ঘ) আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

৩। মূল দ্রাঘিমা রেখা কোন স্থানের উপর দিয়ে গিয়েছে?

(ক) টোকিও (খ) প্যারিস

(গ) গ্রীনিচ (ঘ) বাংলাদেশ

পাঠ-৩.৪ স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

Local Time, Standard Time and International Date Line

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ।

স্থানীয় সময়

আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে যে সময় গণনা করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে। সূর্যরশ্মি কোনো স্থানে লম্বভাবে কিরণ দিলে অথবা সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে অবস্থান করে তাকে বলে দুপুর বা মধ্যাহ্ন (চিত্র- ১.৪.১)। মধ্যাহ্নের সময় আকাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় মধ্যাহ্ন কালীন রেখা (Meridian)।

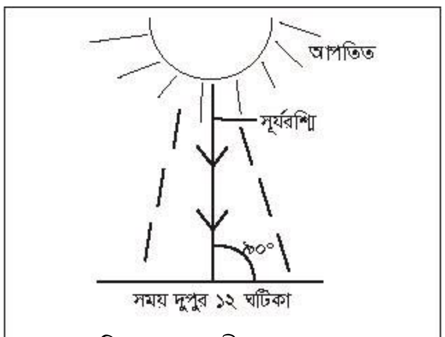

চিত্র ৩.৪.১ স্থানীয় সময়

মধ্যাহ্নকে ল্যাটিন ভাষায় মেরিডিস (Meridies) বলে। মেরিডিস থেকে ইংরেজী শব্দ Meridian এসেছে। যে সময় সূর্য এই মধ্যচিহ্ন রেখার পূর্ব দিকে থাকে তাকে বলে পূর্বাহ্ন বা Anti Meridan বা এ.এম (A.M) অর্থাৎ পূর্ব মধ্যাহ্ন এবং সূর্য এই মধ্যচিহ্ন রেখার পশ্চিম দিকে থাকলে তাকে বলে (Post-Meridian) বা পি. এম (P.M)। এ কারণে মধ্যাহ্নের (১২ টার পর) পর থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত সময়কে অপরাহ্ন বা পি. এম (P.M) এবং রাত ১২ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত সময়কে পূর্বাহ্ন বা এ. এম (A.M) বলে। যেহেতু ১০° দ্রাঘিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট তাই যে কোন স্থানের স্থানীয় সময় নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায়। যথা-

উদহারণ : ১ ঢাকা ও বোম্বাই এর দ্রাঘিমা যথাক্রমে ৯০°২৬´ পূর্ব এবং ৭০°৫০´ পূর্ব। ঢাকায় যখন মধ্যাহ্ন, তখন বোম্বাই এর স্থানীয় সময় কত?

সমাধান : ঢাকা ও বোম্বাই এর দ্রাঘিমার পার্থক্য=৯০°২৬´ -৭০°৫০´=১৯°৩৬´ [৬০ মিনিটে ১ ডিগ্রি কোণ হয় অর্থাৎ ৬০´=১°

অতএব, ১৯°৩৬´ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য = ১৯×৪ মিনিট +৩৬×৪ সেকেন্ড [১মিনিট দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের ব্যবধান ৪ সেকেন্ড]

= ৭৬ মিনিট + ১৪৪ সেকেন্ড
= ৭৮ মিনিট, ২৪ সেকেন্ড
= ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২৪ সেকেন্ড

যেহেতু বোম্বাই ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত এ কারণে ঢাকার চেয়ে বোম্বাই এর সময় কম হবে।

সুতরাং, ঢাকার সময় যখন মধ্যাহ্ন বা দুপুর ১২ টা তখন বোম্বাই এর স্থানীয় সময়-

১২ ঘণ্টা – ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২৪ সেকেন্ড
= ১০ ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড (পূর্বাহ্ন)

প্রমাণ সময়

যে কোনো দেশের এক প্রান্তের স্থানীয় সময়ের সাথে অপর প্রান্তের স্থানীয় সময়ের অপেক্ষা ভিন্ন হয়। এ কারণে প্রত্যেক দেশে কোনো মধ্যবর্তী স্থান বা শহরের স্থানীয় সময়কে ঐ দেশের সকল অঞ্চলের নির্দিষ্ট সময় হিসাবে নির্ধারণ করা হয় এবং এই নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহ (রেডিও, টেলিভিশন, ডাক, রেল ও বিমান)সহ অন্যান্য সকল বিভাগের কাজকর্ম পরিচালনা করা হয়।

গাণিতিকভাবে, যে কোনো বৃহৎ অঞ্চলের বা যে কোনো দেশের দ্রাঘিমা রেখার ভিত্তিতে দ্রাঘিমা রেখার নিকটবর্তী স্থানের স্থানীয় সময়কে ঐ বৃহৎ অঞ্চলের বা দেশের নির্দিষ্ট সময় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এটিই প্রমাণ সময়। যেমন- বাংলাদেশের ৯০° দ্রাঘিমায় যে স্থানীয় সময় রয়েছে তাই বাংলাদেশের প্রমাণ সময়। বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রীনিচ সময় হতে ৬ ঘণ্টা এগিয়ে আছে কারণ বাংলাদেশ গ্রীনিচের পূর্বদিকে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে কোনো দেশের মধ্যভাগের উল্লেখযোগ্য স্থানের স্থানীয় সময়কে ঐ দেশের জন্য প্রমাণ সময় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। ৯০° দ্রাঘিমারেখা বাংলাদেশকে প্রায় মধ্যভাগে লম্বভাবে বিভক্ত করেছে। আবার কোনো কোনো দেশের একাধিক প্রমাণ সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন- গ্রীনিচ সময়, মধ্য ইউরোপীয় সময় এবং পূর্ব ইউরোপীয় সময়। ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলো গ্রানিচ সময় অনুসরণ করে। যুক্তরাজ্যের গ্রীনিচ শহরে অবস্থিত রাজকীয় মানমন্দিরের দ্রাঘিমা ০°। এই ভিত্তিতে গ্রীনিচ প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা হয়। গ্রীনিচ প্রমাণ সময়ের বা গানিতিক নিয়ম অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশের প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা যায়।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা
(International Date Line)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের ব্যবধান হয় ৪ মিনিট। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ধারণ করার সময় ১৮০° ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখায় চরম অসুবিধা হয়। যেমন-গ্রীনিচ থেকে দুটি বিমান একই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা ও ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে ১৮০°×৪ মি. + ১৮০°×৪ মি =১৪৪০ মি.= ২৪ ঘণ্টা বা ১দিন। অর্থাৎ উভয়ের ক্যালেন্ডারে তারিখের পার্থক্য হবে ১ দিন। তাই ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখায় যখন রবিবার তখন ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় সোমবার। যেহেতু এই স্থান দুটির অবস্থান একই তাই যুক্তিসংগতভাবে তারিখ ভিন্ন ভিন্ন না হয়ে একই হওয়া উচিত ছিল।

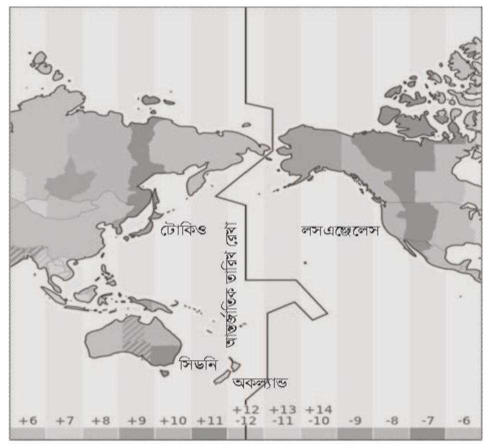

চিত্র ৩.৪.১ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

এই অসুবিধা দূর করার জন্য গ্রীনিচ থেকে ১৮০° পূর্ব বা পশ্চিমে স্থলভাগকে এড়িয়ে আঁকাবাঁকা পথে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা বরাবর একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এই রেখাটিকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে। এ রেখাটি অতিক্রমের সময় পূর্বদিকে গমনকারী ব্যক্তিকে তার ঘড়ির তারিখ একদিন বা ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয় এবং পশ্চিমগামী ব্যক্তিকে তার ঘড়ির তারিখ ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা বাড়িয়ে দিতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা সর্ম্পকে দলগতভাবে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে যে সময় গণনা করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে। সূর্য যখন যে স্থানে ঠিক মাথার উপরে অবস্থান করে সেই সময়কে সে স্থানের মধ্যাহ্ন বা বেলা ১২ টা ধরা হয়। দুপুর ১২টা হতে রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত সময়কে অপরাহ্ন বলা হয়। রাত্রি ১২ টার পর হতে পরবর্তী দুপুর ১২ টা পর্যন্ত সময়কে পূর্বাহ্ন বা (Ante-Meridian) বা (A.M) বলা হয়। অপরদিকে, দুপুর ১২ টা বা মধ্যাহ্ন ১২ টা থেকে রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত সময়কে অপরাহ্ন বা Post-Meridian বা P.M. বলা হয়।

কোনো দেশের বা অঞ্চলের মধ্যবর্তী দ্রাঘিমা রেখার ভিত্তিতে মধ্যবর্তী কোনো উল্লেখযোগ্য স্থানের স্থানীয় সময়কে সে দেশের জন্য বা সেই বৃহৎ এলাকার জন্য ঐ দেশের বা এলাকার প্রমাণ সময় বলে।

পৃথিবীর উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে ১৮০° দ্রাঘিমা রেখাটি আঁকাবাঁকাভাবে জলভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে তাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে। এই রেখা অতিক্রমের সময় পূর্ব দিকে গমনকারী ব্যক্তি ঘড়ির কাঁটা ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিন পিছিয়ে দেন এবং পশ্চিমগামী ব্যক্তি তাঁর ঘড়ির কাঁটা ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মধ্যাহ্ন (Meridies) শব্দটি এসেছে শব্দ থেকে?

(ক) গ্রীক (খ) আরবী

(গ) ল্যাটিন (ঘ) জার্মান

২। বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা কত ঘণ্টা অগ্রগামী?

(ক) ৬ ঘণ্টা (খ) ১২ ঘণ্টা

(গ) ১৫ ঘণ্টা (ঘ) ৮ ঘণ্টা

৩। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কোন জলভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে?

(ক) ভারত মহাসাগর (খ) প্রশান্ত মহাসাগর

(গ) উত্তর মহাসাগর (ঘ) আটলান্টিক মহাসাগর

৪। প্রতি ১° দ্রাঘিমারেখার পার্থক্যের জন্য সময়ের ব্যবধান হয়-

(ক) ৫ মিনিট (খ) ৪ মিনিট

(গ) ৩ মিনিট (ঘ) ২ মিনিট

পাঠ-৩.৫ পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি

Diurnal and Annual Motion of the Earth

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘণ্টা সময়ে অনবরত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এই সময়কে সৌরদিন এবং আবর্তনকে আহ্নিক গতি বা দৈনিক গতি বলা হয়। আহ্নিক গতির মূল কারণ হলো-পৃথিবীর আবর্তন এবং পৃথিবীর আকৃতি। উল্লেখ্য, পৃথিবীর আকৃতি বর্তুলাকার হলেও উভয় মেরুতে কিছুটা চাপা ও নিরক্ষরেখা বরাবর কিছুটা স্ফীত। নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর ব্যাস সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায় এই অঞ্চলে আহ্নিক গতির বেগও সর্বাপেক্ষা অধিক। এই বেগ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার (চিত্র- ১.৫.১)। আহ্নিক গতিবেগ ক্রমশ কমতে কমতে দুই মেরুর নিকটবর্তী স্থানে প্রায় স্তিমিত হয়ে যায়।

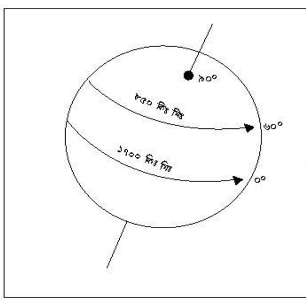

চিত্র ১.৫.১ পৃথিবীর আহ্নিত গতি

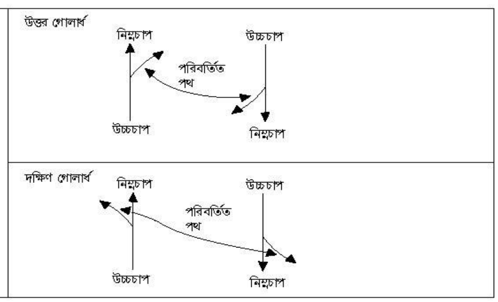

চিত্র ১.৫.২ ফেরেলের কোরিওলিয় সূত্রানুসারে সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন

আহ্নিক গতির ফলাফল

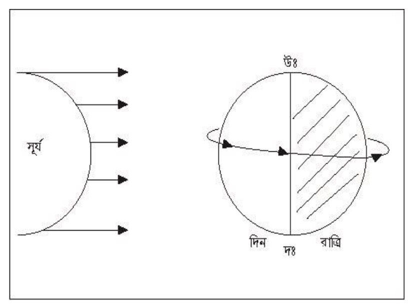

চিত্র ১.৫.৩ দিবারাত্রির সংঘটন

১. **দিবা-রাত্রির সংঘটন :** পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তনের দরুন আহ্নিক গতি বা দিবা-রাত্রি সংঘটিত হয়। আবর্তনরত পৃথিবীর যে (চিত্র- ১.৫.৩) অংশে সূর্যের আলো পড়ে সেই অংশ আলোকিত হয় অর্থাৎ সেই অংশে দিন এবং অপর অংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা রাত থাকে।

২. **জোয়ার-ভাটা :** নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আহ্নিক গতির জন্য সমুদ্রে প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়।

৩. **বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি :** ফেরেলের কোরিওলিস সূত্রানুসারে, আহ্নিক গতির কারণে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয় (চিত্র- ১.৫.২)।

বার্ষিক গতি

পৃথিবী আপন অক্ষের চারিদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করার পাশাপাশি পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর এইরূপ আবর্তনকে বার্ষিক গতি এবং আবর্তনের সময়কে সৌরবছর বলে। ৩৬৫ দিনে এক বছর গণনা করা হয় বলে প্রতি চার বছরে একদিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করা হয়। সেই বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিনে ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ (Leap Year) বলে। পৃথিবীর এই কক্ষপথের দৈর্ঘ্য ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবী সূর্যকে পরিভ্রমনের সময় ৩রা জানুয়ারি পৃথিবী সূর্যের নিকটতম অবস্থানে (১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কি.মি) এবং ৪ জুলাই সর্বাধিক দূরবর্তী অবস্থানে (১৫ কোটি

১০ লক্ষ কি.মি) থাকে। পৃথিবীর এইরূপ অবস্থানকে যথাক্রমে অনুসুর (Perihilion) ও অপসুর (Aphelion) বলে। বার্ষিক গতির গড় বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১,০৭,০০০ কিলোমিটার।

বার্ষিক গতির কারণ

বার্ষিক গতির কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. পৃথিবীর আকার অভিগত গোলকের ন্যায়
২. সূর্যকে পরিভ্রমণের জন্য পৃথিবীর কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার
৩. পৃথিবী নিজ কক্ষপথে (Orbit) ৬৬.৫° কোণে হেলে অবস্থান করছে এবং
৪. পৃথিবী নিজ অক্ষে (Axis) ২৩.৫° কোণে হেলে অবস্থান করছে।

বার্ষিক গতির ফলাফল

বার্ষিক গতির প্রধান দুটি ফলাফল হলো দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তন। পৃথিবী সূর্যকে যে কক্ষপথে পরিবভ্রমণ করে তার দৈর্ঘ্য ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার। এই কক্ষপথে পরিভ্রমণের সময় জানুয়ারি মাসে সূর্য পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে (১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব) থাকে এবং ৪ জুলাই দূরবর্তী অবস্থানে (১৫ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার দূরুত্ব) থাকে। পৃথিবী এবং সূর্যের এইরূপ অবস্থানকে যথাক্রমে অনুসুর (Perihelion) ও অপসুর (Aphelion) বলে। সূর্যের চর্তুদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের সময় পৃথিবী ২১ শে জুন তারিখে পৃথিবীর কক্ষপথের এমন এক স্থানে এসে পৌঁছে, যখন উত্তর মেরু সূর্যের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশি (২৩.৫°) ঝুঁকে থাকে অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি রেখায় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। বিপরীতক্রমে এই সময়ে দক্ষিণ মেরু বা মকরক্রান্তিতে পৃথিবী সূর্য হতে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে থাকে। যার দরুণ দেখা যায়, ২১ শে জুন উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট হয় অপরদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে, দিন সবচেয়ে ছোট এবং রাত্রি সবচেয়ে বড় হয়। এই সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে একই তারিখে অর্থাৎ ২১ শে জুন তারিখে ৬৬.৫° উত্তর অক্ষরেখা হতে উত্তর মেরু পর্যন্ত স্থানটিতে ২৪ ঘণ্টাই দিন থাকে এবং ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষরেখা হতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত স্থানটিতে ২৪ ঘণ্টাই রাত্রি থাকে (চিত্র- ১.৫.৪)।

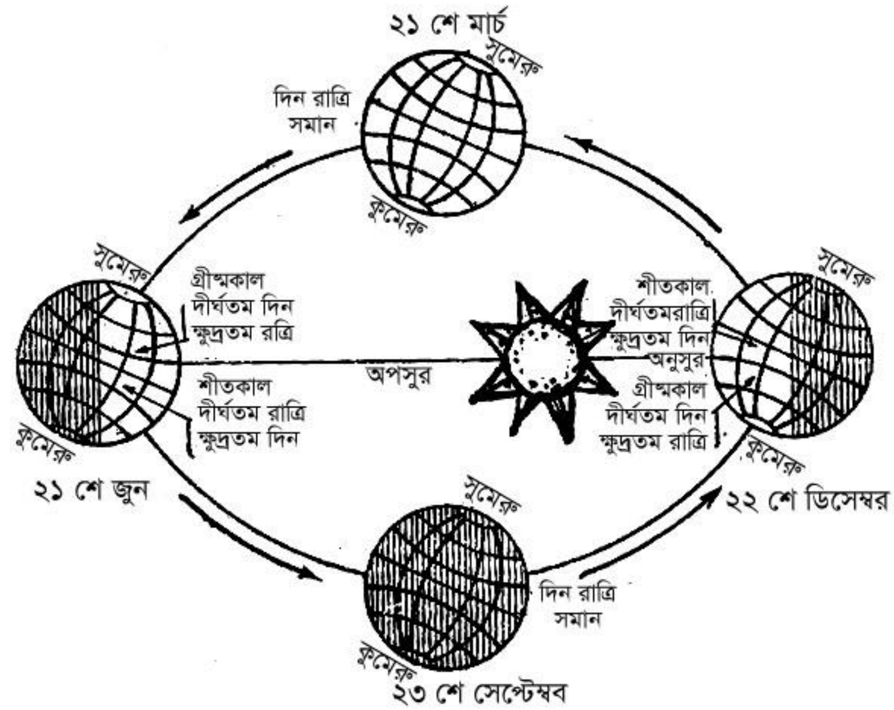

চিত্র ১.৫.৪ পৃথিবীর পরিভ্রমণের জন্য দিবারাশির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন

২১ শে জুনের পর পৃথিবী নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণের সময় ক্রমশ উত্তর মেরুতে পৃথিবী সূর্য হতে দূরে যেতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরুতে পৃথিবী সূর্যের নিকট আসতে থাকে। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে ধীরে ধীরে দিন ছোট হতে থাকে রাত্রি বড় হতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর গোলার্ধের বিপরীত অবস্থা হয়। অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় থাকে এবং রাত ছোট হতে থাকে। এভাবে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণের সময় ২৩ শে সেপ্টেম্বর উভয় মেরুতে (উত্তর ও দক্ষিণ মেরু) সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব সমান থাকে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র ২৩ শে সেপ্টেম্বর দিন রাত্রি সমান থাকে। উত্তর গোলার্ধের ন্যায় একই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধে ২২ শে ডিসেম্বর ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ হতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টাই দিন হয় এবং ৬৬.৫°

উত্তর অক্ষাংশ হতে উত্তর মেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টাই রাত্রি হয়। পৃথিবীর এইরূপ পরিভ্রমণের সময় ২১ শে মার্চ তারিখে পূণরায় ২৩ শে সেপ্টেম্বরের ন্যায় পৃথিবীর কক্ষপথের এমন এক স্থানে এসে পৌঁছে যখন উভয় মেরু সূর্য হতে সমান দূরে অবস্থান করে এবং পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয় (চিত্র- ১.৫.৫)।

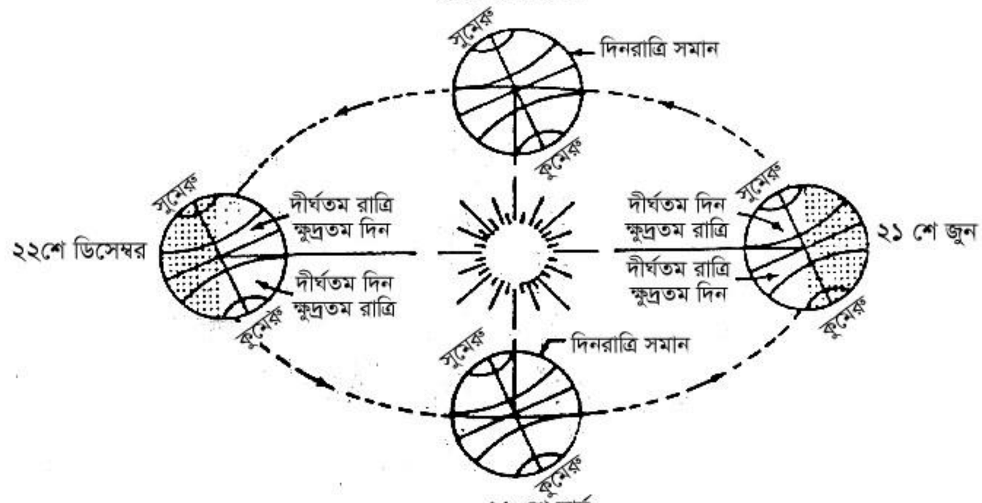

চিত্র ১.৫.৫ পৃথিবীর পরিভ্রমণের জন্য ক্ষুদ্রতম ও দীর্ঘতম দিনরাত্রি

২১ শে সেপ্টেম্বর হতে ২১ শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণ মেরুতে অবিরত দিন এবং উত্তর মেরুতে অবিরত রাত্রি থাকে। এই সময়ে উত্তর গোলার্ধে বসন্ত কাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল থাকে তখন সবচেয়ে বড় দিনের পরিমাণ হয় ১৪ ঘণ্টা এবং বড় রাতের পরিমাণ হয় ১০ ঘণ্টা। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো স্থানের দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সূর্য রশ্মির পতন কোণের পার্থক্যের জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে উভয় মেরুতে উষ্ণতার বা তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটে। এগুলোর মূল কারণ আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে বার্ষিক গতির সম্পর্ক আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

আহ্নিক গতির ফলে দিবা-রাত্রি সংঘটিত হয় এবং বার্ষিক গতির ফলে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তন হয়। ২৩.৫° উত্তর ও ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে সূর্য সর্বদা লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং ২৩.৫° উত্তর ও ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ হতে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সূর্য কখনো লম্বভাবে কিরণ দেয় না। ২১ শে মার্চ এবং ২৩ শে সেপ্টেম্বর উভয় গোলার্ধে দিন এবং রাত্রি সমান থাকে। ২১ শে মার্চ উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল থাকে। ২১ শে জুন উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট হয়। একই তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা হয়। ২২ শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট ও রাত্রি বড় হয় এবং উত্তর গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। এগুলোর মূল কারণ হলো আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট হয়?
(ক) ২২ শে ডিসেম্বর (খ) ২১ শে মার্চ
(গ) ২১ শে জুন (ঘ) ২৩ শে সেপ্টেম্বর

২। সবচেয়ে বড় দিনের পরিমাণ কত?
(ক) ১০ ঘণ্টা (খ) ১২ ঘণ্টা
(গ) ১৪ ঘণ্টা (ঘ) ১৬ ঘণ্টা

পাঠ-৩.৬ জোয়ার ভাটা
Tide and Ebb

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জোয়ার-ভাটার সংজ্ঞা বলতে পারবেন,
- জোয়ার-ভাটার কারণ বলতে পারবেন এবং
- জোয়ার-ভাটার শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জোয়ার ভাটা, মুখ্য জোয়ার, গৌণ জোয়ার, ভরা কটাল, মরা কটাল।

জোয়ার-ভাটা

সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক স্থানে ফুলে ওঠে এবং এক স্থানে নেমে যায়। পানির এইরূপ ফুলে ওঠাকে জোয়ার (Tide or high tide) এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা (Ebb or low tide) বলে। এক স্থানে প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়। জোয়ার ভাটার মধ্যকার ব্যবধান প্রায় ১২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। জোয়ার-ভাটার স্থিতিকাল ৬ ঘণ্টা ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড। সমুদ্রের মোহনা থেকে নদীগুলোর স্রোতের বিপরীতে উজানে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত জোয়ার-ভাটা অধিক হয়। সাধারণত সমুদ্রের মধ্যভাগ অপেক্ষা উপকূলের কাছে অগভীর অংশে জোয়ারের পানির উচ্চতা অধিক থাকে।

জোয়ার-ভাটার কারণ : জোয়ার-ভাটার প্রধান দুটি কারণ হলো-

(ক) মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব এবং (খ) কেন্দ্রাতিগ/বহির্মুখী শক্তি।

মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব (The Force of Gravitational Attraction) : মহাবিশ্বের সব পদার্থ একটি অপরটিকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণকে মহাকর্ষ শক্তি বলে। এ কারণে পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে এবং চন্দ্র সর্বদা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। মহাকর্ষ শক্তি নিম্ন সূত্রানুযায়ী কাজ করে।

$$F = G\frac{M_1 M_2}{d^2}$$

এখানে,
F = মহাকর্ষ শক্তি
G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক
d = দূরত্ব
M_1 = পৃথিবীর ভর/আয়তন
M_2 = চন্দ্রের ভর/আয়তন

কেন্দ্রাতিগ/বহির্মুখী শক্তি (Certrifugal Force) : কেন্দ্রাতিগ শক্তি হলো, কেন্দ্র থেকে চারদিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রবণতা। পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে। ফলে পৃষ্ঠ হতে পানি ও বায়ু ছিটকে যেতে চায়। এভাবে ছিটকে পড়ার প্রবণতাকে কেন্দ্রাতিগ শক্তি বলে। জোয়ার ভাটার সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ শক্তি একটি প্রধান শক্তি। পৃথিবী নিজ কক্ষ পথে ঘূর্ণনের সময় নিম্নোক্ত সূত্রানুযায়ী কেন্দ্রাতিগ শক্তি কাজ করে। যথা:

$$F_c = \frac{MV^2}{r}$$

এখানে,
Fc = কেন্দ্রাবিমুখী শক্তি/কেন্দ্রাতিগ শক্তি
M = পৃথিবীর ভর
V = পৃথিবীর গতিবেগ
r = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ

জোয়ার-ভাটার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Tides) : জোয়ার-ভাটাকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যথা :

১. মুখ্য জোয়ার
২. গৌণ জোয়ার
৩. ভরা কটাল
৪. মরা কটাল।

মুখ্য জোয়ার (Primary Tide) : প্রধানত চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার-ভাটা সংঘটিত হয়। চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে সর্বদা ঘুরছে। আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের নিকটবর্তী সেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। ফলে চারদিক হতে পানি এসে চন্দ্রের দিকে ফুলে ওঠে এবং জোয়ার হয়। এরূপে সৃষ্ট জোয়ারকে মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বা Primary Tide বলে।

গৌণ জোয়ার (Seconday Tide) : পৃথিবীর যে পাশে চন্দ্র আকর্ষণ করে তার বিপরীত দিকে পৃথিবীকে চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তির প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। আবার পানির নিম্নের কঠিন স্থলভাগ যা পৃথিবীর সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। ফলে তার ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ কেন্দ্র স্থলের আকর্ষণেরই সমান এবং বিপরীত দিকের জলরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এই সময় চন্দ্রের বিপরীত দিকের জলরাশির ওপর মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কমে যায় এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তির সৃষ্টি হয়। এতে চারদিক হতে পানি ঐ স্থানে এসে জোয়ারের সৃষ্টি করে। এভাবে চন্দ্রের বিপরীত দিকে যে জোয়ার হয় তাকে গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার বা Secondary Tide বলে (চিত্র- ১.৬.১)।

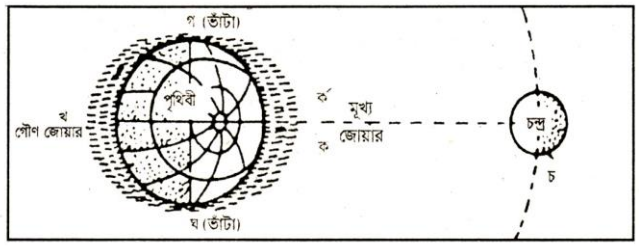

চিত্র ১.৬.১ জোয়ার ভাটা (মূখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার)

ভরা কটাল বা তেজ কটাল (Spring Tide) : অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে (চিত্র- ৩.৬.২) এবং উভয়ের মিলিত শক্তিতে আকর্ষণ প্রবল হয় এবং পানি বেশি ফুলে ওঠে। এই ধরনের জোয়ারকে ভরা কটাল বা তেজ কটাল (Spring Tide) বলে। অপরদিকে পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর একদিকে সূর্য এবং অন্যদিকে চন্দ্র একই সমান্তরালে অবস্থান করে (চিত্র- ১.৬.৩) এবং চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, সেখানেই সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়। আবার চন্দ্রের বিপরীত দিকে যেখানে তার আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়। অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে উভয় বিপরীত স্থানেই জোয়ারের বেগ সর্বাধিক হয়। একেও ভরা কটাল বা তেজ কটাল (Spring Tide) বলে।

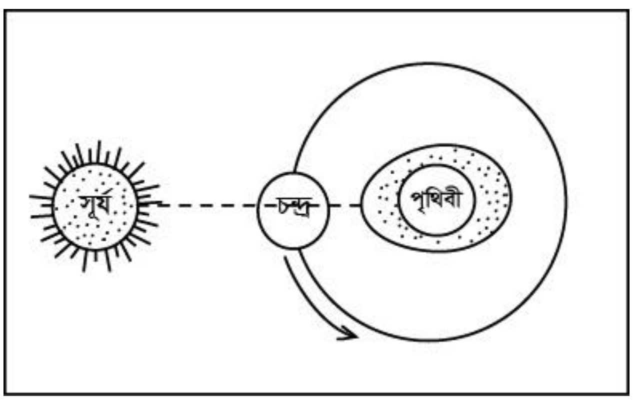

চিত্র ১.৬.২ অমাবস্যা তিথিতে ভরা কটাল

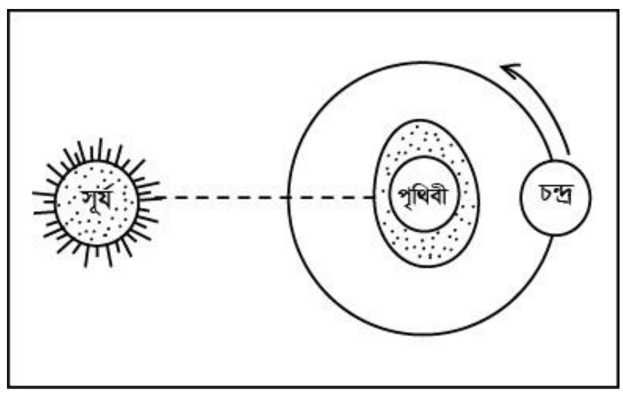

চিত্র ১.৬.৩ পূর্ণিমা তিথিতে ভরা কটাল

মরা কটাল (Neap Tide) ঃ অষ্টমী ও একবিংশ তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য সমান্তরাল না থেকে উভয়ই পৃথিবীর সাথে এক সমকোণে থেকে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে (চিত্র- ১.৬.৪)। তখন চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণে সেখানে ভাটা হয়। সূর্যের আকর্ষণের কারণে চন্দ্রের দিকে পানি অধিক স্ফীত হতে পারে না। এই ধরনের জোয়ারকে মরা জোয়ার বা মরা কটাল (Neap Tide) বলে।

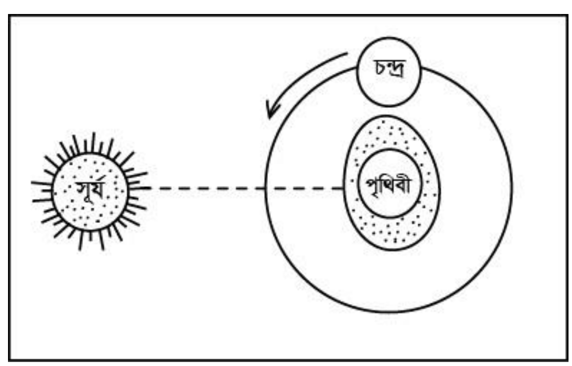

চিত্র ১.৬.৪ মরা কটাল

শিক্ষার্থীর কাজ	সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশসমূহে জোয়ার-ভাটার প্রভাবসমূহের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

মহাকর্ষ শক্তি এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তির কারণে সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে একই জায়গায় ফুলে ওঠে আবার অন্য সময় নেমে যায়। সমুদ্রের পানির এইরূপ ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। জোয়ার-ভাটাকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- মুখ্য জোয়ার, গৌণ জোয়ার, ভরা কটাল ও মরা কটাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভরা কটাল (Spring Tide) কখন হয়?

(ক) অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে (খ) ঘূর্ণিঝড়ের সময়

(গ) বর্ষার সময় (ঘ) বন্যার সময়

২। কোন সময়ে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সমকোণে অবস্থান করে?

(ক) ভরা কটালের সময় (খ) মরা কটালের সময়

(গ) মুখ্য জোয়ারের সময় (ঘ) পূর্ণিমার সময়

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ : ১। খ ২। গ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ : ১। গ ২। গ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ : ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ : **১। গ ২। গ**

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল) প্রশ্ন

১। নিম্নের চিত্রটি লক্ষ করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ।

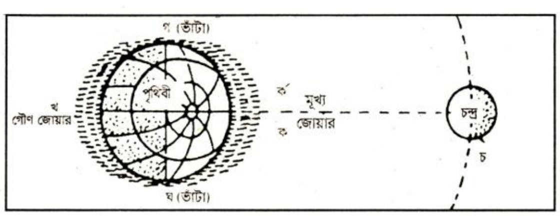

(ক) উপরের চিত্রটি কীসের? ১

(খ) জোয়ার-ভাটার কারণ কী? ২

(গ) সূত্র উল্লেখপূর্বক জোয়ার-ভাটার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন। ৩

(ঘ) চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থানের জন্য জোয়ার-ভাটাকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে- বিশ্লেষণ করুন। ৪

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু
Physiography and Climate of Bangladesh

ইউনিট ৪

ভূমিকা : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভূ-রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের তিনদিকে ভারত ও মিয়ানমার এবং দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এদেশে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু মানুষের জীবনধারাকে বহুভাবে প্রভাবিত করে। এদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যতার পাশাপাশি এদেশের জলবায়ুও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতু দেখা যায়। এগুলো হলো-উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল এবং শুষ্ক ও শীতল শীতকাল। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি কারণে এদেশ প্রায় প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। এসব দুর্যোগ জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে যা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এই ইউনিটে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা, ভূ-প্রকৃতি, ভূমি ব্যবহার, জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা
পাঠ-৪.২ : ভূ-প্রকৃতি
পাঠ-৪.৩ : ভূমি ব্যবহার
পাঠ-৪.৪ : বাংলাদেশের জলবায়ু
পাঠ-৪.৫ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ

পাঠ-৪.১ ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা
Geographical Location and Boundary

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- সীমানা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা।

ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দক্ষিণ এশিয়া অংশে এদেশের অবস্থান (চিত্র-২.১.১)। বাংলাদেশ ২০°৩৪ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের প্রায় মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। যা এদেশকে ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এদেশের অবস্থান বহির্বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃতি ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃতি প্রায় ৭৬০ কিলোমিটার। দেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রসার ঘটলে অর্থাৎ ভূ-ভাগ জেগে উঠলে ভবিষ্যতে আয়তন আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র ২.১.১ : দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান

সীমানা (Boundary) : বাংলাদেশের তিনদিকের স্থলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণে অবস্থিত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। এ দেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিয়ানমার অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট সীমারেখা ৪,৭১২ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের সাথে সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সাথে ২৮১ কিলোমিটার। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল

মাইল বা ২২.২২ কিলোমিটার এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪০ কিলোমিটার (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার)।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ছকে বাংলাদেশের তথ্যগুলো পূরণ করুন।

আয়তন	চতুর্দিকের সীমানা	ভারত, মিয়ানমার ও বঙ্গোপসাগরের সাথে সীমারেখার দৈর্ঘ্য

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। তিনদিকের স্থলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের মোট সীমারেখা ৪,৭১২ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৩,৭১৫ কিলোমিটার, মিয়ানমার ২৮১ কিলোমিটার এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা ৭১৬ কিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এদেশ বহির্বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত?
(ক) এশিয়া (খ) ইউরোপ
(গ) আফ্রিকা (ঘ) উত্তর আমেরিকা

২। বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত বেষ্টিত দেশ হলো-
i. ভারত ii. নেপাল
iii. মিয়ানমার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। বাংলাদেশের আয়তন কত?
(ক) ১,৩৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (খ) ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার
(গ) ১,৫৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (ঘ) ১,৬৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার

৪। বাংলাদেশের মাঝ বরাবর কোন রেখা অতিক্রম করেছে?
(ক) মকরক্রান্তি রেখা (খ) নিরক্ষরেখা
(গ) মূল মধ্যরেখা (ঘ) কর্কটক্রান্তি রেখা

৫। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাংলাদেশের বিস্তৃতি কত কিলোমিটার?
(ক) ৪৪০ কিলোমিটার (খ) ৪৬০ কিলোমিটার
(গ) ৪৮০ কিলোমিটার (ঘ) ৫০০ কিলোমিটার

পাঠ-৪.২ ভূ-প্রকৃতি
Physiography

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির শ্রেণিবিভাগ জানতে পারবেন;
- টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহের অবস্থান বলতে পারবেন এবং
- সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভূ-প্রকৃতি, টারশিয়ারি, প্লাইস্টোসিনকাল, প্লাবন সমভূমি ।

ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এ দেশের বৃহৎ নদীসমূহ পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবেশ করে একযোগে সুবিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি অংশ ব্যতীত সমগ্র দেশ নদীবেষ্টিত পলল দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে বিস্তৃত।

ভূ-গাঠনিক অবস্থা এবং গঠন সময় অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র-২.২.১)। নিম্নের ছকে ভূ-প্রকৃতির প্রকারভেদ দেখানো হলো-

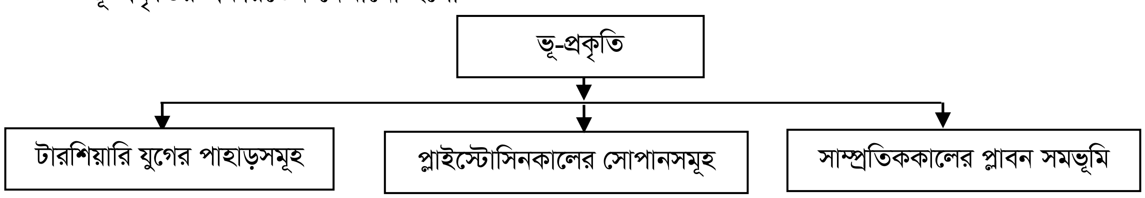

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় যে সকল পর্বতের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড় হিসেবে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বের সময়কে টারশিয়ারি যুগ বলা হয়। এ পাহাড়সমূহ বেলেপাথর, শেল ও কদর্ম দ্বারা গঠিত। রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়সমূহ টারশিয়ারি যুগের অন্তর্ভুক্ত। এ পাহাড়সমূহ আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধারণা করা হয়। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

ক. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ৬১০ মিটার। পাহাড়সমূহের বৈশিষ্ট্য হলো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাঁজযুক্ত এ পাহাড়সমূহ উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কৃত বান্দরবান জেলায় অবস্থিত তাজিং ডং (বিজয়) পর্বতশৃঙ্গটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এটি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ছিল বান্দরবান জেলার কিওক্রাডং, যার উচ্চতা ১,২৩০ মিটার। এ অঞ্চলের পাহাড়ের মাঝে মাঝে অসংখ্য সংকীর্ণ উপত্যকা রয়েছে। যেখান দিয়ে পার্বত্য নদীগুলো প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। পার্বত্য এসব নদীর মধ্যে কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা, কাসালং, নাফ অন্যতম। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এসব পাহাড় কৃষিকাজের উপযোগী নয়। তবে স্থানীয় অধিবাসীগণ পাহাড়ের ঢালে জুম পদ্ধতিতে সীমিত পরিসরে চাষাবাদ করে থাকে। কয়েক বছর চাষাবাদের পর আবার অন্যস্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করে একই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে।

খ. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের পাহাড়সমূহের গড় উচ্চতা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতার তুলনায় কম। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহের গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। তবে উত্তরের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার এবং এগুলোকে স্থানীয়ভাবে টিলা বলে। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক শহরের উত্তরে প্রায় ৪০ কি.মি এলাকা জুড়ে একটি টিলা পাহাড় রয়েছে যা 'ছাতক পাহাড়' নামে পরিচিত। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণে অবস্থিত পাহাড়গুলোর ঢাল বেশ খাড়া এবং উপরিভাগ অসমান। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হওয়ায় পাহাড়ের ঢালে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান এ অঞ্চলে অবস্থিত।

২. প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ : আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে ও ধূসর হওয়ায় অন্যান্য অঞ্চলের মাটি হতে সহজেই পৃথক করা যায়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় এর অন্তর্ভুক্ত। প্লাইস্টোসিনকালে এসব সোপান বা উচ্চভূমি গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নিম্নে প্লাইস্টোসিনকালের এসব সোপান বর্ণনা করা হলো–

ক. বরেন্দ্রভূমি : রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট এবং রংপুর বিভাগের রংপুর, গাইবান্ধা ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। এটি বঙ্গ অববাহিকায়

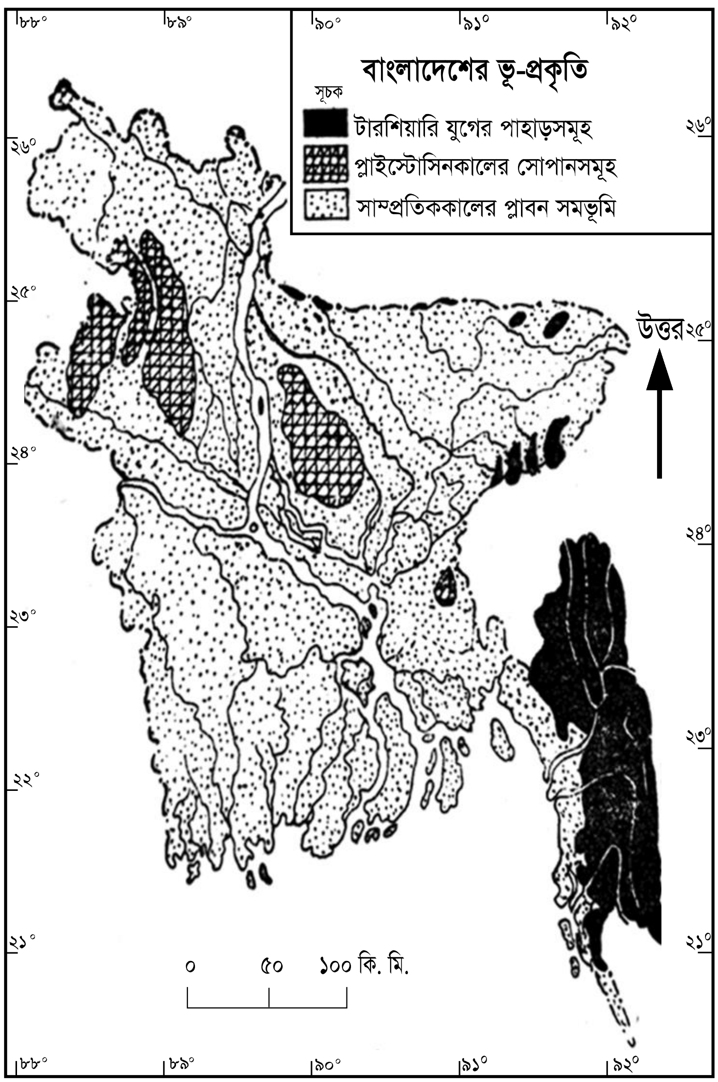

চিত্র-২.২.১: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

প্লাইস্টোসিনকালের সর্ববৃহৎ উচ্চভূমি। প্লাবন সমভূমি থেকে বরেন্দ্রভূমির গড় উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা অসমতল। বর্তমানে বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্প এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ উচ্চভূমি কৃষিকাজের জন্য বিশেষ উপযোগী করা হয়েছে। ধান এখানকার প্রধান কৃষিজ ফসল। এছাড়া পাট, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

খ. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় : উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হতে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত এ উচ্চভূমি বিস্তৃত। এ অঞ্চলটি টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় নিয়ে গঠিত। এর আয়তন ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। এটি প্লাইস্টোসিনকালের দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চভূমি। এখানকার মাটি লালচে এবং কংকরময় বলে কৃষিকাজের জন্য তেমন উপযোগী নয়। তবে প্রচুর পরিমাণে আনারস উৎপন্ন হয়। বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ এ উচ্চভূমি গজারী বৃক্ষের কেন্দ্র। এজন্য এটি গজারী বৃক্ষের বনভূমি হিসেবেও পরিচিত।

৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি বাংলাদেশকে একটি উর্বর কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করেছে। কেননা, টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ পলি দ্বারা গঠিত বিস্তীর্ণ সমভূমি। এ প্লাবন সমভূমির বয়স ১২,০০০ বছরের কম। পদ্মা, মেঘনা, যমুনাসহ অসংখ্য ছোট-বড় নদী সারা দেশে জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। এসব নদী সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় প্রতি বছর বন্যার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এভাবে বন্যার সঙ্গে বাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে দেশের বিস্তীর্ণ প্লাবন সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। এ প্লাবন সমভূমি উত্তর দিক থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র সমতলে মিশেছে। দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার, নারায়নগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার। এ অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জলাভূমি ও নিম্নভূমি। স্থানীয়ভাবে এসব জলাভূমি ও নিম্নভূমিকে বিল, ঝিল বা হাওড় বলে। রাজশাহীর চলনবিল, ঢাকার আড়িয়াল বিল, গোপালগঞ্জের বিল এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার বিল ও হাওড় অন্যতম। মেঘনা নদীর মোহনায় রয়েছে হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে আরোও কিছু ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। এসব দ্বীপের মাটি উর্বর এবং মানব বসতির উপযোগী।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. হিমালয় পর্বত হতে বাহিত পলল দ্বারা গঠিত রংপুর ও দিনাজপুরের পাদদেশীয় সমভূমি।

খ. ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার বন্যাপ্রবণ সমভূমি।

গ. খুলনা, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি। এ অঞ্চলের নদীতে প্লাবন কম হয়, তবে নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয়।

ঘ. নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি। এখানকার পতেঙ্গা সৈকত, কক্সবাজার সৈকত এবং টেকনাফ সৈকত পর্যটনের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ঙ. ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা এবং ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে ব-দ্বীপ সমভূমি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে পাহাড়, উচ্চভূমি বা সোপানসমূহ এবং বিস্তীর্ণ প্লাবন সমভূমি। যা এখানকার কৃষি, মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ব্যাপক বিস্তার করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ভূ-প্রকৃতিগুলোর তিনটি করে বৈশিষ্ট্য লিখুন।

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়	প্লাইস্টোসিনকালের সোপান	সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এদেশের ভূ-প্রকৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ভূ-গাঠনিক অবস্থান এবং গঠন সময়ের উপর ভিত্তি করে ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড় নামে পরিচিত। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ ও প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি দ্বারা গঠিত। নদী বিধৌত প্লাবন সমভূমি কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত উর্বর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

২। টারশিয়ারি যুগের পাহাড় রয়েছে কোন জেলায়?
i. দিনাজপুর ii. খাগড়াছড়ি
iii. রাঙামাটি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। তাজিং ডং (বিজয়) এর উচ্চতা কত?
(ক) ১,১৩১ মিটার (খ) ১,২৩১ মিটার
(গ) ১,৩৩১ মিটার (ঘ) ১,৪৩১ মিটার

৪। মধুপুর গড় অবস্থিত-
i. ময়মনসিংহ ii. খাগড়াছড়ি
iii. টাঙ্গাইল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শাম্মীর গ্রামের বাড়ি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি জেলায়। অনুকূল ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সেখানে প্রচুর চা বাগান গড়ে উঠেছে। যা এই এলাকাকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলটি কোন ধরনের ভূ-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত?
(ক) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ের (খ) প্লাইস্টোসিনকালের সোপানের
(গ) সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির (ঘ) কোনটিই নয়

৬। আলোচ্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়
ii. সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিং ডং
iii. উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ ভূমি ব্যবহার
Land Use

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ভূমি ব্যবহার বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- গ্রামীণ ও নগর ভূমি ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভূমি, গ্রামীণ, নগর।

ভূমি ব্যবহার

সাধারণভাবে ভূমি ব্যবহার বলতে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভূমির যে কোনো ব্যবহারকে বুঝায়। অর্থাৎ ভূমি ব্যবহার শব্দদ্বয় দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ কোনো এলাকার জমিগুলো প্রকৃতপক্ষে কী ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়। ভূমি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতির এই সম্পদকে কেন্দ্র করেই মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আমাদের দেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় ভূমির উপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। তাই ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ভূমি বিন্যাস : আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। স্বল্প আয়তনের এই দেশে বসবাস করছে প্রায় ১৫.৮৯ কোটি মানুষ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৭ জন (মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বিবিএস)। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভূমির ব্যবহার মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারের ধরণ : মানুষের জীবনপ্রণালির সাথে ভূমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমি ছাড়া ফসল উৎপাদন, কল-কারখানা স্থাপন, ঘরবাড়ি নির্মাণ কোনো কিছুই সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। যথা- গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার এবং শহুরে বা নগর ভূমি ব্যবহার। সারণি ২.৩.১ এ গ্রামীণ ও নগর ভূমির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ২.৩.১ : বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর ভূমির পরিমাণ

ভূমির ধরণ	ভূমির পরিমাণ (ব.কি.মি)	শতকরা হার (%)
গ্রামীণ ভূমি	১,৩২,৮১৩	৯০.০০
নগর ভূমি	১৪,৭৫৭	১০.০০
মোট	১,৪৭,৫৭০	১০০.০০

উৎস : মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ (বিবিএস)

গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের মোট ভূমির ৯০% গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের প্রধানক্ষেত্র কৃষি ও বসতবাড়ি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের ধরণেও বৈচিত্র্য এসেছে। নিম্নে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের ধরণ বর্ণনা করা হলো–

১. কৃষি : বাংলাদেশের মোট ভূমির অধিকাংশই কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত ভূমি মূলত গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। যা গ্রামীণ মানুষের জীবিকার প্রধান মাধ্যম। কৃষিজাত শস্যসমূহের মধ্যে ধান, গম, পাট, ইক্ষু, আলু, সরিষা, ভুট্টা, বিভিন্ন ধরনের সবজি অন্যতম। এখনো বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি ও কৃষি উৎপাদিত ফসল।

২. বসতবাড়ি : গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য খোলামেলা বসতবাড়ি। বেশিরভাগ গ্রামীণ বসতবাড়ির মধ্যখানে উঠান, বহিরাঙ্গণ, চতুর্দিকে গাছ-গাছালি থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ বসতবাড়ির ধরণে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে যা গ্রামীণ ভূমির চিরাচরিত ব্যবহারের পরিবর্তন নির্দেশ করে। যৌথ পরিবারের ভাঙনের ফলে অধিক বসতবাড়ি নির্মিত হচ্ছে এবং বসতবাড়ির আকার ছোট হচ্ছে। নতুন নতুন বসতবাড়ি নির্মাণের ফলে কৃষি জমির উপর চাপ পড়ছে।

৩. কৃষি খামার : বাংলাদেশের গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারে কৃষি খামারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ এলাকায় জমি ক্রয় বা লিজ নিয়ে কৃষি খামার গড়ে তুলছে। এসব খামারের মধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য খামার, গরু মহিষ বা ছাগলের খামার, ফলের বাগান, কৃষি ফসল উৎপাদন অন্যতম।

৪. বনভূমি : গ্রামীণ ভূমির একটি অংশ বাগান বা বনভূমির জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব বাগান বা বনভূমি বড় না হলেও ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। এতে বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ, বাঁশ ইত্যাদি থাকে।

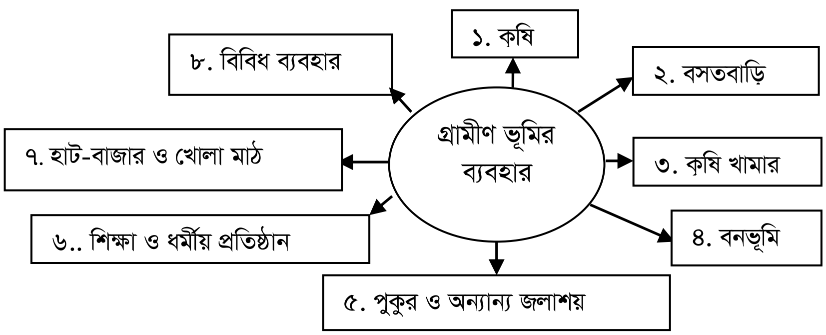

৫. পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় : অবস্থাপন্ন প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পুকুর। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় হাওড়, বাওড়, খাল, ডোবাসহ বিভিন্ন জলাভূমি দেখা যায়। এসব জলাশয় দেশের মৎস্যের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : প্রায় প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণত খোলামেলা পরিবেশে নির্মাণ করা হয়। প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ দেখা যায়, যা গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৭. হাট-বাজার ও খোলা মাঠ : গ্রামীণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য হাট-বাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ হাট-বাজারে কৃষক তাদের উৎপাদিত বাড়তি পণ্য বিক্রয় এবং প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে থাকে। খোলা মাঠে সাধারণত মেলা, খেলাধূলা, গরু-ছাগল চারণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

৮. বিবিধ ব্যবহার : রাস্তাঘাট, ফল-ফুলের বাগান, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের অফিসসহ বহুবিধ কাজে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার করা হয়।

শহুরে বা নগর ভূমি ব্যবহার

বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে নগর এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এতে নগর ভূমির চাহিদা এবং ব্যবহার উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি নগর এলাকায় ভূমির বহুমুখী ব্যবহার থাকায় নগর ভূমির ধারণ ক্ষমতার উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। নগর ভূমির প্রধান ব্যবহারসমূহ নিম্নে দেখানো হলো–

১. আবাসিক এলাকা : নগর ভূমির একটি বৃহৎ অংশ আবাসিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নগর এলাকায় অভিজাত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ভিন্ন ধরনের আবাসিক এলাকা গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন-আমরা যদি রাজধানী ঢাকার আবাসিক ভূমি ব্যবহার লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, উত্তরা, বসুন্ধরা, বারিধারা অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত। আবার নিম্ন আয়ের মানুষ কারওয়ান বাজার, মগবাজার প্রভৃতি এলাকার রেললাইনের ধারে বা কোনো সরকারি খাস জমিতে ঘিঞ্জি পরিবেশে বস্তি এলাকায় মানবেতর জীবনযাপন করে। এছাড়া প্রায় গোটা ঢাকা শহরেই বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য আবাসিক ভবন গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিত ভবনের পাশাপাশি অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র বহু ভবন গড়ে উঠছে। এতে জনজীবন ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। দেশের অন্যান্য বিভাগীয় এবং জেলা শহরগুলোতেও বহুতল ভবন নির্মাণের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

২. বাণিজ্যিক এলাকা : নগর এলাকার অন্যতম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্য। নগরীয় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেশাদারী চাকুরি, পণ্যের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র অন্যতম। নগর এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় প্রকার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অসংখ্য মানুষ সম্পৃক্ত থাকে।

৩. শিল্প এলাকা : নগর ভূমির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিল্পের অবস্থান। নগর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের আধিক্য থাকায় ভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। যেমন- ঢাকার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, গাজীপুরের টঙ্গী শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, নগর এলাকার বাইরেও বিস্তৃত শিল্প এলাকা গড়ে উঠছে। এছাড়া সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলছে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সাধারণত নগর এলাকায় অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে। জনসংখ্যার আধিক্য এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকায় নগরীয় এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি ব্যবহার করা হয়।

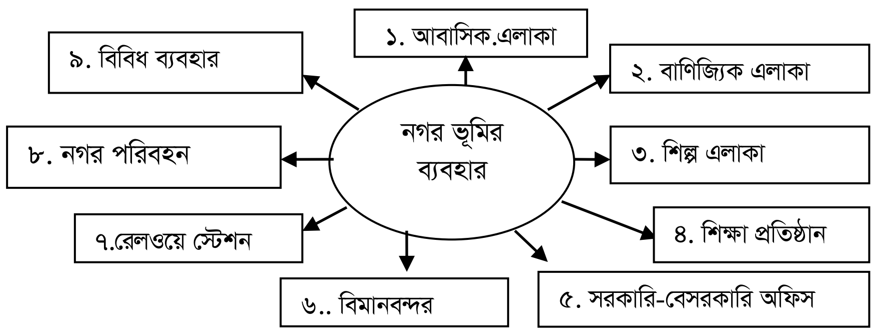

৫. সরকারি-বেসরকারি অফিস : সাধারণত নগর এলাকায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিস থাকে। অন্যান্য শহরের তুলনায় রাজধানী ঢাকায় অফিস-আদালতের সংখ্যা অনেক বেশি।

৬. বিমানবন্দর : বড় বড় নগরগুলোতে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে থাকে বিমানবন্দর। বিমানবন্দর কেন্দ্রিক বিভিন্ন স্থাপনাও নগর ভূমির অন্যতম ব্যবহার।

৭. রেলওয়ে স্টেশন : বিভিন্ন নগর এলাকায় রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করা হয়। ফলে নগর ভূমির একটি অংশ স্টেশন কেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

৮. নগর পরিবহন এলাকা : একটি পরিকল্পিত নগরের জন্য পর্যাপ্ত নগর পরিবহণ আবশ্যক। নগর এলাকায় পরিবহন ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো সড়কপথ। এছাড়া রয়েছে রেলপথ, বিমানপথ এবং নৌপথ। নগর এলাকায় অধিক জনসংখ্যা থাকায় নগর ভূমির একটি বড় অংশ পরিবহন কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে আমাদের দেশে নগর পরিবহনে চাহিদার তুলনায় ভূমির পরিমাণ অনেক কম। ফলে বড় বড় নগরগুলোতে যানজট লেগেই থাকে।

৯. বিবিধ ব্যবহার : নগর ভূমির বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- বিনোদন এলাকা, পার্ক, জাদুঘর, খেলার মাঠ, খোলা মাঠ, সেনানিবাস, নদীবন্দর প্রভৃতি।

ভূমি ব্যবহারের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব : বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় স্বল্প ভূমিকে বহুমুখী ব্যবহার করতে হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, পরিবহনসহ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে বনভূমি, জলাভূমি, কৃষিভূমি প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কমে যাচ্ছে কৃষিভূমি, বনভূমি, খাল-বিল, নদী এলাকা, খোলা মাঠের পরিমাণ। এছাড়া অধিক জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করতে হয়। এতে করে ভূমির ধারণ ক্ষমতার উপর চাপ পড়ে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবারের জমির বিভক্তি বাড়ছে। এতে ভূমিতে ছোট ছোট আইল দেওয়ার কারণে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায় যে, ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় ভূমির ধারণ ক্ষমতার উপর চাপ পড়ছে। এতে করে ভূমির টেকসই বহন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার গুরুত্ব : অর্থনৈতিক এবং স্থানিক দিক বিবেচনায় ভূমি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা। ভূমির সর্বোচ্চ টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, কর্মসংস্থান, বিনোদন, শিক্ষা, যাতায়াত, নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাগুলো ভূমি ব্যবহারের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। অপরিকল্পিতভাবে জলাভূমি ভরাট বা বনভূমি উজাড় করলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। গ্রামীণ এবং শহুরে বা নগর ভূমি ব্যবহারের সঠিক এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার বন্ধ, পরিকল্পিত নগরায়ন, বনভূমি ও জলাভূমি সংরক্ষণ, বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার ভূমির ব্যবহার উল্লেখপূর্বক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় একই ভূমির বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। এদেশের ভূমি ব্যবহারকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার এবং শহুরে বা নগর ভূমির ব্যবহার। গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের প্রধান বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ভূমি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় যা দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণসহ কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। এছাড়া বসতবাড়ি, কৃষিভিত্তিক খামার, বনভূমি, জলাভূমি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, নগর ভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আবাসিক এলাকা, শিল্প ও বাণিজ্য এলাকা, সরকারি-বেসরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তোলা হয়। গ্রামীণ ও নগর ভূমির বহুবিধ ব্যবহার থাকায় এর সঠিক পরিকল্পনা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। কেননা ভূমির সাথে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ভূমির সঠিক এবং সর্বোত্তম ব্যবহারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে গ্রামীণ ভূমির পরিমাণ শতকরা কত ভাগ?

(ক) ৭৫% (খ) ৮০%
(গ) ৮৫% (ঘ) ৯০%

২। ভূমি হলো-

i. প্রাকৃতিক সম্পদ ii. অপ্রাকৃতিক সম্পদ iii. কৃত্রিম সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। গ্রামীণ ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় কোন খাতে?

(ক) বসতবাড়ি (খ) পুকুর
(গ) কৃষি (ঘ) শিল্প-কারখানা

৪। নগর ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো-

i. আবাসিক ব্যবহার
ii. শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র
iii. সরকারি-বেসরকারি অফিস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ বাংলাদেশের জলবায়ু
Climate of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের জলবায়ুর ঋতুভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন ঋতুর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শীতকাল ।

জলবায়ু

জলবায়ু বলতে কোনো দেশ বা বৃহৎ অঞ্চলের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় অবস্থাকে বুঝায়। আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির দৈনন্দিন গড় অবস্থা। সুতরাং বলা যায় যে, আবহাওয়া হলো কোনো একটি ক্ষুদ্র এলাকার বায়ুমণ্ডলের ক্ষণস্থায়ী অবস্থা এবং জলবায়ু কোনো দেশ বা বৃহৎ অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের দীর্ঘকালীন অবস্থা।

বাংলাদেশের জলবায়ু (Climate of Bangladesh) : বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র এবং সমভাবাপন্ন। দেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এবং মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব অধিক থাকায় সামগ্রিকভাবে এদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়। এখানকার জলবায়ুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মৌসুমী বায়ু। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার এবং গড় তাপমাত্রা ২৬° সেলসিয়াস। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং বায়ুপ্রবাহের উপর ভিত্তি করে তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতু দেখা যায়। এগুলো হলো- গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল এবং শীতকাল।

১. গ্রীষ্মকাল (Summer Season) : বাংলাদেশের উষ্ণতম ঋতু গ্রীষ্মকাল। মার্চ থেকে মে (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল ধরা হয়। এ সময় সূর্যের উত্তরায়নের ফলে উত্তাপের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বঙ্গোপসাগর থাকায় এ সময় তাপমাত্রা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে,

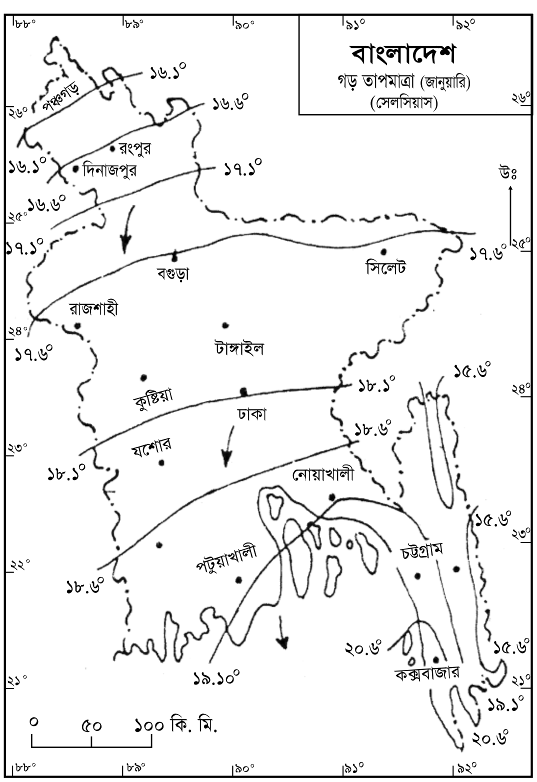

চিত্র-২.৪.১: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

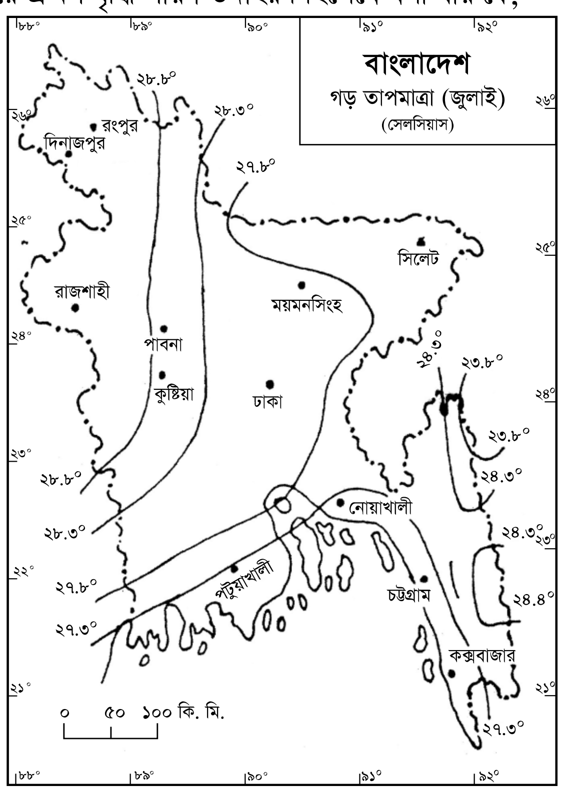

চিত্র-২.৪.২: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

এপ্রিল মাসে যখন কক্সবাজারে তাপমাত্রা ২৭.৬৪° সেলসিয়াস তখন রাজশাহীতে তাপমাত্রা প্রায় ৩০° সেলসিয়াস। এ ঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১° সেলসিয়াস। এপ্রিল মাসে গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৮° সেলসিয়াস এবং এটি বছরের উষ্ণতম মাস। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কালবৈশাখী ঝড়। এসময় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সংঘটিত হয় এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫১ সেন্টিমিটার। এ ঋতুতে বাংলাদেশের দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ অধিক উত্তাপের ফলে উপরে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে বজ্রসহ ঝড়-বৃষ্টি হয় যা কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

২. বর্ষাকাল (Rainy Season) : বাংলাদেশে জুন হতে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল স্থায়ী হয়। এ সময় সূর্য বাংলাদেশের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার কথা থাকলেও সারাদেশে কম-বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় খুব বেশি তাপমাত্রা অনুভূত হয় না। এ ঋতুতে গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস। তবে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে তুলনামূলক বেশি তাপমাত্রা থাকে। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প ধারণ করে। যা ঘনীভূত হয়ে শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ ঋতুতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে। বর্ষা ঋতুতে উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু অন্তর্হিত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্রানুসারে উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে পরিণত হয়। এ ঋতুর শেষ দিকে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে দেখা যায়।

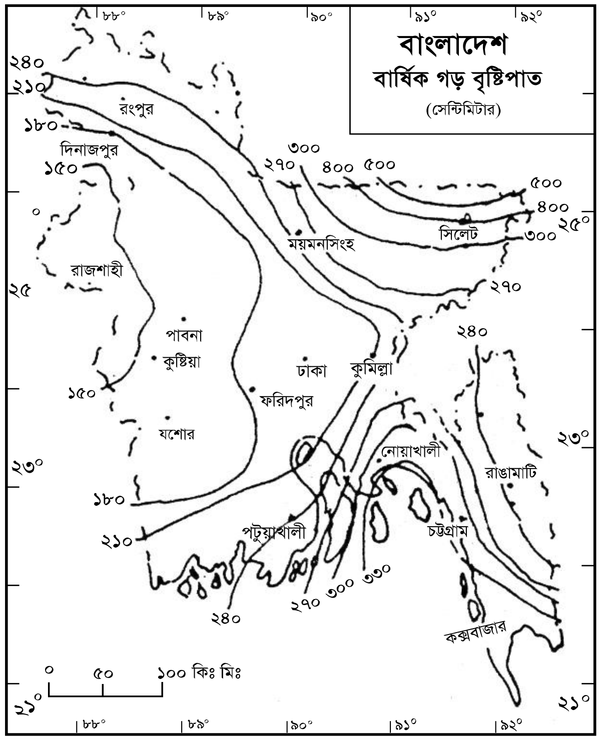

চিত্র-২.৪.৩: বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

৩. শীতকাল (Winter Season) : সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি (কার্তিক-ফাল্গুন) মাস পর্যন্ত শীতকাল ধরা হয়। এ সময় সারা দেশে তাপমাত্রা কমতে থাকে। এ ঋতুটি ঠান্ডার সময় হিসেবে পরিচিত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘন কুয়াশা দেখা যায়। অনেক সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা যায় না। শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১১° সেলসিয়াস। জানুয়ারি শীতলতম মাস। এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। সাধারণত উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এ ঋতুতে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এ সময় বাতাসের সর্বনিম্ন আর্দ্রতা শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ হয়ে থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সময় তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে এদেশের জলবায়ুতে প্রায়শ কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন-অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীতের স্থায়িত্বে ভিন্নতা, তাপদাহ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ঋতুসমূহের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

ঋতুর নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	তাপমাত্রা	বায়ুপ্রবাহ
গ্রীষ্মকাল			
বর্ষাকাল			
শীতকাল			

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং বায়ুপ্রবাহে দিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে এদেশের জলবায়ুকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল এবং শীতকাল। এখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল এবং শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে। বর্ষাকালে প্রায় পাঁচ ভাগের চারভাগ বৃষ্টিপাত হয়। শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন হলেও পাহাড়ি ও উপকূলীয় এলাকায় সামান্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়। তিন ঋতুর কোনো সময়ই তাপমাত্রা চরমভাবাপন্ন হয় না। এপ্রিল উষ্ণতম এবং জানুয়ারি শীতলতম মাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের জলবায়ুতে কয়টি ঋতু দেখা যায়?

(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২, ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কয়েকদিন ধরে হিমেল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। সেই সাথে ঘন কুয়াশায় সূর্যের দেখা নেই। ঘন কুয়াশা এবং হিমেল হাওয়ায় এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিশু ও বৃদ্ধ মানুষেরা ঠান্ডায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।

২। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋতুটির নাম কী?

(ক) গ্রীষ্মকাল (খ) বর্ষাকাল
(গ) শীতকাল (ঘ) কোনটিই নয়

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋতুটির বৈশিষ্ট্য-

i. তীব্র শীত ii. হিমেল হাওয়া
iii. প্রচুর বৃষ্টিপাত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?

(ক) জানুয়ারি (খ) এপ্রিল
(গ) জুন (ঘ) সেপ্টেম্বর

৫। বর্ষাকালে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের কত শতাংশ সংঘটিত হয়?

(ক) প্রায় ৭০ শতাংশ (খ) প্রায় ৭৫ শতাংশ
(গ) প্রায় ৮০ শতাংশ (ঘ) প্রায় ৮৫ শতাংশ

পাঠ-৪.৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
Natural Disaster

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, বন্যা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, খরা, আর্সেনিক, ভূমিকম্প, সুনামি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্যোগকে বুঝায়। এ সকল দুর্যোগ সংঘটনের পিছনে মানুষের কোনো অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ থাকেনা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রার উপর নির্ভর করে জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণ। বিশ্বের সকল দেশে বা অঞ্চলে দুর্যোগের মাত্রা এবং ধরণ একই রকম নয়।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি কারণে প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন, ক্ষয়ক্ষতি হয় সম্পদ ও জীবনের। বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী ও টর্নেডো, বন্যা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, খরা, আর্সেনিক, ভূমিকম্প ও সুনামি অন্যতম। নিম্নে এসব দুর্যোগ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো-

ক. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস (Cyclone and Tidal Surge) : বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির একটি আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়সমূহের মধ্যে কোনো কোনোটি মারাত্মক ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে। সাধারণত এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠে সাধারণত ২৭° সেলসিয়াস বা এর বেশি তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপ এবং চারপাশে উচ্চচাপ বিরাজ করে। এসময় উচ্চচাপযুক্ত বায়ু প্রবলবেগে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রভাগে যেখানে নিম্নচাপ থাকে সেদিকে ধাবিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠে উৎপত্তি লাভ করে মহাদেশীয় মূলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলকে চোখ বলে। এটি দেখতে অনেকটা মানুষের চোখের মতো। বিগত অর্ধশতাব্দীতে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে। এর মধ্যে ১৯৭০, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০৭, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় অন্যতম। জীবনহানির দিকে থেকে সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ১৯৭০, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালে সংঘটিত হয় (সারণি- ২.৫.১)। ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় জেলাসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসব জেলার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা প্রভৃতি।

সারণি ২.৫.১ : বাংলাদেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়সমূহ

সংঘটিত হওয়ার সাল	প্রাণহাণির সংখ্যা
১২ নভেম্বর. ১৯৭০	প্রায় ৫,০০,০০০ জন
২৯ নভেম্বর, ১৯৮৮	প্রায় ১,০৮,০০০ জন
২৯ এপ্রিল, ১৯৯১	প্রায় ৫,৭০৮ জন
১৫ নভেম্বর, ২০০৭	প্রায় ৩,৪৪৭ জন
২৫ মে, ২০০৯	প্রায় ৩৩০ জন

ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত জলোচ্ছ্বাস। ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তির পর যখন প্রবলবেগে স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয় তখন সমুদ্রের জলরাশি ফুলে ওঠে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মূল ভূ-খণ্ডে আঘাত হানে। এরূপ উঁচু জলরাশিকে জলোচ্ছ্বাস বলে।

এসময় জলরাশির উচ্চতা ১৫-৪০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সময় যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা থাকে তাহলে পানি আরো বেশি ফুলে ওঠে এবং জলোচ্ছ্বাস ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ভোলায় প্রায় ৪০ ফুট, ২০০৭ সালে পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলে প্রায় ২০-২৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড় ছাড়াও ভূমিকম্পের ফলেও জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকে সুনামি বলে। জলোচ্ছ্বাসের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষসহ জীবজন্তু ও সহায় সম্পদ পানিতে ভেসে চলে যায় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমুদ্রের সাথে মিশে যায়। যেমন-১৯৯১ সালে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে পরবর্তীতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ২০০৭ এবং ২০০৯ সালে যথাক্রমে সিডর ও আইলায় জীবনহানির পরিমাণ সহনীয় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ. কালবৈশাখী ঝড় ও টর্নেডো (Nor' wester & Tornado) : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় এবং টর্নেডো অন্যতম। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণত বৈশাখ মাসের শেষের দিকে এ ঝড় হতে দেখা যায় বলে একে কালবৈশাখী ঝড় বলে। মার্চ-এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার দিকে আকাশ হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। এ ঝড়ই কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। এ ঝড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সংঘটিত হয়। অনেক সময় বৃষ্টিপাতের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। দেশের পূর্বাঞ্চলে এ ঝড় অধিক হয়ে থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ে মানুষ, পশুপাখি ও সম্পদহানি ঘটে এবং কাঁচা ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। এছাড়া ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় টর্নেডোর ক্ষেত্রেও প্রচণ্ডবেগে বাতাস ঘুরতে ঘুরতে প্রবাহিত হয়। কোনো স্থানে নিম্নচাপ বা লঘুচাপ সৃষ্টি হলে উক্ত স্থানের উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায় এবং ঐ শূন্য জায়গা পূরণের জন্য চতুর্দিকের শীতল বায়ু দ্রুতগতিতে ধাবিত হয় এবং টর্নেডোর উৎপত্তি হয়। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে টর্নেডো আঘাত হানে। ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় প্রলয়ংকরী টর্নেডো আঘাত হানে এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। টর্নেডোর ক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগ সাধারণত ঘণ্টায় ৪৮০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার হতে পারে। টর্নেডোর বিস্তার মাত্র কয়েক মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর টর্নেডো হতে দেখা যায়। টর্নেডো এবং ঘূর্ণিঝড়ের মূল পার্থক্য হলো ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তি হয় সমুদ্রে, অন্যদিকে টর্নেডো যে কোনো স্থানে সৃষ্টি হতে পারে।

গ. বন্যা (Flood) : বন্যা বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সাধারণ অর্থে নদীর পানি যখন দু'কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম, নগর, বন্দর, বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসল বিনষ্ট করে তখন তাকে বন্যা বলে। প্রায় প্রতি বছর দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়। ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বন্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-মৌসুমী বন্যা, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা এবং নগর বন্যা।

১. মৌসুমী বন্যা : বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে যে বন্যার সৃষ্টি হয় তাকে মৌসুমী বন্যা বলে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে মৌসুমী বন্যা তেমন ক্ষতি করে না তবে কখনো কখনো মারাত্মক ক্ষতিকর রূপ ধারণ করে। মৌসুমী বন্যার মাত্রা স্বভাবিক হলে ফসল উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

২. আকস্মিক বন্যা: বর্ষা মৌসুম ব্যতীত অন্য যে কোনো মৌসুমে আকস্মিক বৃষ্টিপাতের ফলে বা পাহাড়ি ঢলে যে বন্যার সৃষ্টি হয় তাকে আকস্মিক বন্যা বলে। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রায় প্রতি বছর আকস্মিক বন্যা হতে দেখা যায়।

৩. উপকূলীয় বন্যা : উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, সুনামি বা জোয়ার-ভাটাজনিত কারণে যে বন্যা সৃষ্টি হয় তাকে উপকূলীয় বন্যা বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসমূহে এ ধরনের বন্যা দেখা দেয়।

৪. নগর বন্যা : নগর এলাকায় সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে বন্যা দেখা দেয়। এ ধরনের বন্যাকে নগর বন্যা বলে। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় শহরে এ ধরনের বন্যা দেখা যায়।

বন্যার কারণ : প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় প্রকার কারণেই বন্যা সৃষ্টি হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে-ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিরূপের গঠন ও প্রকৃতি, অতিবৃষ্টি, বরফগলা পানি, আকাঁবাঁকা নদী, নিম্নচাপ, নদীর অতিরিক্ত

পানি, নদীর পানি প্রবাহ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ইত্যাদি। বন্যার মানবসৃষ্ট কারণগুলো হলো-নদীর গতিপথে বাঁধা, খাল ও নালা ভরাট, অপরিকল্পিত বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদীর তলদেশ ভরাট, বনজসম্পদ ধ্বংস করা, নদীশাসন, উজানে পানি প্রত্যাহার বা বাঁধ নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

বন্যার প্রভাব : বন্যার ফলে বহুমুখী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন-সম্পদহানি, ফসল উৎপাদন হ্রাস, উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিজমি লবণাক্ত হওয়া, রোগ-ব্যাধির বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়া, সুপেয় পানির সংকট, খাদ্য ও পুষ্টির অভাব প্রভৃতি। বিগত অর্ধশতাব্দীর কিছু বেশি সময়ে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো ১৯৫৪, ১৯৬৩, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭ সালের বন্যা। ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং দেশের অধিকাংশ জেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঘ. নদীভাঙন (Riverbank Erosion) : সাধারণভাবে নদীর পানি প্রবাহের ফলে নদীর তীর বা পাড়ের ভাঙনকে নদীভাঙন বলে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাঙন দেখা দেয়। সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তাসহ অসংখ্য শাখা ও উপনদী দ্বারা দেশের প্রায় ১০০টি উপজেলা কমবেশি ভাঙনের শিকার হয়। নদীভাঙনপ্রবণ জেলাসমূহের মধ্যে জামালপুর, কুড়িগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া, মাদারীপুর, নারায়নগঞ্জ, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, শরীয়তপুর, শেরপুর, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, বরিশাল, গোপালগঞ্জ এবং উপকূলীয় অঞ্চল অন্যতম।

নদীভাঙনের কারণ : নদীভাঙন সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণও দায়ী। নিম্নে নদীভাঙনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১. বর্ষা মৌসুমে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হওয়া;
২. নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করা;
৩. নদীর গতিপথ অধিক আঁকাবাঁকা হওয়া;
৪. পলি জমা হয়ে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া;
৫. বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া;
৬. নদীগর্ভে নরম ও ক্ষয়িষ্ণু শিলার উপস্থিতি;
৭. নদীগর্ভে ফাটলের উপস্থিতি;
৮. পার্বত্য এলাকায় বরফ গলনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া;
৯. নদী তীরের গাছপালা নিধন করা;
১০. নদী তীর এবং তলদেশ থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন;
১১. নদী তীর দখল করে নদীর গতিপথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা;
১২. নিয়মিত নদী খনন না করা;
১৩. অপরিকল্পিত ও অধিক পরিমাণে নৌযান চালানো ইত্যাদি।

নদীভাঙনের প্রভাব : নদীভাঙনের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে অসংখ্য লোক ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুহারা এবং ভূমিহীন হয়ে পড়ে। নদীভাঙনের অন্যান্য প্রভাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, পুষ্টিহীনতা, শহরে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, রোগব্যাধির বিস্তার ইত্যাদি। এছাড়া সামাজিক বন্ধনেও ভাঙন দেখা দেয়। অনেক সময় জমিজমা ও সহায় সম্পদ হারিয়ে মানুষ উদ্বাস্তু হওয়ায় শহরে গমন করে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কে টান পড়ে।

ঙ. লবণাক্ততা (Salinity) : লবণাক্ততা বলতে মাটি ও পানিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বুঝায়। সাধারণত লবণাক্ততার মাত্রা পরিমাপ করা হয় পিপিটি (Parts Per Thousand-PPT) দ্বারা। সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার গড় মাত্রা ৩৫ পিপিটি অর্থাৎ ১ কিলোগ্রাম পানিতে প্রায় ৩৫ গ্রাম লবণ থাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি। বঙ্গোপসাগরের পানি জোয়ারের সময় নদীর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিতে

প্রবেশ করে লবণাক্ততা সৃষ্টি করে। সাধারণত আগস্ট মাস থেকে লবণাক্ততা শুরু হয় এবং ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় লবণাক্ততা দেখা যায়। এর মধ্যে সর্বাধিক লবণাক্ততায় আক্রান্ত খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা জেলা। এছাড়া বরিশাল, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, মাগুরা, কক্সবাজার, ফেনী প্রভৃতি জেলা লবণাক্ততায় আক্রান্ত।

লবণাক্ততার কারণ : সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি ও পানিতে লবণাক্ততার প্রধান কারণ জোয়ার-ভাটা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের বহুমুখী কর্মকাণ্ডকে দায়ী করা হয়।

লবণাক্ততার প্রভাব : লবণাক্ততার ফলে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-

১. উপকূলীয় অঞ্চলের জমি কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া;
২. সুপেয় পানির অভাব দেখা দেওয়া;
৩. উদ্বাস্তু লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি,
৪. সম্পদহানি ঘটে দারিদ্রতা বৃদ্ধি;
৫. রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব;
৬. ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব;
৭. মিঠা পানির মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া;
৮. গাছপালায় মড়ক লাগা;
৯. ফসলের গোড়া পচে যাওয়া প্রভৃতি।

চ. খরা (Drought) : সাধারণত খরা বলতে কোনো এলাকায় দীর্ঘসময় ধরে ভূমিতে পানির অনুপস্থিতিকে বুঝায়। অর্থাৎ কোনো এলাকা বৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকলে বা অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা কমে গিয়ে শুষ্ক হয়ে পড়ে। এর ফলে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় এবং পানির স্তর নিচে নেমে যায়। এরূপ অবস্থাকে খরা বলে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে খরার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। বিগত অর্ধ শতকে **১৯৭৩, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ২০১৬** সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিক খরা দেখা দেয়।

খরার কারণ : খরার উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো–

১. বৃষ্টিপাতের অভাব;
২. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা;
৩. বনভূমি উজাড়;
৪. নদীর উজানে অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ;
৫. এল নিনো ও লা নিনোর প্রভাব প্রভৃতি।

খরার প্রভাব : খরার ফলে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো-

১. কৃষি ফসলের উৎপাদন হ্রাস;
২. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া;
৩. ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গমন;
৪. উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্ন হওয়া;
৫. খাদ্য ও পুষ্টির সংকট তৈরি হওয়া;
৬. গ্রামীণ দারিদ্রতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি;
৭. মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস প্রভৃতি।

ছ. আর্সেনিক (Arsenic) : আর্সেনিক একটি বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ। এটি এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বাংলাদেশে আর্সেনিক নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু হয় **১৯৮৪** সালে। এক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের ৪১টি জেলার নলকূপের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অধিক আর্সেনিক রয়েছে

(গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০১ পিপিএম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। আর্সেনিক মিশ্রিত পানি পান করলে আর্সেনিকোসিস নামক রোগ হয়। আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাসমূহের মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোর, মাগুরা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাজশাহী, পাবনা অন্যতম।

আর্সেনিক দূষণের প্রভাব : আর্সেনিক দূষণের ফলে যেসব প্রভাব পড়ে সেগুলো হলো-

১. মানব দেহ চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া;
২. জিহ্বা, হাত ও পায়ের তালুতে কালো দাগ পড়া;
৩. বমি, অরুচি, রক্ত আমাশয়, মুখে ঘা দেখা দেয়া;
৪. ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রনালী, মূত্রথলী ও বৃক্কে ক্ষত তৈরি;
৫. রক্তশূণ্যতা, শ্বসন যন্ত্র আক্রান্ত হওয়া;
৬. প্রজনন স্বাস্থ্যে প্রভাব;
৭. স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া;
৮. শরীরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন প্রভৃতি।

জ. ভূমিকম্প (Earthquake) : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-গাঠনিক কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এদেশ। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশকে তিনটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো-

১. মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল (রিখটার স্কেলে মাত্রা ৭);
২. মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল (রিখটার স্কেলে মাত্রা ৬) এবং
৩. কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল (রিখটার স্কেলে মাত্রা ৫)।

ভূমিকম্পের কারণ : যেসব কারণে ভূমিকম্প হতে পারে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. ভূ-ত্বকের প্লেটসমূহ পরস্পর ধাক্কা খেলে;
২. ভূ-অভ্যন্তরে বড় রকমের শিলাচ্যুতি ঘটলে;
৩. ভূ-অভ্যন্তরে তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে;
৪. ভূ-গর্ভে সঞ্চিত বাষ্পচাপ অধিক হওয়ার ফলে নিম্নভাগে প্রবলবেগে ধাক্কা দিলে;
৫. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে;
৬. বড় ধরনের শিলাচ্যুতি ঘটলে;
৭. হিমানী সম্প্রপাত হলে;
৮. ভূ-ত্বকের পানি ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে;
৯. ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল সংঘর্ষের ফলে কতক অংশ ধসে পড়লে;
১০. খনি হঠাৎ ধ্বসে পড়লে প্রভৃতি।

ভূমিকম্পের প্রভাব : ভূমিকম্পের ফলে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো-

১. ভূমিকম্পের মাত্রা অধিক হলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে থাকে;
২. জীবজন্তু ও গাছপালা ধ্বংস হতে পারে;
৩. ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, কল-কারখানা ধ্বংস হতে পারে;
৪. ভূ-ত্বকে ভাঁজের সৃষ্টি হওয়া;
৫. নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়া;
৬. ভূ-ত্বকে ফাঁটল ও চ্যুতির সৃষ্টি;
৭. সমুদ্রতলের পরিবর্তন হওয়া;

৮. ভূমির উত্থান ও পতন হওয়া;
৯. হিমানী সম্প্রপাত;
১০. জনজীবনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া;
১১. বহু মানুষ শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত হয় যা জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এসব দুর্যোগ মোকাবেলা করে এদেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আমাদের প্রিয় এই দেশ প্রায় প্রতি বছরই একাধিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, কালবৈশাখী ঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এছাড়া রয়েছে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঝুঁকি। এসব দুর্যোগ মানুষের জীবন ও সম্পদহানির পাশাপাশি স্বাভাবিক পরিবেশকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে তা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘসময় লেগে যায়, ব্যাহত হয় দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলা করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ-
i. বন্যা
ii. ঘূর্ণিঝড়
iii. নদীভাঙন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। সিডর কোন সালে সংঘটিত হয়?
(ক) ২০০৭ (খ) ২০০৮
(গ) ২০০৯ (ঘ) ২০১০

৩। দীর্ঘ সময় ধরে পানির অনুপস্থিতিকে কী বলে?
(ক) বন্যা (খ) খরা
(গ) টর্নেডো (ঘ) কোনটিই নয়

৪। আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত?
(ক) ০.০১ পিপিএম (খ) ০.০৫ পিপিএম
(গ) ০.০৭ পিপিএম (ঘ) ১.০০ পিপিএম

৫। সাধারণত কোন সময়ে টর্নেডো হয়?
(ক) নভেম্বর-ডিসেম্বর (খ) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
(গ) মার্চ-এপ্রিল (ঘ) মে-জুন

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। গ ৫। ক ৬। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ক ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল) প্রশ্ন

১) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিরাজ করে। ফলে অন্যান্য সময়ের তুলনায় তাপমাত্রা বেশি থাকে। অনেক সময় কয়েকদিন ধরে তীব্র তাপদাহে মানুষ ও প্রাণির জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। মাঠঘাট, কৃষিজমি ফেটে চৌচির অবস্থা হয়। আকাশে মেঘের দেখা পাওয়া যায় না। তবে শীতকালে এর বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে হিমেল হাওয়ায় শরীর হিম হয়ে আসে।

(ক) মার্চ থেকে মে মাস কোন ঋতুর অন্তর্ভুক্ত? ১
(খ) কালবৈশাখী ঝড় কোন সময় আঘাত হানে এবং কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে আলোচ্য উষ্ণ ঋতুতে স্থানভেদে তাপমাত্রার পার্থক্য হয় কেন? ৩
(ঘ) শীতকালে উত্তরাঞ্চলে তীব্র ঠাণ্ডার কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৪

২) নিচের ছবিটি দেখুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

(ক) উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কী নির্দেশ করছে? ১
(খ) বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের নাম লিখুন। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় মানবজীবনে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৪

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদ

River System and Natural Resources of Bangladesh

ইউনিট ৫

ভূমিকা : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৭০০টি নদ-নদী রয়েছে। অনেক নদী শুধুমাত্র বর্ষাকালে সচল থাকলেও এগুলো জালের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। নদীগুলোর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, কর্ণফুলী অন্যতম। এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত সমভূমি। নদীগুলোর সাথে এখানকার মানুষের জীবনধারা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বড় বড় শহর, নগর, বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতি। নদীগুলো পানি এবং মৎস্য সম্পদেরও অন্যতম উৎস। নদীর মতোই বনজ সম্পদ এদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের প্রধান উৎস পাহাড়ি বনভূমি, শাল ও গজারী বৃক্ষের বনভূমি এবং স্রোতজ বনভূমি। পাশাপাশি ব্যক্তি এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে অনেক বৃক্ষ বা বনভূমি। এসব বৃক্ষ বা বনভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এর সাথে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। অন্যদিকে, বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। এসব খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চুনাপাথর, নুড়িপাথর, কাঁচবালি প্রভৃতি। সর্বোপরি, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও যেটুকু সম্পদ রয়েছে সেগুলো এদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : নদী ব্যবস্থা
পাঠ-৫.২ : নদ-নদী ও জনবসতি
পাঠ-৫.৩ : পানি ও মৎস্য সম্পদ
পাঠ-৫.৪ : বনজ সম্পদ
পাঠ-৫.৫ : খনিজ সম্পদ
পাঠ-৫.৬ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব

পাঠ-৫.১ নদী ব্যবস্থা
River System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলোর নাম বলতে পারবেন এবং
- প্রধান নদীগুলোর উৎপত্তি ও গতিপথের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, কর্ণফুলী, করতোয়া, মহানন্দা, সাঙ্গু, হালদা, ফেনী, নাফ, মাতামুহুরী।

নদী ব্যবস্থা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে সুপরিচিত। এদেশে ছোট-বড় প্রায় ৭০০ নদ-নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার উপর এসব নদ-নদীর প্রভাব অত্যধিক। প্রধান নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, কর্ণফুলী প্রভৃতি। মূল নদীসহ শাখানদী এবং উপনদীগুলো এদেশের বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি গড়ে তুলেছে। নদীগুলো বাংলাদেশের প্রাণ হলেও বেশ কিছু নদী অনেক বছর আগেই হারিয়ে গেছে, আবার কিছু কিছু নদী হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বর্তমানে যেসব নদী রয়েছে সেগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার। নিম্নে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলো বর্ণনা করা হলো (চিত্র ৩.১.১)।

পদ্মা (Padma) : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান নদী পদ্মা। এই নদী গঙ্গা নামে মধ্য হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে প্রবেশ করেছে। এরপর উত্তর প্রদেশ এবং বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নামক স্থানে ভাগিরথী (বা হুগলি নদী) নামে এর একটি শাখা বের হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে, মূল গঙ্গা নদীটি রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর আরো অগ্রসর হয়ে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দের নিকট যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই দুই নদীর মিলিত স্রোত পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত মেঘনা নামে বরিশাল ও নোয়াখালী জেলা হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৩৪,১৮৮ বর্গকিলোমিটার যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২৩.১৭%। কুমার, ভৈরব, গড়াই, মাথাভাঙ্গা, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ইছামতি, কপোতাক্ষ, চিত্রা পদ্মার উল্লেখযোগ্য শাখানদী এবং উত্তর দিক থেকে আগত নদীসমূহের মধ্যে মহানন্দা এর প্রধান উপনদী।

মেঘনা (Meghna) : ভারতের আসাম রাজ্যের নাগা-মনিপুর পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন বরাক নদী দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলার সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে একটি উত্তর সিলেট থেকে সুরমা নামে এবং অন্যটি দক্ষিণ সিলেট থেকে কুশিয়ারা নামে প্রবাহিত হয়ে হবিগঞ্জের কালনী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে সুরমা, কুশিয়ারা এবং কালনী নদীর মিলিত স্রোত কালনী নামে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। এরপর মেঘনা নদী কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরববাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অতঃপর চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে মেঘনা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২৯,৭৮৫ বর্গকিলোমিটার। মেঘনার উপনদীসমূহের মধ্যে মনু, বাউলাই, গোমতী, তিতাস, কাসনি অন্যতম। জাঙ্গালিয়া ও ডাকাতিয়া মেঘনার শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্র (Brahmaputra) : ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় পর্বতের তিব্বত অংশের মানস সরোবর থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এরপর তিব্বত হয়ে ভারতের আসাম রাজ্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদীতে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। বাংলাদেশ অংশে

ব্রহ্মপুত্র নদ প্রায় ২৭৭ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে। এই নদের প্রধান শাখানদী হলো বংশী ও শীতলক্ষ্যা। ধরলা ও তিস্তা প্রধান উপনদী। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭৮৯ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ উপরে উত্থিত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়ে একটি নতুন স্রোতধারা সৃষ্টি হয়। যা যমুনা নামে পরিচিত।

যমুনা (Jamuna) : ১৭৮৯ সালের ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের যে শাখাটি বের হয় সেটিই বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী যমুনা। এটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়। এরপর এই মিলিত স্রোত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়েছে। যমুনার প্রধান শাখানদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা। যমুনার উপনদীগুলোর মধ্যে ধরলা, তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই অন্যতম।

তিস্তা (Teesta) : ভারতের সিকিমের পাবর্ত্য অঞ্চলে তিস্তা নদী উৎপত্তি হয়েছে। এরপর অগ্রসর হয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার ডিমলা দিয়ে প্রবেশ করেছে। তিস্তা নদীর বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭৭ কিলোমিটার এবং চওড়া ৩০০ থেকে ৫৫০ মিটার। এ নদীতে তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। যা এ অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

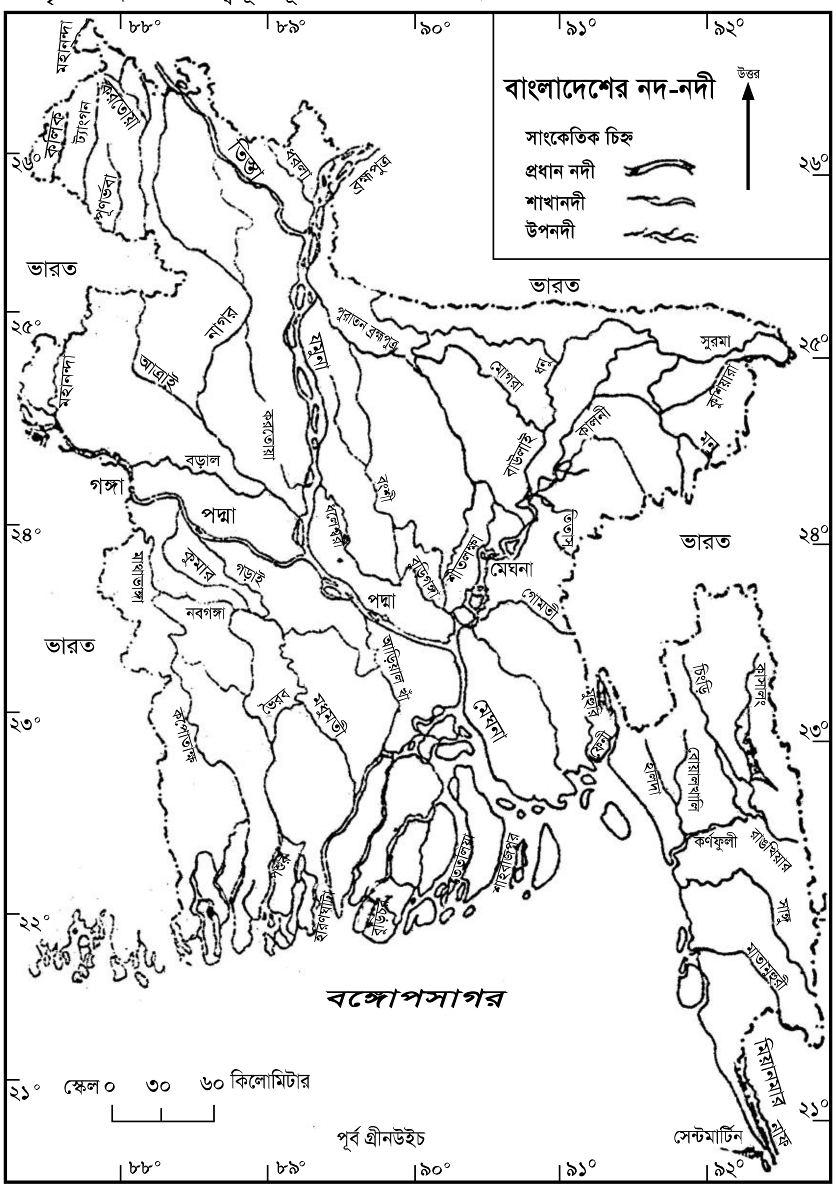

চিত্র ৩.১.১ : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা

কর্ণফুলী (**Karnaphully**) : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম কর্ণফুলী। এটি আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। পাহাড়ি এ নদী চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার। কর্ণফুলী নদীর প্রধান উপনদী হালদা, কাসালং, বোয়ালখালি, চেঙ্গী, শিলক, রাঙখিয়াং ইত্যাদি। রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরটি এই নদীর তীরে চট্টগ্রামে অবস্থিত।

করতোয়া (**Korotoya**) : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুন্ঠপুর জলাভূমি থেকে করতোয়া নদীর উৎপত্তি। এটি পঞ্চগড় জেলার ভিটগড়ের নিকট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার নিকট আত্রাই নামে পরিচিত। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে সমাধিঘাট পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। এরপর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আবার রাজশাহী জেলার দেওয়ানপুরে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বড়াল নদীর মধ্য দিয়ে পাবনার বেড়ার নিকট যমুনায় পতিত হয়েছে। করতোয়া যমুনার দীর্ঘতম উপনদী।

মহানন্দা (**Mahananda**) : মহানন্দা নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দার্জিলিং জেলার নিকটবর্তী মহালদ্রীম পর্বতে। এরপর জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র উত্তরের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা দিয়ে প্রবেশ করেছে। এরপর বাংলাবান্ধা থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। অত:পর ভারতের পূর্নিয়া ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চাপাইনবাবগঞ্জের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করে গোদাগাড়ির কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। মহানন্দার উপনদী পুবর্ভবা, নাগর, কুলিক, ট্যাংগন, পাগলা প্রভৃতি।

সাঙ্গু (**Shangu**) : বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত আরাকান পাহাড় থেকে সাঙ্গু নদী উৎপত্তি হয়েছে। এরপর চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৪ কিলোমিটার।

হালদা (**Haldha**) : খাগড়াছড়ি জেলার বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ থেকে হালদা নদী উৎপন্ন হয়েছে। এরপর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।

ফেনী (**Feni**) : ফেনী নদী ভারতের ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি হয়েছে। এরপর ফেনী জেলার পূর্ব সীমানা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সন্দ্বীপ প্রণালির উত্তরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। ফেনী নদীটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক জেলা ফেনীর নামে পরিচিত।

নাফ (**Knaf**) : নাফ নদীর উৎপত্তি স্থল মিয়ানমার। এ নদী বাংলাদেশের টেকনাফ ও মিয়ানমার সীমানা নির্দেশ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নাফ নদীর মোহনা অত্যন্ত প্রশস্ত। উৎপত্তিস্থল থেকে বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়া পর্যন্ত এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ কিলোমিটার।

মাতামুহুরী (Matamuhuri) : মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তিস্থল লামার মাইভার পর্বত। উৎপত্তির পর উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার নিকট দিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিলোমিটার।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ছকে উল্লিখিত নদীগুলোর তথ্যগুলো পূরণ করুন।

পদের নাম	উৎপত্তি স্থল	পতিত স্থান
পদ্মা		
ব্রক্ষ্মপুত্র		
যমুনা		
কর্ণফুলী		
মহানন্দা		
তিস্তা		

সারসংক্ষেপ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় ৭০০টি নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। যদিও অনেকগুলো নদী তার স্বাভাবিক গতিপথ এবং নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলো হলো- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি। বাংলাদেশকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে এসব নদীর বিভিন্ন শাখানদী, উপনদীগুলো এবং অন্যান্য। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতি নদীগুলোর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই নদীগুলোর স্বাভাবিক গতিপথ ধরে রেখে এর সর্বোত্তম ব্যবহার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা কতটি?

(ক) ৫০০টি (খ) ৬০০টি
(গ) ৭০০টি (ঘ) ৮০০টি

২। নাফ নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়?

(ক) মিয়ানমার (খ) আসাম
(গ) ত্রিপুরা (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গা নামে একটি নদী উৎপন্ন হয়ে ভারতের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে নতুন নাম ধারণ করেছে। এরপর আরো দুইটি নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীটি বাংলাদেশে কী নামে প্রবাহিত হয়েছে?

(ক) পদ্মা (খ) যমুনা
(গ) গোমতী (ঘ) মেঘনা

৪। আলোচ্য নদীটির শাখানদী হলো-

i. কুমার ii. ভৈরব
iii. মাথাভাঙ্গা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। পদ্মা-যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে?

(ক) পাটুরিয়ায় (খ) গোয়ালন্দে
(গ) আরিচায় (ঘ) দৌলতদিয়ায়

পাঠ-৫.২ নদ-নদী ও জনবসতি
Rivers and Human Settlement

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নদ-নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নদ-নদী , জনবসতি ।

নদ-নদী ও জনবসতি

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাথে নদ-নদীর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদে নদ-নদীর তীরবর্তী সমতল ভূমিকে আবাসস্থল হিসেবে বেঁছে নিয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোও নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন-মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবীলনীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা প্রভৃতি। প্রাচীনকাল থেকে নদ-নদীকেন্দ্রিক জনবসতির যে ধারা শুরু হয়েছে তা এখনো চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কেননা নদ-নদী থেকে মানুষ তার নিত্য ব্যবহার্য পানির যোগান পেয়ে থাকে। কৃষিকাজের জন্যও নদ-নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। নদ-নদীকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ মৎস্য শিকারের মাধ্যমে জীবনধারণ করে। গড়ে উঠে নদ-নদীকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নদ-নদীকেন্দ্রিক জনবসতি, নগর, বন্দর, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের নদ-নদী ও জনবসতি : আমরা পূর্বেই জেনেছি, বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। দেশের প্রায় সর্বত্রই ছোট-বড় ৭০০টি নদ-নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মানুষের জীবনধারায় এসব নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছে নদ-নদীগুলোকে কেন্দ্র করে। ফলে অধিকাংশ শহর, নগর, বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে নদী তীরে। যেমন-ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে বুড়িগঙ্গার তীরে, শীতলক্ষ্যার তীরে নারায়নগঞ্জ, কর্ণফুলীর তীরে চট্টগ্রাম, সুরমার তীরে সিলেট, পদ্মার তীরে রাজশাহী, গোমতীর তীরে কুমিল্লা, রূপসার তীরে খুলনা প্রভৃতি। নদ-নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. বহুমুখী ব্যবহার : কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মানুষ বহুমুখী কাজে নদ-নদীকে ব্যবহার করে। খাবার পানি, রান্না-বান্না, গৃহস্থালি, গোসল, কাপড় ধোঁয়াসহ বিভিন্ন কাজে নদ-নদীর পানি ব্যবহার করে। বর্ষাকালে নদীতে বন্যার সৃষ্টি করে নদী তীরবর্তী জমিতে পলি সঞ্চিত হয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

২. যোগাযোগ ও পরিবহন : পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে নদ-নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীপথে খুব সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া যায়। নদীপথে যাত্রী, ভারী মালপত্র এবং কৃষিজ, বনজ ও শিল্পজাত পণ্য সহজে এবং সুলভে বহন করা যায়।

৩. মৎস্য শিকার : নদ-নদী মৎস্যের অন্যতম উৎস। নদ-নদীতে যেসব মাছ পাওয়া যায় সেগুলো অত্যন্ত সুস্বাদু। নদী তীরবর্তী মানুষ মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। নদীতে রুই, কাতলা, বোয়াল, চিতল প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়।

৪. পানীয় জলের উৎস : শহর বা নগর এলাকার মানুষের পানীয় জলের প্রধান উৎস নদ-নদী। যেমন-ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গার পানি, রাজশাহী শহরে পদ্মার পানি, চট্টগ্রামে কর্ণফুলীর পানি, নারায়নগঞ্জে শীতলক্ষ্যা প্রভৃতি নদীর পানি পরিশোধন করে সরবরাহ করা হয়।

৫. শিল্প-কারখানায় পানি সরবরাহ : শিল্প-কারখানার জন্য প্রচুর পানি প্রয়োজন হয়। এ জন্য নদী তীরবর্তী এলাকায় অধিক শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয়। এসব শিল্প-কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে জনবসতি। যেমন-মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, কর্ণফুলী প্রভৃতি নদীকে কেন্দ্র অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।

৬. কৃষিজমিতে পানি সেচ : বৃষ্টির পানি প্রকৃতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শুকনো মৌসুমে কৃষিজমিতে পানি সেচের অন্যতম উপায় নদ-নদীর পানি। যেসব অঞ্চলে নদ-নদী রয়েছে এবং সারা বছর পানি থাকে সেগুলো থেকে নিকটবর্তী কৃষিজমিতে পানি সেচ দেওয়া যায় যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৭. নদীকেন্দ্রিক বন্দর : আমাদের দেশে নদীকেন্দ্রিক অনেকগুলো বন্দর গড়ে উঠেছে। এসব বন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বরিশাল, চাঁদপুর, আরিচা, গোয়ালন্দ, খুলনা, ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, ঝালকাঠি, মাদারীপুর, আজমিরীগঞ্জ, মোহনগঞ্জ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য অধিক উপযোগী। এসব নদীবন্দর কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত জনগণ নদী তীরে জনবসতি গড়ে তোলে।

৮. নদীকেন্দ্রিক সেচ প্রকল্প ও বাঁধ নির্মাণ : নদ-নদী তীরবর্তী জনবসতি ও কৃষির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যেমন-গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, কর্ণফুলী বহুমুখী পরিকল্পনা, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা সেচ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ পরিকল্পনা, কুমিল্লা-চট্টগ্রাম পরিকল্পনা প্রভৃতি। এসব সেচ প্রকল্পের পানি দিয়ে কৃষি অর্থনীতি দিন দিন উন্নত হচ্ছে। মানুষের কর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

৯. পানি বিদ্যুৎ : নদীর স্রোতকে কেন্দ্র করে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে এরূপ একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া নদ-নদী পরিবেশ নির্মল রাখা, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বাণিজ্যের প্রসার, নৌ যোগাযোগ নিশ্চিত করাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নদ-নদীগুলোর সাথে এদেশের মানুষের গভীর সম্পর্কের নিদর্শন নদ-নদী কেন্দ্রিক জনবসতি, নগর, শহর, বন্দর প্রভৃতি। এদেশের কৃষি অর্থনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক এবং জীববৈচিত্র্যের ধারক নদ-নদী। তাই এর গুরুত্ব বিবেচনা করে দেশে প্রবাহমান নদ-নদীর নাব্যতা ধরে রেখে স্বাভাবিক গতিপথ নিশ্চিত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই নদীগুলোকে বাচিঁয়ে রাখতে হবে এবং নদীকেন্দ্রিক জনবসতিকে গতিশীল করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আশেপাশের নদ-নদীর গুরুত্ব তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে নদ-নদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রাচীন সভ্যতাগুলো নদ-নদীকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশেও নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বড় বড় শহর, নগর, বন্দর প্রভৃতি। এই নদ-নদীগুলোর সাথে এদেশের মানুষের বসতি এবং জীবনযাত্রার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জনবসতির পাশাপাশি কৃষি, যাতায়াত, পরিবহন, নগর, বন্দর, শিল্প-কারখানা, পানীয়জল সরবরাহ সব কিছুতে নদ-নদী বহুভাবে প্রভাবিত করে। তাই নদ-নদীগুলোর গতিপথ ঠিক রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল কোনটিকে কেন্দ্র করে?

(ক) সাগর (খ) নদ-নদী

(গ) পার্বত্য এলাকা (ঘ) জলাভূমি

২। নদ-নদী থেকে পাওয়া যায়-

i. মৎস্য ii. সেচের পানি

iii. নৌ-যান চলাচলের সুবিধা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। রাজশাহী শহর কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে?

(ক) পদ্মা (খ) সুরমা

(গ) বুড়িগঙ্গা (ঘ) কর্ণফুলী

৪। নিচের কোনটিতে নদীবন্দর রয়েছে?

(ক) আশুগঞ্জ (খ) ভৈরববাজার

(গ) বরিশাল (ঘ) সবগুলো সঠিক

পাঠ-৫.৩ পানি ও মৎস্য সম্পদ
Water and Fish Resources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের পানি সম্পদের উৎসসমূহ বলতে পারবেন;
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- মৎস্য সম্পদের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পানি ও মৎস্য সম্পদ ।

পানি সম্পদ

আমরা জানি, পানির অপর নাম জীবন। মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবনধারণের জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কৃষি, শিল্প, বনভূমি, শহর, নগর, গ্রাম সর্বত্র পানি প্রয়োজন। বিশ্বের সমুদয় পানি তিনটি বিশেষ অবস্থায় রয়েছে। এগুলো হলো- কঠিন (বরফ), গ্যাসীয় (জলীয়বাষ্প) এবং তরল। পানি বায়ুমন্ডলে জলীয়বাষ্প হিসেবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে কঠিন ও তরল অবস্থায় রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ পানি একটি আলোচিত বিষয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের পানি সম্পদ : বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ উভয় ধরনের পানির উৎস রয়েছে। তবে এ সম্পদ সীমিত। বর্ষা মৌসুমে পানির ঘাটতি দেখা না দিলেও শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকট দেখা দেয়। বাধাগ্রস্থ হয় কৃষি উৎপাদন এবং জনজীবন। বাংলাদেশের পানির অন্যতম প্রধান উৎস গ্রীষ্মকালীন ও মৌসুমী বৃষ্টিপাত এবং নদ-নদীবাহিত পানি। কিন্তু দেশের অনেক নদ-নদীর নাব্যতা সংকট এবং অপরিকল্পিতভাবে অধিক পানি ব্যবহারের কারণে শুকনো মৌসুমে অনেক নদী শুকিয়ে যায়। যা জনজীবন, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। এছাড়া বাংলাদেশের পানি সম্পদের অন্যান্য উৎসসমূহ হলো খালবিল, জলাভূমি, হাওড়, বাওড়, পুকুর, ডোবা, ভূ-গর্ভস্থ পানি, জোয়ার প্লাবিত পানি এবং অন্যান্য জলাধার।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এর গুরুত্ব : বর্ষা মৌসুমের অতিরিক্ত পানি শুষ্ক ও শীত মৌসুমের জন্য পরিকল্পিতভাবে ধরে রেখে এবং পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের আবশ্যকীয় এই প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। পানি ছাড়া একটি দিনও চলা যায় না। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় জন্যও পর্যাপ্ত পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশের উপর দিয়ে অনেকগুলো নদ-নদী প্রবাহিত হলেও সারা বছর অনেক নদীতে পানি থাকে না। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও তেমন কোনো জলাধার না থাকায় অন্য মৌসুমে তা ব্যবহার করা যায় না। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির পানির চাহিদা পূরণ, কৃষিজমিতে সেচ এবং অন্যান্য ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির বহুমুখী ব্যবহারের ফলে দূষণও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আবার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি পানিকে দূষিত করছে। এছাড়া কৃষিজমিতে পানিসেচসহ দৈনন্দিন প্রয়োজনে ভূ-গর্ভ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে পানির অধিক সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে বড় বড় শহরগুলোর বিভিন্ন স্থানে গ্রীষ্ম মৌসুমে বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দেয়। দেশের অন্যান্য অনেক স্থানেও পানি সংকট দেখা যায়। এসব বিবেচনায় পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে–

১. পরিবেশ সংরক্ষণ করা;
২. পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৩. নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখাসহ অন্যান্য জলাধার সংরক্ষণ করা;
৪. বর্ষা মৌসুমের পানি ধরে রাখার জন্য জলাধার নির্মাণ করা;
৫. পানি দূষণ প্রতিরোধ করা;
৬. উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা দূর করা;

৭. কৃষি জমিতে লবণাক্ত পানির প্রবেশ বন্ধ করা;
৮. পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার;
৯. নদীর অবৈধ দখল এবং ব্যবহার প্রতিরোধ করে স্বাভাবিক গতিপথ নিশ্চিত করা;
১০. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
১১. পানির অপচয় না করা;
১২. পানির সঠিক ব্যবহারে সবাই সচেতন হওয়া প্রভৃতি।

মৎস্য সম্পদ : বাংলাদেশ মৎস্য শিল্পে উন্নত না হলেও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। দেশের বিভিন্ন জলাশয়সমূহ মৎস্যের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। নদীপ্রধান এদেশে অসংখ্য খাল-বিল, হাওড়, বাওড়, পুকুর, দিঘী, ডোবাসহ বিভিন্ন জলাশয় রয়েছে। দেশের দক্ষিণে রয়েছে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। এসব উৎস থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরা হয় যা প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ পূরণ করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৩.৬৫ শতাংশ। বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের উৎসসমূহ হলো মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য, চাষকৃত মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। সারণি ৩.৩.১ এ মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি ৩.৩.১ : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস থেকে মৎস্য উৎপাদন

	মৎস্য খাতের উৎস	ধৃত মৎস্যের পরিমাণ (লক্ষ মেট্রিক টন)	শতকরা অংশ (%)
ক. মুক্ত জলাশয়	নদী ও মোহনা	১.৭৮	৪.৫৯
	সুন্দরবন	০.১৭	০.৪৪
	বিল	০.৯৩	২.৪০
	কাপ্তাই হ্রদ	০.০৮	০.২১
	প্লাবন ভূমি	৭.৪৫	১৯.২১
উপমোট		**১০.৪৬**	**২৬.৮৫**
খ. চাষকৃত	পুকুর	১৭.৩২	৪৪.৭৬
	বাওড়	০.০৮	০.২১
	অর্ধ আবদ্ধ	২.০৪	৫.২৬
	চিংড়ি খামার	২.৩৪	৬.০৪
	পেন কালচার	০.১৩	০.৩৪
	কেজ কালচার	০.০২	০.০৫
	কাকড়া	০.১৩	০.৩৪
উপমোট		**২২.০৬**	**৫৭.০০**
গ. সামুদ্রিক	ইন্ডাস্ট্রিয়াল	১.০৫	২.৭১
	আর্টিসেন্যাল	৫.২১	১৩.৪৪
উপমোট		**৬.২৭**	**১৬.১৫**
মোট		**৩৮.৭৮**	**১০০.০০**

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭, (পৃ .৯২)

বাংলাদেশে প্রাপ্ত মৎস্যসমূহ : বাংলাদেশে স্বাদু এবং সামুদ্রিক দুই ধরনের মৎস্যই পাওয়া যায়। স্বাদু পানির মৎস্যসমূহের মধ্যে রয়েছে কই, টাকি, মলা, শোল, খৈলসা, টেংরা, মাগুর, শিং, পুটি, রুই, কাতলা, মৃগেল, পাঙ্গাশ, গজার, কার্প জাতীয় মৎস্য প্রভৃতি। সামুদ্রিক মৎস্যসমূহের মধ্যে রয়েছে কোরাল, পোয়া, স্যামন, ছুরি, ভেটকি, চান্দা, রূপচান্দা প্রভৃতি। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয়। সারণি ৩.৩.২ এ বিগত কয়েক বছরে মৎস্যের উৎপাদন দেখানো হলো–

সারণি ৩.৩.২ : বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন

অর্থবছর	উৎপাদিত মৎস্য (লক্ষ মেট্রিক টন)
২০১১-১২	৩২.৬২
২০১২-১৩	৩৪.১০
২০১৩-১৪	৩৫.৪৭
২০১৪-১৫	৩৬.৮৪
২০১৫-১৬	৩৮.৭৮

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৯২)

মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব : মৎস্য প্রাণিজ আমিষের উৎস ছাড়াও জীবিকা নির্বাহ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, শিল্পের উপকরণ, সার প্রস্তুত, হাঁস-মুরগীর খাবার, মৎস্যভিত্তিক আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সরকার মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, খাস জলাশয়ে মৎস্যজীবিদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, বিল নার্সারি কার্যক্রম, মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত করা, নদ-নদীর পুনঃখনন, মৎস্যের অভয়াশ্রম সৃষ্টি, মৎস্যের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, ঘের ও খাঁচায় মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় যেসব মৎস্য পাওয়া যায় তার তালিকা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে পানি ও মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এদেশের মানুষের দৈনন্দিন পানি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, নৌ-পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বনভূমি, পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ প্রভৃতিতে পানি সম্পদ ব্যবহার করা হয়। নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়, বাওড়, পুকুর, ডোবাসহ যেসব জলাশয় রয়েছে সেগুলো মৎস্য সম্পদেরও উৎস। এছাড়া দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর মৎস্য সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ আধার। এসব উৎস থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে মৎস্য আহরণ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে উৎপাদিত মৎস্য প্রাণিজ আমিষের ৬০ শতাংশ পূরণ করে। তাই বলা যায় যে, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রকৃতি প্রদত্ত পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিশুদ্ধ পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পানি কয়টি অবস্থায় থাকে?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

২। বাংলাদেশের পানির অন্যতম উৎস-

i. নদ-নদী ii. বৃষ্টিপাত

iii. ভূ-গর্ভ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, হাওড়, বাওড় ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। এসব জলাধার দেশের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস সরবরাহ করে যা মানব শরীরের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণিজ আমিষের উৎসটির নাম কী?

(ক) মৎস্য (খ) ডিম (গ) মাংস (ঘ) দুধ

৪। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান কত ছিল?

(ক) ২.৬৫% (খ) ৩.৬৫% (গ) ৪.৬৫% (ঘ) ৫.৬৫%

৫। স্বাদু পানি থেকে পাওয়া যায়-

i. মাগুর ii. স্যামন

iii. শোল

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ বনজ সম্পদ
Forest Resources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বনভূমি ও বনজ সম্পদ কী তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বনভূমির বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বনজ সম্পদ।

বনজ সম্পদ

সাধারণভাবে বনভূমি বলতে স্বাভাবিকভাবে কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের যে অসংখ্য বৃক্ষের সমারোহ দেখা যায় তাকে বুঝায়। আর বনভূমি থেকে যে সকল সম্পদ পাওয়া যায় সেগুলোকে বনজ সম্পদ বলে। যে কোনো দেশ বা অঞ্চলের প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। তবে বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। বর্তমানে এদেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ (বিবিএস ২০১৬)।

বনভূমির প্রকারভেদ : মৃত্তিকার গুণাগুণ এবং জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র-৩.৪.১)। যথা-

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি;
২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি এবং
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার অংশবিশেষ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে এ বনভূমি অবস্থিত। পাহাড়ের অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি অবস্থিত। চিরহরিৎ বৃক্ষসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চাপালিশ, তেলসুর, ময়না প্রভৃতি। আর পাতাঝরা বা পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে গর্জন, শিমুল, কড়ই, জারুল, সেগুন উল্লেখযোগ্য। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমির মোট আয়তন প্রায় ১৫,৩২৬ বর্গ কিলোমিটার।

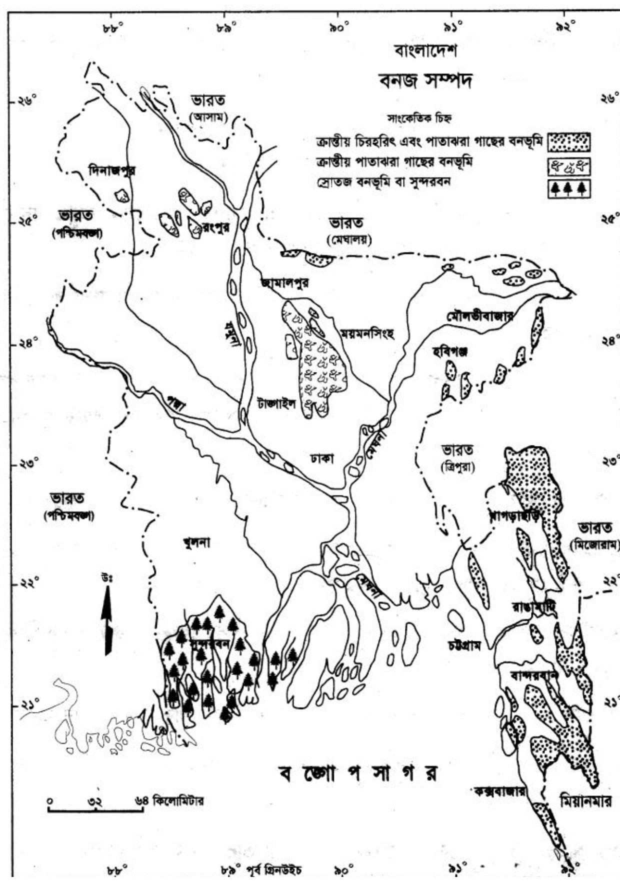

চিত্র ৩.৪.১ : বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থান

২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি : ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়া। তবে গ্রীষ্মকালে গাছগুলোতে আবার নতুন কচি পাতা গজায়। প্লাইস্টোসিনকালের

সোপানসমূহে এ বনভূমির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমিকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি এবং রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের বনভূমি।

ক. মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি : ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার বনভূমি এর অন্তর্ভুক্ত। এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ গজারী হওয়ায় এটি গজারী বৃক্ষের বনভূমি হিসেবে পরিচিত। এর আয়তন প্রায় ৮৭৫ বর্গকিলোমিটার।

খ. রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের বনভূমি : রংপুর ও দিনাজপুর জেলার প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে এ বনভূমি অবস্থিত। এখানকার প্রধান বৃক্ষ শাল। এজন্য এটি শাল বৃক্ষের বনভূমি হিসেবে পরিচিত। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গকিলোমিটার।

৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত ও জোয়ার-ভাটাযুক্ত পরিবেশে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জৈবনিকভাবে শুষ্ক নিবাসের উদ্ভিদই স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন নামে পরিচিত। এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী হওয়ায় এটি সুন্দরবন নামে সুপরিচিত। এটি বিশ্বের অন্যতম স্রোতজ বৃক্ষের বনভূমি। এ বনভূমি প্রায় ৬,৭৮৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বরগুনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ৯৫ বর্গকিলোমিটার ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন অন্যতম। এছাড়া সুন্দরবনে প্রচুর গোলপাতা জন্মে যা ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত বনভূমিসমূহ ছাড়াও মিশ্র প্রকৃতির সরকারি বনভূমি, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ, সংরক্ষিত বনভূমি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) অধীনে কিছু বনভূমি, ব্যক্তি মালিকাধীন বৃক্ষ রয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ ও অন্যান্য বৃক্ষ দেখা যায়।

বনভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ : বনভূমি থেকে যেসব সম্পদ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম, ভেষজ ঔষধের উপকরণ, জ্বালানি কাঠসহ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ছকের তথ্যসমূহ পূরণ করুন।

বনভূমির নাম	আয়তন	প্রধান বৃক্ষ
ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি		
ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি		
স্রোতজ বনভূমি		

সারসংক্ষেপ

বনভূমি একটি অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। মৃত্তিকার গুণাগুণ এবং জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত বনভূমিসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি, ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি এবং স্রোতজ বনভূমি। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। প্লাইস্টোসিনকালের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি অবস্থিত। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এবং বরগুনা জেলায় স্রোতজ বনভূমি অবস্থিত। এসব বনভূমি থেকে কাঠ, ফলমূল, জ্বালানি, মধু, মোমসহ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য শতকরা কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
(ক) ২০ ভাগ (খ) ২৫ ভাগ
(গ) ৩০ ভাগ (ঘ) ৩৫ ভাগ

২। বাংলাদেশের বনভূমিসমূহকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) তিন (খ) চার
(গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

৩। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি যে জেলায় অবস্থিত-
i. রাঙামাটি ii. বান্দরবান
iii. খাগড়াছড়ি
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। স্রোতজ বনভূমি বৃক্ষ -
i. সুন্দরী ii. ধুন্দল
iii. শাল
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। গজারী বৃক্ষের বনভূমি হিসেবে পরিচিত কোন বনভূমি ?
(ক) সুন্দরবন (খ) বরেন্দ্র বনভূমি
(গ) মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি (ঘ) পাহাড়ি বনভূমি

পাঠ-৫.৫ খনিজ সম্পদ
Mineral Resources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- খনিজ সম্পদ কী তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, চীনামাটি, নুড়িপাথর, খনিজ বালি।

খনিজ সম্পদ

খনিজ প্রকৃতির দান। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এক বা একাধিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলোকে খনিজ বলে। ভূ-গর্ভস্থ খনি থেকে প্রাপ্ত এসব মূল্যবান সম্পদই হলো খনিজ সম্পদ। যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, চীনামাটি, খনিজ বালি, নুড়ি পাথর ইত্যাদি।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ : বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সৃমদ্ধ না হলেও এখানে বেশ কিছু খনিজ রয়েছে। এসব খনিজ সম্পদ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) : জ্বালানির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পূরণ করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। এর মধ্যে ২০টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে, ২টি উৎপাদনে যায়নি এবং ৪টির উৎপাদন স্থগিত রয়েছে (সারণি ৩.৫.১)। গ্যাসক্ষেত্রসমূহের উত্তোলনযোগ্য প্রাথমিক সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৭ সালের জানুয়ারি সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে ২০টি গ্যাসক্ষেত্রের ১০৯টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কূপ সংখ্যা বিবিয়ানায় ২৬টি এবং তিতাসে ২৪টি।

সারণি ৩.৫.১ : বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের নাম ও বর্তমান অবস্থা

উৎপাদনরত	উৎপাদনে এখনো যায়নি	উৎপাদন কার্যক্রম স্থগিত
তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী, মেঘনা, সিলেট, কৈলাসটিলা, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, বেগমগঞ্জ, জালালাবাদ, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা, বাঙ্গুরা।	কুতুবদিয়া, রূপগঞ্জ	সাঙ্গু, ছাতক, কামতা, ফেনী
২০টি	২টি	৪ টি

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭ (পৃ. ১৩৩)

বাংলাদেশে উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালি, চা বাগান, সিএনজি প্রভৃতি খাতে ব্যবহার করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪১.৩৩%, শিল্পে ১৬.১৩%, ক্যাপটিভে ১৬.৬৩%, গৃহস্থালিতে ১৪.৬৩%, সার কারখানায় ৫.৪৪%, সিএনজিতে ৪.৮১%, বাণিজ্যিকে ০.৯৩% এবং চা বাগানে ০.০৯% গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

খনিজ তেল (Petroleum) : বর্তমান যান্ত্রিক যুগে খনিজ তেল একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। শক্তি, তাপ এবং আলো উৎপাদনের কাজে খনিজ তেল ব্যবহার করা হয়। খনিজ তেল পরিশোধন করে ডিজেল, কেরোসিন, গ্যাসোলিন, প্যারাকিন, বিটুমিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রের সপ্তম কূপে বাংলাদেশে প্রথম তেল পাওয়া যায়। একূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উত্তোলন করা হয়। মৌলভীবাজার জেলার

বরমচালে দৈনিক প্রায় ১২০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উৎপাদিত হয়। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে খনিজ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন। বাংলাদেশের জ্বালানি তেল মজুদ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, বিপনন এবং চাহিদা অনুযায়ী আমদানির কাজ সম্পাদন করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)। অপরিশোধিত খনিজ তেল চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারী শোধনাগারে পরিশোধন করা হয়।

কয়লা (Coal) : শক্তির অন্যতম প্রাকৃতিক উৎস কয়লা। তবে বাংলাদেশে উৎপাদিত কয়লা বেশির ভাগই উৎকৃষ্ট শ্রেণির নয়। এখানকার কয়লায় ছাই ও গন্ধকের পরিমাণ বেশি এবং কার্বনের পরিমাণ খুবই কম। বাংলাদেশে প্রধানত বিটুমিনাস, লিগনাইট এবং পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। কল-কারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতিতে কয়লা ব্যবহার করা হয়। দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া এবং ফুলবাড়ি উপজেলার দীঘিপাড়ায়, বগুড়ার জামালগঞ্জ, রংপুরের খালাসপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লাক্ষেত্র রয়েছে। দিনাজপুরের বড় পুকুড়িয়া থেকে উৎকৃষ্টমানের লিগনাইট কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে এবং এর পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন। এছাড়া ফরিদপুরের বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলাবিল, সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীটজাতীয় নিম্নমানের কয়লা এবং রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ ও সিলেট জেলায় উৎকৃষ্ট মানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

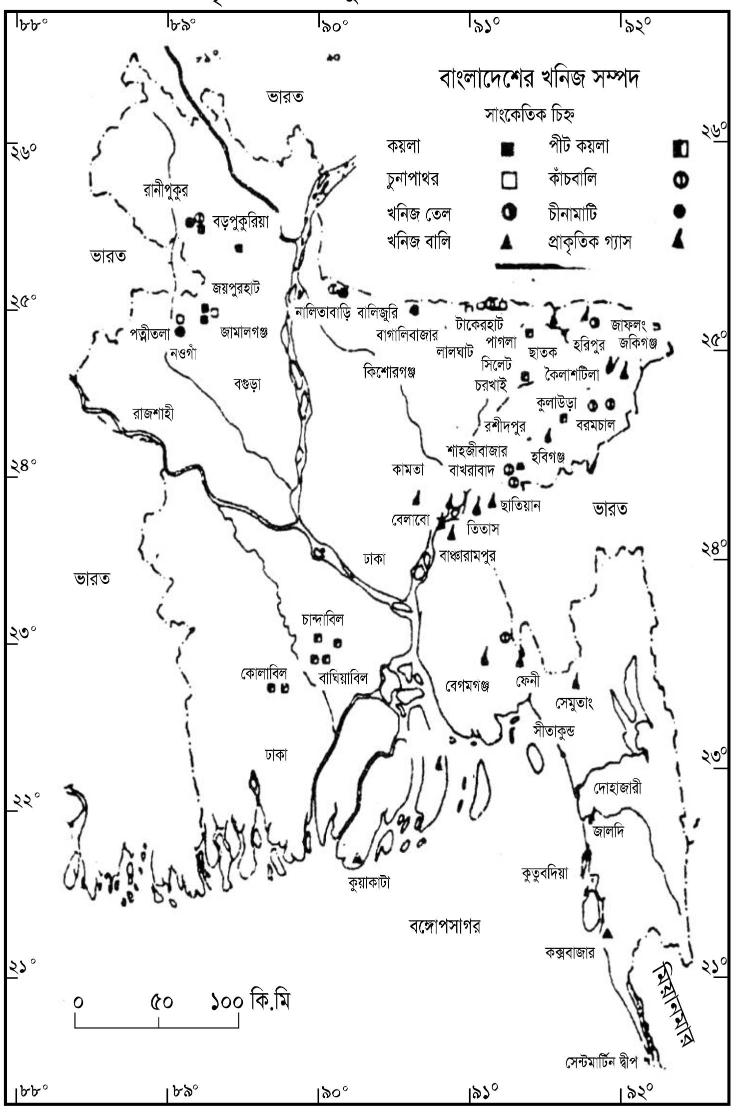

চিত্র ৩.৫.১ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

কঠিন শিলা (Hard Rock) : রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার রানীপুকুর এবং শ্যামপুরে কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুর জেলার পাবর্তীপুর উপজেলার মধ্যপাড়ায় ভূ-গর্ভের ২১২ মিটার নিচে অনুরূপ শিলা পাওয়া গেছে।

বর্তমানে এ খনি থেকে কঠিন শিলা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে কঠিন শিলার সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ প্রায় ১১৫ মিলিয়ন টনের অধিক। রেলপথ, রাস্তাঘাট, গৃহ, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে কঠিন শিলা ব্যবহার করা হয়।

চুনাপাথর (Limestone) : সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট, লালঘাট ও বাগলিবাজার, সিলেট জেলার জাফলং, কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন, জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় চুনাপাথর পাওয়া যায়। বাংলাদেশের চুনাপাথরের সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ১২৯ মিলিয়ন টনের অধিক। সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গ্লাস, ব্লিচিং পাউডার, সাবান, কাগজ পেইন্ট প্রভৃতি শিল্পেও চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চীনামাটি (China Clay) : বাংলাদেশের ময়মনসিংহের বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা এবং দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে চীনামাটি পাওয়া যায়। বাসনপত্র, কাগজ, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর, স্যানিটারি জিনিসপত্র প্রভৃতি কাজে চীনামাটি ব্যবহার করা হয়।

নুড়িপাথর (Gravel) : সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ ও পিয়ানগঞ্জ, পঞ্চগড় জেলার সদর ও তেঁতুলিয়া উপজেলা, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলা প্রভৃতি স্থানে নুড়িপাথর পাওয়া যায়। নুড়িপাথর প্রধানত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, ব্রিজ, কালভার্ট, রেলপথ ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

খনিজ বালি (Mineral Sand) : কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া যায়। এ বালিকে তেজস্ক্রিয় বালি বলা হয়। প্রধানত ধাতব শিল্পে এ বালি ব্যবহৃত হয়।
উপরিউক্ত খনিজ সম্পদসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশে সামান্য পরিমাণে আকরিক লৌহ, গন্ধক প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পূরণ করুন।

খনিজ সম্পদের নাম	উৎপাদনকারী অঞ্চল	ব্যবহার
তেল		
কয়লা		
চুনাপাথর		
নুড়িপাথর		

সারসংক্ষেপ

যে কোনো দেশের শিল্পের উন্নয়নের জন্য খনিজ সম্পদ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রকৃতির এ সম্পদ মানুষের বহুমুখী কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, চীনামাটি, নুড়িপাথর, খনিজ বালি প্রভৃতি। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ২৬টি গ্যাসক্ষেত্রে সম্ভাব্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রথম তেল আবিষ্কৃত হয়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালেও একটি তেলক্ষেত্র রয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়লা, কঠিন শিলা, নুড়িপাথর, চীনামাটি, খনিজ বালি প্রভৃতি উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হওয়ায় প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ ব্যবহারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চুনাপাথর পাওয়া যায়-

i. টাকেরঘাট ii. সেন্টমার্টিন

iii. জামালগঞ্জ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। খুলনার কোলাবিল ও দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় পাওয়া যায়-

(ক) গ্যাস (খ) চুনাপাথর

(গ) কয়লা (ঘ) নুড়িপাথর

৩। নুড়িপাথর পাওয়া যায়-

i. পঞ্চগড় ii. সিলেট

iii. লালমনিরহাট

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জ্বালানির প্রধান উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল। কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্পদের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে প্রতি বছর বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়।

৪। বাংলাদেশে প্রথম খনিজ তেল পাওয়া যায় কত সালে?

(ক) ১৯৮৪ সালে (খ) ১৯৮৬ সালে

(গ) ১৯৮৮ সালে (ঘ) ১৯৯০ সালে

৫। উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র হলো-

i. বাখরাবাদ ii. বরমচাল

iii. সেমুতাং

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব
Significance of Natural Resources in the Economy of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভূ-প্রকৃতি, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে বুঝায়। এগুলো প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। এসব সম্পদ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি প্রদত্ত এসব সম্পদের উপরই মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বন্টিত নয়। কোথাও সম্পদে ভরপুর আবার কোথাওবা সম্পদের পরিমাণ অপ্রতুল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। তবে এর পরিমাণ সীমিত। প্রকৃতির এসব সম্পদের মধ্যে রয়েছে ভূ-প্রকৃতি, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতি। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ভূ-প্রকৃতি : টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র দেশ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি গঠিত। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি বাংলাদেশকে একটি আদর্শ উর্বর কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করেছে। এসব সমতল ভূমিতে যে কোনো ফসল সহজে আবাদ করা যায়। দেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলেও সাধারণ মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম, উর্বর মৃত্তিকা, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারের নীতি ও সহযোগিতা বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া সমতল ভূমিতে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা দ্রুত প্রসারে সহায়তা করে। অন্যদিকে, পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ও জনজীবন কষ্টকর হলেও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার বড় বড় বৃক্ষ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি মূল্যবান কাঠ সরবরাহ করে। এছাড়া প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে সীমিত পরিসরে কৃষির পাশাপাশি মূল্যবান বৃক্ষের অন্যতম উৎস। এসব বিবেচনায় বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূ-প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বনজ সম্পদ : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে বাঁশ, কাঠ, জ্বালানি, ফলমূল, মোম, মধু প্রভৃতি বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের উপকরণ যেমন-ঘরের খুটি, খাট, পালঙ্ক, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, শিল্পের কাঁচামাল, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপকরণ, পর্যটন শিল্পের উন্নতি, বেকার সমস্যা হ্রাস প্রভৃতিতে বনজ সম্পদ কাজে লাগে। কৃষির উন্নয়নে অর্থাৎ মৃত্তিকার আর্দ্রতা রক্ষা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, মৃত্তিকার ক্ষয় প্রতিরোধ, বন্যা ও সাইক্লোনের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসেও বনভূমি ভূমিকা রাখে যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া বনভূমি থেকে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যায়। যেমন-কাগজ শিল্প, নিউজপ্রিন্ট কারখানা, রেয়ন শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, পরিবহন তৈরি, পেন্সিল তৈরির কাঁচামাল। এছাড়া সুন্দরবনে প্রাপ্ত সম্পদ সেখানকার মানুষের জীবনধারণ এবং প্রকৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৎস্য সম্পদ : বাংলাদেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস মৎস্য। দেশের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মৎস্য। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশে উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২৩.৮১ শতাংশ আসে মৎস্যখাত থেকে। বাংলাদেশের মৎস্যের উৎসমূহের মধ্যে রয়েছে নদী ও মোহনা, সুন্দরবন, বিল, কাপ্তাই হ্রদ, প্লাবন ভূমি, পুকুর, হাওড়, বাওড়, অর্ধ আবদ্ধ, চিংড়ি খামার এবং দক্ষিণে অবস্থিত বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর প্রভৃতি। এদেশে স্বাদু ও লবণাক্ত উভয় পানির মৎস্য পাওয়া যায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,২৮২.৮২ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭)। নিম্নের ছকে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব দেখানো হলো-

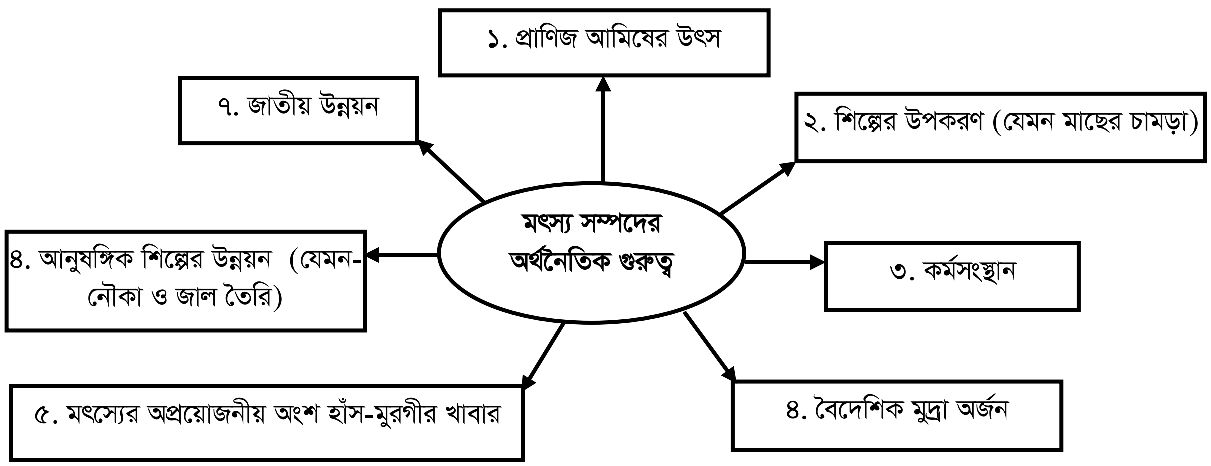

খনিজ সম্পদ : বিশ্বের যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও যেটুকু খনিজ সম্পদ রয়েছে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, নুড়িপাথর প্রভৃতি। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭১ ভাগ পূরণ করে প্রাকৃতিক গ্যাস। খনিজ তেল পরিশোধন করে ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতিতে রূপান্তর করে ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলো বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- চুনাপাথর সিমেন্ট শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কৃষি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ছাড়াও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, নদ-নদী, খালবিল, হাওড়, বাওড় প্রভৃতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। তাই এসব প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে বুঝায়। প্রকৃতির এসব সম্পদ মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। যেসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে সেসব দেশ উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যায়। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয়, তবে যেসব সম্পদ রয়েছে সেগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিস্তীর্ণ ভূ-প্রকৃতি, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী প্রভৃতি। সীমিত এসব প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ হলো-
i. বনভূমি ii. ভূ-প্রকৃতি
iii. কাল-কারখানা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। বনজ সম্পদ থেকে পাওয়া যায় কোনটি?
(ক) জ্বালানি (খ) কাঠ
(গ) ফলমূল (ঘ) সবগুলো সঠিক

৩। প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস কোনটি?
(ক) ডিম (খ) মৎস্য
(গ) কবুতর (ঘ) ছাগল

৪। নিচের কোনটি খনিজ সম্পদ?
(ক) কয়লা (খ) কাঠ
(গ) মোম (ঘ) মৎস্য

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল) প্রশ্ন

১) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

যে কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। তদুপরি অধিক জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিনিয়ত বৃক্ষ কর্তন করা হচ্ছে। এছাড়া কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থে বৃক্ষ নিধন করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিদ্যমান বনভূমিকে সংরক্ষণ এবং নতুন বৃক্ষ রোপন করতে হবে।

(ক) বনজ সম্পদ কাকে বলে? ১
(খ) বাংলাদেশের বনভূমিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? ২
(গ) বনজ সম্পদ সংরক্ষণে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ? আপনার মতামত দিন। ৩
(ঘ) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভিন্ন ধরনের বনভূমি গড়ে উঠার কারণ বিশ্লেষণ করুন। ৪

২) নিচের ছবিটি দেখুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

(ক) খনিজ কী? ১
(খ) চুনাপাথর ও চীনামাটি কোথায় পাওয়া যায়? ২
(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও বন্টন বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) বাংলাদেশের অর্থনীতেতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১	:	১। গ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ	৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২	:	১। খ	২। ঘ	৩। ক	৪। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩	:	১। ক	২। ঘ	৩। ক	৪। খ	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪	:	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। ক	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫	:	১। ঘ	২। গ	৩। ঘ	৪। খ	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬	:	১। ক	২। ঘ	৩। খ	৪। ক	

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ
Family Structure of Bangladesh and Socialization

ইউনিট ৬

ভূমিকা : সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরিবার একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র পরিবার ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। তবে বিভিন্ন সমাজে পরিবারের কাঠামোতে ভিন্নতা দেখা যায়। কোথাও একক পরিবার, কোথাও যৌথ পরিবার, কোথাও এক-বিবাহভিত্তিক পরিবার, কোথাও বহু-বিবাহভিত্তিক পরিবার, কোথাও নয়াবাস ভিত্তিক পরিবার, কোথাও মাতৃবাস আবার কোথাও পিতৃবাস ভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। পরিবারকে যে কাঠামোতেই দেখা যাক না কেনো পরিবারের মৌলিক কার্যাবলির কোনো তারতম্য নেই। সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। আর পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো একটি শিশুকে সামাজিক জীবে পরিণত করা। জন্মের সময় একটি শিশু কেবল মানব শিশুই থাকে কিন্তু বৃহৎ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে সামাজিক জীবে পরিণত হয়। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ : পরিবারের ধারণা ও ধরন
পাঠ-৬.২ : বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো
পাঠ-৬.৩ : সামাজিকীকরণের ধারণা ও এর বাহনসমূহ
পাঠ-৬.৪ : সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা

পাঠ-৬.১ পরিবারের ধারণা ও ধরন

Concept and Types of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবার সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- পরিবারের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবার, ধরন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

পরিবারের ধারণা

পরিবার হলো সর্বজনীন মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান বিধায় পৃথিবীর সকল সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। একজন মানুষ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে, বেড়ে উঠে, কর্মজীবন শেষ করে পরিবারে ফিরে আসে এবং এখানেই তার জীবনাবসান ঘটে।

ইংরেজি 'Family' শব্দের অর্থ হলো পরিবার। এটি ল্যাটিন শব্দ 'Familia' থেকে এসেছে। সাধারণ কথায় পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একত্রে বসবাস করে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে পরিবারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো-

ক) সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ এর মতে, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করেন।

খ) সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, পরিবার হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী যা সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যাকে সুস্পষ্ট জৈবিক সম্পর্কের দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা যায়।

গ) সমাজবিজ্ঞানী এন্ডারসন ও পার্কার এর মতে, পরিবার হলো একটি সমাজ স্বীকৃত একক যার সদস্যরা রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক বন্ধন ও আইনের সম্পর্কে সম্পর্কিত।

ঘ) আরনল্ড গ্রীণ বলেন, "পরিবার হচ্ছে জনসংখ্যা প্রতিস্থাপনের দায়িত্ব পালনকারী প্রাতিষ্ঠানিকতাসম্পন্ন একটি সামাজিক গোষ্ঠী।"

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলা যায় যে, পরিবার হলো মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংগঠন যার সদস্যরা রক্ত, বৈবাহিক বা আইনানুগ সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ হয়ে সন্তান-সন্তনিসহ বা সন্তান-সন্তনি ছাড়া একত্রে বসবাস করে। এই সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন থাকে। পরিবারের সদস্য হিসেবে যথাযথ সামাজিক এবং পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে।

পরিবারের ধরন

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিাবরের ধরন ঠিক করা হয়ে থাকে। যেমন- ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, বসবাসের স্থান, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, কাঠামো বা আকার, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি। নিম্নে আমরা পরিবারের ধরন সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

ক) বংশ পরিচয় এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার: বংশ পরিচয় এবং সম্পত্তিতে অধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার এবং মাতৃসূত্রীয় পরিবার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যে পরিবার ব্যবস্থায় সন্তানগণ পিতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম ব্যবহার করে তাকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। আর যে পরিবার ব্যবস্থায় সন্তানগণ মাতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম ব্যবহার করে তাকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে।

খ) বসবাসের স্থান: বিবাহের পরে বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃবাস, মাতৃবাস এবং নয়াবাস-এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

বিবাহিত নব দম্পতি স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করলে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। অপরপক্ষে, বিবাহিত নব দম্পতি স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে বসবাস করলে তাকে মাতৃবাস পরিবার বলে। আর বিবাহিত নব দম্পতি সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন বাড়িতে বসবাস করলে তাকে নয়াবাস পরিবার বলে।

গ) ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের মাত্রা: ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের মাত্রার দিক থেকে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

কোনো পরিবারের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পুরুষের ওপর ন্যাস্ত থাকলে তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। আর যে পরিবারের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নারীর ওপর ন্যাস্ত থাকে তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে।

ঘ) স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা: স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে ক) এক-বিবাহভিত্তিক পরিবার, খ) বহুস্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার, গ) বহুস্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং ঘ) দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার।

যে পরিবার একজন পুরুষ এবং একজন নারীর বিবাহের মাধ্যমে গঠিত হয় তাকে এক-বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। একজন পুরুষ এবং একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে গঠিত পরিবারকে বহুস্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। একজন মহিলার সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত হলে তাকে বহুস্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। আর যদি একাধিক নারীর সাথে একাধিক পুরুষের বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত হয় তাকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। উল্লেখ্য, শেষোক্ত দু'ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

ঙ) পরিবারের আকার বা কাঠামো: আকার বা কাঠামোর দিক থেকে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ক) অণু পরিবার, খ) যৌথ পরিবার এবং গ) বর্ধিত পরিবার।

স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান নিয়ে গঠিত হয় তাকে অণু পরিবার বলে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃবধূ কিংবা পুত্রবধূ নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে যৌথ পরিবার বলে। একক পরিবার বর্ধিত হয়ে গঠিত হয় বর্ধিত পরিবার। এর সদস্য হলো দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়েসহ তিন প্রজন্মের মানুষ।

চ) গোষ্ঠী-বিবাহ: গোষ্ঠী বিবাহের ভিত্তিতে দু'ধরনের পরিবার গঠিত হয়। ক) অন্তঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং খ) বহিঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার।

কোনো ব্যক্তি যখন নিজ গোষ্ঠীর ভেতরে বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠন করেন তখন তাকে অন্তঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। অন্যদিকে, কোনো ব্যক্তি যখন নিজ গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠন করেন তখন তাকে বহিঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। বহিঃগোষ্ঠী বিবাহ আবার দু'প্রকার। ক) অনুলোম বিবাহ এবং খ) প্রতিলোম বিবাহ। উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রীর বিবাহ হলে তাকে অনুলোম বিবাহ বলে। আর নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রীর বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**পরিবারের ধরনগুলো চিহ্নিত করুন।**	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পরিবার হলো মৌলিক সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর সকল সমাজে পরিবার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একত্রে বসবাস করে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিাবরের ধরন ঠিক করা হয়ে থাকে। যেমন- ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, বসবাসের স্থান, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, কাঠামো বা আকার, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পরিবার কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

i. সামাজিক

ii. ধর্মীয়

iii. রাজনৈতিক

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করলে তাকে কোন ধরনের পরিবার বলে?

i.পিতৃবাস

ii.মাতৃবাস

iii.নয়বাস

কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ-৬.২ বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো
Family Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পিতৃপ্রধান, পিতৃবাস, নয়াবাস, একক বিবাহ ভিত্তিক, কাঠামো ইত্যাদি।

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো

আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, ধর্ম, বসবাসের স্থান, অর্থনৈতিক শ্রেণি ও সামাজিক পদমর্যাদা ইত্যাদির উপর বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো নির্ভর করে থাকে। ক্রমাগত শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত পারিবারিক কাঠামোতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে। এখনো বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে যার ফলে পরিবার কাঠামোতে শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় কম পরিবর্তন এসেছে। তারপরও শিল্পায়ন এবং নগরায়ন বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে প্রভাব ফেলেছে। নিম্নে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোর স্বরূপ আলোচনা করা হলো-

১) পিতৃপ্রধান পরিবার

বাংলাদেশের পরিবার হলো প্রধানত পিতৃপ্রধান পরিবার। তবে আধুনিক শিক্ষা, জনসচেতনতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের কারণে শহরের কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২) একক বিবাহভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোর মূল ভিত্তি হলো একক বিবাহভিত্তিক পরিবার। তবে কিছু কিছু মুসলিম পরিবারে বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এখন আর আগের তুলনায় বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রচলন তেমন দেখা যায় না।

৩) পিতৃবাস ভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের প্রায় সকল পরিবারই পিতৃবাসভিত্তিক। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের কিছু সমাজে পুরোপুরি মাতৃবাস প্রথা প্রচলিত। যেমন গারো সমাজ। তীব্র প্রতিযোগিতার এই সময়ে কর্মসংস্থানের জন্য, কখনো আবার সন্তানদের পড়ালেখার জন্য অনেকেই পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে শহর এসে নয়াবাস গড়ে তোলে।

৪) অণু পরিবার

শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবিকা নির্বাহের তাগিদ ইত্যাদি কারণে ইদানিং বাংলাদশের শহরাঞ্চলে প্রধানত অণুপরিবার লক্ষ্য করা যায়। তবে এটিই স্বতঃসিদ্ধ নয়, এর উল্টোটাও আছে। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে এখন একক পরিবারের প্রাধান্য বেশি। এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। অধিক জনসংখ্যার চাপ, সম্পদের অপ্রতুলতা, ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশায় নির্ভরতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এখন আর আগের মতো নেই।

৫) সমতা ভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে পিতা-মাতা/স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আত্মীয়-স্বজনদের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সম্পত্তিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উত্তরাধিকার বজায় থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, জীবনমান নির্বাহে খরচ বৃদ্ধি, আয়ের স্বল্পতা এবং বসত ভিটায় জায়গার অভাব ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে অণু পরিবারে রূপ লাভ করলেও বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন বিশেষ করে পিতা-

মাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষের লোকজন এসে বসবাস করায় এখনো যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন লক্ষ করা যায়। কিন্তু শহর এলাকায় এটি মোটামুটি বিরল। জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষের কাজের ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারণে মানুষ আর আগের মতো পারিবারিক দায়-দায়িত্ব নিতে চায় না। ফলে ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার এবং একক পরিবার থেকে গঠিত হচ্ছে অণু পরিবার। মাতৃবাস ও পিতৃবাস পরিবার প্রথা ভেঙ্গে নয়াবাস ব্যবস্থাও ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তারপরও সার্বিক বিচারে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও পারিবারিক সম্পর্ক শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সুদৃঢ়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পিতৃবাস পরিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে ০৫ টি বাক্য লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, নগরায়ন, শিল্পায়ন, সেবাখাতে কর্মসংস্থান, বসবাসের স্থান ইত্যাদি বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোকে প্রভাবিত করছে। গঠন কাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে একক পরিবার এবং নগর সমাজে অণু পরিবারের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। বসবাসের দিক থেকে পিতৃবাস পরিবার এবং কর্তৃত্বের দিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বাংলাদেশের সমাজের ঐতিহ্য বলে পরিগণিত। তবে নগর সমাজে নয়াবাস পরিবার ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে নব দম্পতি-

i. স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করে

ii. স্ত্রী পিতার বাড়িতে বসবাস করে

iii. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পিতার বাড়িতে বসবাস করে

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। নয়বাস পদ্ধতি হলো-

i. সম্পূর্ণ নতুনভাবে নতুন বাসস্থানে বসবাস

ii. নানার বাড়িতে বসবাস

iii. দাদার বাড়িতে বসবাস

কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ-৬.৩ সামাজিকীকরণের ধারণা ও এর বাহনসমূহ
Concept and Agents of Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামাজিকীকরণের বাহনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, সামাজিকীকরণের বাহন।

সামাজিকীকরণের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানে 'সামাজিকীকরণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। একটি মানব শিশুকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সামাজিক জীব হয়ে উঠতে হয়। একটি শিশু জৈবিক সত্ত্বা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সে আস্তে আস্তে সমাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি শেখার মাধ্যমে সামাজিক জীবে পরিণত হয়। সাধারণ কথায় সামাজিকীকরণ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে বিধিসম্মত আচরণকে শেখানোর মাধ্যমে পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলে। সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে 'সামাজিকীকরণ' এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

ম্যাকাইভার এর মতে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলে, যার ফলে তার নিজের এবং অপরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে।

কিংগসলে ডেভিস মনে করেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব শিশু পরিপূর্ণ সামাজিক জীবে পরিণত হয় সে প্রক্রিয়াটিই 'সামাজিকীকরণ' প্রক্রিয়া।

ল্যান্ডবার্গ বলেন, সামাজিকীকরণ মিথস্ক্রিয়ার এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন মানুষ অভ্যাস, দক্ষতা, বিশ্বাস, বিচার বুদ্ধি অর্জন করে, যা সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন।

কিমবল ইয়ং এর মতে, সামাজিকীকরণ বলতে একজন ব্যক্তিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে অধিষ্ঠিত করাকে বোঝাবে যার মাধ্যমে সে সমাজ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্য হয় এবং সে সমাজের মূল্যবোধ ও আদর্শ শেখে। সামাজিকীকরণ জৈবিক উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং এটি একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়।

আরনল্ড গ্রীন এর মতে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি মানব শিশু নিজ সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভ করে এবং তার মধ্যে অহংবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তাকে সামাজিকীকরণ বলে।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, যে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ সামাজিক ভূমিকা পালনে যথাযথভাবে সক্ষম হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার সমাজ ও সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ শেখে এবং যার ফলে তার ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। কোনো ব্যক্তির যথাযথ সামাজিকীকরণ না হলে সে অনেক অসামাজিক আচরণ করে এবং তার আচরণ সমাজ কর্তৃক সমালোচিত হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণের ফলে মানুষের মধ্যে অহংবোধের বিকাশ ঘটে যার ফলে একজন মানুষের ভেতর সম্প্রদায়গত অনভূতির জন্ম হয়। সামাজিকীকরণ একজন মানুষকে সামাজিক জীবনে মিথষ্ক্রিয়া, একত্রে কাজ করার ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করতে সাহায্য করে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

কতক বাহনের সাহায্যে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কোনো ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া তার জীবনব্যাপী অব্যহত থাকে। তাই সামাজিকীকরণকে একটি দীর্ঘ জীবনকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বা 'Life long process' হিসেবে অভিহিত করা হয়। আর এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাহন ব্যক্তির সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, পড়ার সাথী, বিদ্যালয়, গণমাধ্যম ইত্যাদি সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক) পরিবার

পরিবারকে বলা হয় সামাজিকীকরণের সবচেয়ে কার্যকরী বাহন। কেননা পরিবারেই মাতা-পিতার মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণের হাতেখড়ি হয়। শুধু মাত-পিতা হিসেবেই তারা শিশুর ঘনিষ্ট নয়, তারা দৈহিক এবং জৈবিকভাবেও ঘনিষ্ট। শিশুর মুখের প্রথম বুলির সূত্রপাত হয় মাতা-পিতার মুখের বুলি শুনে। শিশুর মধ্যে সামাজিক আচার আচরণের শুরু হয় পরিবারে মাতা-পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা-ভক্তির মাধ্যমে। সামাজিক মূল্যবোধেরও সূচনা হয় পরিবার থেকে যার ফলে শিশুর মাঝে সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহ-ভালোবাসসহ বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন করে। পরিবারে সামাজিকীকরণের ঘাটতি দেখা দিলে শিশু-কিশোরদের মাঝে নানা রকম অসামাজিক আচরণের প্রভাব পড়ে।

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সহপাঠী

পরিবারের পরে সামাজিকীকরণের যে বাহনটি কাজ করে সেটি হলো বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ে পড়ার সাথী। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পড়ানো এবং অন্যান্য পড়ার সাথীদের আচরণ শিশুরকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সহপাঠীরা ভালো হলে শিশুর আচরণে ভালো দিকটি উঠে আসে। আধুনিক এবং নৈতিকতায় পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা শিশুর মাঝে ভালো গুণাবলির বিকাশ ঘটে। বিদ্যালয়ে পড়ার সাথীরা ভালো আচরণের অধিকারী হলে শিশুর আচরণ সুন্দর হয়। আর খারাপ আচরণের অধিকারী হলে শিশুরা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানারকম অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃংখলা শিশুকে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেয় এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে। ব্যক্তির জীবনে শৃঙ্খলাবোধের সূচনাও হয় তার স্কুল জীবন থেকে। সেক্ষত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি গোটা জীবনের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

গ) খেলার সাথী এবং সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব

খেলার সাথী এবং সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। এদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে পাস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং ব্যক্তিত্বের উপলব্ধির বিকাশ ঘটে। খেলার সাথী এবং সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে এমন কিছু বিষয় শেখে যা তারা পরিবার কিংবা অন্য কারো কাছ থেকে পায় না। হাল-ফ্যাশন, কোনো বিষয় সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য, সহযোগিতার মানসিকতা শিশুরা তার খেলার সাথী এবং বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে শিখে থাকে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানীগণ শিশুর সমাাজিকীকরণে সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁদের মধ্যে সমাজ-মনোবিজ্ঞানী মিড এবং পিঁয়াজে- এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সমবয়সীদের বন্ধু-বান্ধবকে Peer হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ঘ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি

ধর্ম সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মীয় রীতিনীতি সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ, কর্তব্য ও মূল্যবোধ শিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলে। এ প্রক্রিয়ায় শিশুরা নৈতিকতা শেখে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের বিষয়গুলো রপ্ত করে নেয়।

ঙ) রাষ্ট্র

রাষ্ট্রকে সামাজিকীকরণের কর্তৃত্বমূলক বাহন হিসেবে অভিহিত করা হয় কেননা রাষ্ট্রের কিছু বাধ্যতামূলক পালনীয় আইন, বিধিবিধান, নিয়ম ইত্যাদি মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

চ) জ্ঞাতি সম্পর্কের লোকজন

জ্ঞাতি সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন দ্বারা শিশুরা অনেকটাই প্রভাবিত হয়। শিশুরা আত্মীয়দের সংস্পর্শে আচার-ব্যবহার, চালচলন, মূল্যবোধ ইত্যাদি শিক্ষা পায় যা তাদেরকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ছ) গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বর্তমান যুগে সামাজিকীকরণের সবচেয়ে কার্যকরী বাহন হলো গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এসব মাধ্যমের সাহায্যে শিশুরা নানারকম বিষয়াদি শিখে থাকে। যেমন-রেডিও, টেলিভিশন ও চলচিত্রের বিভিন্ন চরিত্র শিশুদেরকে প্রভাবিত করে। হাল-ফ্যাশনের অনেক কিছুই শিশুরা এসব মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে শিখে থাকে। বর্তমান কিছু কিছু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন-ফেইসবুক, ইমেইল, টুইটার, ভাইবার, ইউটিউব, ওয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ইত্যাদি শিশুদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। তবে এর একটা নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাহিকীকরণের বাহনগুলো চিহ্নিত করুন।	সময় ০৫ মিনিট

সারসংক্ষেপ

সামাজিকীকরণ হলো একটি জীবন ব্যাপীপ্রক্রিয়া। সাধারণ কথায় সামাজিকীকরণ বলতে এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে বিধিসম্মত আচরণকে শেখানোর মাধ্যমে পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলে। আর এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাহন ব্যক্তির সামাজিকীকরণে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, পড়ার সাথী, বিদ্যালয়, গণ মাধ্যম ইত্যাদি সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিকীকরণ কেমন প্রক্রিয়া-

i. স্বল্পকালীন

ii. দীর্ঘকালীন

iii. জীবনব্যাপী

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

২। Peer মানে কী?-

i. সমান

ii. জোড়া

iii. অসমান

কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ-৬.৪ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা
Role of Family in Socialization Process

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, পরিবার।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা

পরিবার হলো সামাজিকীকরণের সূতিকাগার। কেননা পরিবারেই একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, এখানে সে বড় হয়ে উঠে, বৃদ্ধ হয় এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। যেহেতু সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া আর মানুষ সারা জীবন পরিবারেই কাটায় সেহেতু ব্যক্তির সামাজিকীকরণে পরিবার সবসময়ই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও পরিবারের জ্ঞাতিসম্পর্কের লোকজন থেকে শুরু করে পরিবারের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উপাদান সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারে মাতা-পিতার প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা, তাদের আচরণের অনুকরণ এবং মূল্যবোধ, আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে

শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মাতা-পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। তবে শিশুর আচরণের উপর মাতা-পিতার আচরণের প্রভাব শুধু যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেটি নয়, বরং মাতা-পিতার জীবন-প্রণালী এবং তাদের সংস্কৃতিও শিশুর আচার আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশুর আচরণের উপর তার পরিবারের সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা, মতামত, রীতিনীতি, আদর্শ, সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। তবে কখনো কখনো শিশুর প্রতি মাতা-পিতার খারাপ আচরণ শিশুদেরকে প্রভাবিত করে। ফলে শিশুরা জেদি, একগুয়ে এবং অসামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যদের মাঝে রাগ, ক্রোধ, উদ্বেগ, আগ্রাসী মনোভাব, ভয়, লজ্জা ইত্যাদি শিশুকে অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত করতে পারে। তবে শিশুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, সুন্দর বিষয়গুলোর স্মৃতিচারণে অংশগ্রহণ, অন্যান্য মানুষের সাথে মাতা-পিতার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শিশুর সামাজিকীকরণে সহায়তা করে।

ক) শিশুর শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণে মাতা-পিতার ভূমিকা

প্রত্যেকটি পরিবারই সমাজের এক একটি অংশ। কিছু পরিবার মিলে সমাজে গঠিত হয়। আদর্শ পরিবারই একটি আদর্শ সমাজ উপহার দিতে পারে। পরিবারই শিশুর শিক্ষার সকল দায় দায়িত্ব পালন করে যা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পারিবারিক পরিমন্ডলে অর্থাৎ মাতা-পিতার কাছ থেকে ভালো শিক্ষা গ্রহণ এবং আচার আচরণ শেখার মাধ্যমেই শিশু বড় হয়ে সুনাগরিক হয় এবং নাগরিক অধিকার-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়। শিশুর শিক্ষাদান এবং তাকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা পরিবারের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুর শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে মাতা-পিতাকে অবশ্যই স্নেহপ্রবণ, কঠোর, শান্ত ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হয়।

খ) শিশুর সামাজিকীকরণে মায়ের ভূমিকা

মা হলো শিশুর স্নেহ ভালোবাসার আধার। শিশুর সামাজিকীকরণে মা স্নেহ ভালোবাসার মাধ্যমেই শিশুর মাঝে মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটান। শিশুরা সাধারণত আবেগপ্রবণ ও স্নেহাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। তাই তাদেরকে দিয়ে ভালো কিছু করাতে হলে অবশ্যই তাকে আদরের পরিবেশে করাতে হবে। আর এ দায়িত্বটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মায়েরাই করে থাকেন।

গ) শিশুর শিক্ষা দীক্ষায় মা-বাবার ভূমিকা

শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন তার মা ও বাবা। কেননা মা-বাবার মুখ থেকেই শিশু কথা বলার বিষয়টি রপ্ত করে এবং আচরণ শেখে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিশুর আচরণ কেমন হবে, কাকে কী নামে সম্বোধন করতে হবে, প্রতিবেশির প্রতি শিশুর মনোভাব কী হবে এসব কিছুই শিশু তার মা-বাবা'র থেকে শিখে থাকে। এমনকি মা-বাবার সম্মান এবং অন্যান্যদের প্রতি তাদের আচরণ শিশুর ভবিষ্যৎ মন-মানসিকতার উপর প্রভাব ফেলে।

ঘ) সামাজিকীকরণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা

মাতা-পিতার বাইরে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমনঃ দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, চাচা-মামা, খালা-ফুফু সবাই শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে স্বামী স্ত্রী উভয়েই জীবিকা নির্বাহের কাজে অথবা ক্যারিয়ারের কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেক সময় শিশু তার দাদা-দাদি/নানা-নানি অথবা অবিবাহিত চাচা, মামা, খালা, ফুফু যারা এখনও কর্মসংস্থানে প্রবেশ করেননি তারা শিশুর দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। এক্ষেত্রে মাতা-পিতার মতো তারাও শিশুকে সঠিক বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে যথাযথ সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, শিশুর সামাজিকীকরণ কখনোই অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে করা অসম্ভব। তাই শিশুর/ব্যক্তির সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা বিষয়ে ৫টি বাক্য লিখুন। সময় ৫ মিনিট

সারসংক্ষেপ

পরিবারে মাতা-পিতার বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা, তাদের আচরণের অনুকরণ এবং মূল্যবোধ, আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। তবে শিশুর আচরণের উপর মাতা-পিতার আচরণের প্রভাব শুধু যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেটি নয়, বরং মাতা-পিতার জীবন-প্রণালী এবং তাদের আচরণও শিশুর আচার আচরণকে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিকীকরণ সূতিকাগার নিচের কোনটি -

i. পরিবার
ii. বিবাহ
iii. রাষ্ট্র
কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

২। কে শিশুর প্রথম শিক্ষক?-

i. চাচা
ii. ভাই
iii. মা
কোনটি সঠিক

(ক) i খ) ii
(গ) iii (ঘ) ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমিনের মা ছোটকাল থেকেই আমিনকে বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়ে আসছেন। তার বাবাও এ ব্যাপারে আমিনকে শিখিয়েছেন যে, যেমন-আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর সাথে আচরণ, শিক্ষকের মর্যাদা, গুরুজনে শ্রদ্ধা। আমিন পড়ালেখাতেও ভালো। ক্লাশের সকলে আমিনকে পছন্দ করে।

(ক) পরিবার কী? ১

(খ) নয়াবাস বলতে কী বোঝেন? ২

(গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গনের একটি কারণ-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

(ঘ) উপরের উদ্দীপকের আলোকে পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কারুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন প্রশ্নের উত্তর দিন।

সিঁথির তার মায়ের সাথে গ্রামে থাকত। নবম শ্রেণিতে সে শহরের একটি স্কুলে ভর্তি হয়। শহরে এসে সে নতুন সহপাঠী, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সাথে পরিচিতি হয়। সে তখন দেখল, আচার-আচরণ, মানুষের সাথে আন্তঃযোগাযোগ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়াসহ নানা বিষয়ে সে অনেক কিছু জানে না। প্রতিদিনই সে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। অফিস থেকে ফিরে বাবাও তাকে নানা বিষয়ে নির্দেশনা দেন। টিভি দেখেও সে অনেক কিছু শিখতে পারে।

(ক) একটি শিশু পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠে কিভাবে? ১

(খ) সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝ। ২

(গ) সামাজিকীকরণে বাহনগুলো কি কি? ৩

(ঘ) সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়নের (বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ : ১। ক ২। গ

রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন

State, Citizenship and Law

ইউনিট
৭

ভূমিকা : রাষ্ট্র হচ্ছে সর্ববৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্রের সবগুলো উপাদানের সমন্বয়ের জন্য কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন প্রয়োজন পড়ে। যেমন নাগরিকত্ব বিষয়টিও আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। তেমনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যাবলি, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সবকিছুই আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়। এ ইউনিটে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদান, কার্যাবলি, নাগরিক, নাগরিকত্ব, আইন, আইনের উৎস, প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা থাকবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি
পাঠ-৭.২ : নাগরিকতা
পাঠ-৭.৩ : আইন
পাঠ-৭.৪ : সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-৭.৫ : বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ

পাঠ-৭.১ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি
State and Functions of State

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাষ্ট্র কী তা বলতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্র, ভূখণ্ড, নাগরিক, সরকার, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের কার্যালবলি, মানবকল্যাণ, সর্বজনীন, অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক।

রাষ্ট্র সর্বজনীন ও সর্ববৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্র নাগরিকগণের বেঁচে থাকার জন্য নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়াও নাগরিকত্বের অপরিহার্য মর্যাদা দিয়ে থাকে। তবে আধুনিককালে রাষ্ট্রের যে রূপ দেখা যায় তা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। এ নিয়ে নানা মতবাদ ও বিতর্ক রয়েছে। সমাজ বিকাশের অনেক পরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বলে চিন্তাবিদরা মনে করেন। প্রাচীন গ্রীসে যে নগর রাষ্ট্রের ইতিহাস পাওয়া যায় তার সাথে আজকের রাষ্ট্রটির অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে রাষ্ট্র নামক এ প্রতিষ্ঠানটি অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ-রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের সংজ্ঞা তুলে ধরা হল।

গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এরিস্টটল বলেন, "রাষ্ট্র হচ্ছে কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন।"
আর. ডব্লিউ. ডব্লিউস্টার এর মতে "রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টি যা কোন সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিকারী এবং যার একটি স্বাধীন বা সার্বভৌম সরকার রয়েছে"।

অর্থাৎ রাষ্ট্র হল নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী এমন একটি জনগোষ্ঠী যাদেরকে পরিচালনার জন্য একটি সরকার এবং স্বীকৃতি স্বরূপ সার্বভৌমত্ব রয়েছে।

রাষ্ট্র গঠনের উপাদান

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের কয়েকটি উপাদান লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের মূল উপাদান চারটি। এগুলো হল- জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এদের যেকোন একটি অনুপস্থিত থাকলে রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

জনসমষ্টি: রাষ্ট্র গঠনের প্রথম ও প্রধান উপাদান হল জনসমষ্টি। জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্র কেন কোন ধরনের সংগঠনই গঠন করা সম্ভব নয়। এই জনসমষ্টিই রাষ্ট্র গঠনের জন্য অন্যান্য উপাদানগুলো নিশ্চিত করে থাকে। একটি রাষ্ট্রের জনসমষ্টি কত হবে তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কম আবার কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেশি। প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের জনসংখ্যার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা ছিল না। তবে রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এরিস্টটল বলেছেন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা তার ভূ-খন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, চীনের বর্তমান জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি ভারতেও বর্তমান জনসংখ্যা ১৩১ কোটি; আবার ভ্যাটিকান সিটির ৫০০জন।

নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড: রাষ্ট্রের অপর অপরিহার্য উপাদান হল ভূখন্ড। কেননা একটি জনগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। যেমন যাযাবর আরব বেদুঈনদের স্থায়ী ভূখন্ড না থাকায় তারা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। রাষ্ট্র গঠনে ভূখন্ডের নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই তবে তা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩৮ লক্ষ বর্গমাইল; অন্যদিকে নাউরুর আয়তন মাত্র ৮ বর্গমাইল। কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানও তার নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন,

দুটি মহাসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে বহি:শক্তির আক্রমণ থেকে বহুলাংশে নিরাপদ রেখেছে।

সরকার: রাষ্ট্রকে জীবদেহের সাথে তুলনা করলে, সরকার হল রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক। একটি জনসমষ্টি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাস করলে তাকে পরিচালনার জন্য একটি সরকার প্রয়োজন। সরকার হল রাষ্ট্রের নির্বাচিত বা অনির্বাচিত শাসকগোষ্ঠী। একটি রাষ্ট্রের সরকার কেমন হবে তা তাত্ত্বিকভাবে জনগণই ঠিক করে থাকে। এই সরকার যেমন গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক হতে পারে তেমনি আকারের দিক থেকে ছোট বা বড়ও হতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকারের সাধারণত নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ থাকে।

সার্বভৌমত্ব: সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। সার্বভৌমত্বের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখন্ড ও সরকার থাকার পরও যদি তাদের সার্বভৌমত্ব না থাকে তবে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। যেমন ফিলিস্তিন জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট ভূখন্ড ও সরকার থাকারও পরও কেবল সার্বভৌমত্ব না থাকার কারণে তারা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি। সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য অনেক সময় চরম মূল্য দিতে হয়। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য দ্বারাই অন্য সকল সংগঠন অপেক্ষা রাষ্ট্রকে আলাদা ও ক্ষমতাবান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি:

টমাস গ্রিণ বলেন "শক্তি নয় ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি"। মানুষ নিজেই তার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র নাগরিকগণের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা দিয়ে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের কার্যাবলি দুই প্রকার। যথা- (ক) অপরিহার্য কার্যাবলি (খ) ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

অপরিহার্য কার্যাবলি:

যে সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও নাগরিকগণের সার্বিক জীবনের জন্য অবশ্যই করতে হয়, সেগুলোই অপরিহার্য কার্যাবলি। নিচে অপরিহার্য কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

সার্বভৌমত্ব রক্ষা : বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এ জন্য রাষ্ট্র তার সক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে পাশাপাশি বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করে।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা: প্রত্যেকটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। জীবনের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারমূলক কাজ। এজন্য রাষ্ট্র পুলিশ বাহিনী কিংবা ফায়ার সার্ভিস বাহিনীর মত ব্যবস্থা গড়ে তুলে।

বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা : বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ব্যবসা-বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি-সংহতি রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে পরস্পরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এসব বিষয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ও স্মারক স্বাক্ষরের জন্য রাষ্ট্র নানাবিধ কাজ করে থাকে।

প্রশাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজ: জনগণের বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে। নির্দিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র এসব দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন শান্তি-শঙ্খলা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আইন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করাও রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। বেসামরিক প্রশাসনও নির্দিষ্ট আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

অর্থনৈতিক কার্যাবলি: রাষ্ট্রের কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য অর্থের সংস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য রাষ্ট্র প্রতি বছর একটি বাজেট প্রণয়ন করে। রাষ্ট্র বিভিন্ন খাজনা ও কর নির্ধারণ ও আদায় করে বাজেটের ব্যয় সংকুলান করে থাকে। এটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য আর্থিক কাজ।

রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ

আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর অনেক কল্যাণমূলক ভূমিকা রয়েছে। জনগণের সার্বিক কল্যাণে রাষ্ট্র নানাবিধ কাজ করে থাকে যে গুলোকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ বা কল্যাণমূলক কাজ বলা হয়। বর্তমান যুগে অবশ্য রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজগুলো তত্ত্বগতভাবে ঐচ্ছিক হলেও বাস্তবে অপরিহার্য কাজে পরিণত হয়েছে।

১. **শিক্ষা বিস্তার :** যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত ও স্বীকৃত। আধুনিককালে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের শত ভাগ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক

বিভিন্নভাবে নারী-পুরুষ, শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করে। এ জন্য রাষ্ট্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানা ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে; শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

২. **স্বাস্থ্য-সেবা নিশ্চিত করা :** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য অন্যান্য বিষয়ের মত একটি সুস্থ-সবল জাতি অপরিহার্য। তাই জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসাপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং হোম স্থাপন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। তাছাড়া চব্বিশ ঘন্টা স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইদানিংকালে রাষ্ট্র টেলিমেডিসিনের মতো নানা ধরনের কার্যক্রমও গ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্রগুলো তার অধিবাসীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে।

৩. **যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ :** স্থল, নৌ, বিমান ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। স্থল পথে সড়ক-জনপথ, রেলপথ নির্মাণ, আধুনিক ও আরামদায়ক পরিবহন সরবরাহ করা, নৌ-পথে লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, বিমানপথে যাত্রীবাহী ও মালবাহী বিমানের ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির প্রয়োগ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গতিশীল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত রাষ্ট্র গঠনে অপরিহার্য।

এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার রক্ষা, শ্রমিক, বয়স্ক-দুস্থ-শিশুদের কল্যাণ ও সাহায্য প্রদান, জনহিতকর কাজ, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজ।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র সর্বজনীন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব সমন্বয়ে গঠিত হয়। রাষ্ট্রের নিকট থেকে নাগরিকের প্রত্যাশা অনেক। নাগরিকের প্রত্যাশা পূরণে রাষ্ট্র নানাবিধ কাজ করে থাকে। এ কাজগুলোকে অপরিহার্য ও ঐচ্ছিক এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সার্বভৌমত্ব রক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা হল অপরিহার্য কাজ। শিক্ষার বিস্তার বা স্বাস্থ্য সেবা দান হচ্ছে তত্ত্বগতভাবে ঐচ্ছিক কাজ বর্তমানে কালে অবশ্য এই কাজগুলো রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যপালনীয় হিসাবে বিবেচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নয় কেন?

(ক) সার্বভৌমত্ব নেই (খ) সরকার নেই (গ) জনগণ নেই (ঘ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই

২। রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন-

i. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা

ii. শিক্ষা বিস্তার

iii. জাতীয় সার্থ রক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক? এগুলো হল-

(ক) ঐচ্ছিক কাজ (খ) অপরিহার্য কাজ (গ) উভয়ই (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৭.২ নাগরিকতা
Citizenship

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নাগরিকতা কী বলতে পারবেন;
- নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন;
- নাগরিকতা বিলোপের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সুনাগরিকের গুনাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নাগরিক, অধিবাসী, স্বীকৃতি, অধিকার, মর্যাদা, জন্মসূত্র, অনুমোদনসূত্র, শর্ত, বিলোপ ইত্যাদি।

নাগরিকতা হল কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃত অধিবাসী হিসেবে একজন ব্যক্তির পরিচয়। কোন ব্যক্তি যখন কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তখনই তিনি একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। নাগরিকের ধারণাটি মূলত প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে বসবাসকারী অধিবাসী থেকে এসেছে। তবে সেখানে সকল অধিবাসী নাগরিক হতে পারত না।

আধুনিক রাষ্ট্র আয়তন, জনসংখ্যা ও কার্যাবলির দিক থেকে অনেক বিশদ। বর্তমানকালে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অধিবাসীদের পক্ষে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। তাই অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা নাগরিক হিসেবে মর্যাদা দানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিগুলো রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা কার্যকর হয়। আধুনিককালে নাগরিকতা অর্জনের দুটি স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে। যথা- জন্মসূত্রে নাগরিকতা এবং অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ক) জন্মনীতি খ) জন্মস্থাননীতি

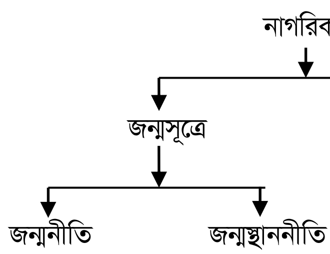

জন্মসূত্রে নাগরিক:

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই নীতি অনুসরণ করে। জন্মনীতির ক্ষেত্রে কোন শিশু তার পিতা-মাতার নাগরিকত্ব অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ করে। অর্থাৎ কোন আমেরিকান দম্পত্তির সন্তান যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে আমেরিকার নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। অন্যদিকে কোন রাষ্ট্র যদি জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে তবে সে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করা সকল শিশুই তার নাগরিক হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশী দম্পতির সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে সে আমেরিকার নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এ দুটি নীতিই অনুসরণ করে।

অনুমোদন সূত্রে: পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র অনুমোদনের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দিয়ে থাকে। যেমন - বাংলাদেশ। সাধারণত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। বিদেশী নাগরিক যদি কোন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তবে সে রাষ্ট্র তাকে নাগরিকত্ব দিতে পারে।

নাগরিকতা বিলোপের কারণ: নিম্নলিখিত কারণে কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব বিলোপ হতে পারে-

(ক) স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে
(খ) রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ করলে
(গ) অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে অনেকক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নাগরিকত্ব বিলোপ হতে পারে
(ঘ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করলে

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য: নাগরিক প্রত্যয়টির সাথে রাষ্ট্র বিষয়টি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবার সাথে তিনি রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার লাভ করেন। যেমন;
রাজনৈতিক অধিকার: নাগরিক হিসেবে প্রধান অধিকার হল রাজনৈতিক অধিকার। এ অধিকারের ফলে রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন- ভোটাধিকার প্রয়োগ, নির্বাচন করার অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক অধিকার: স্বাধীনভাবে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের অধিকার হল অর্থনৈতিক অধিকার। যেমন চাকরি লাভের অধিকার, ব্যবসা করার অধিকার ইত্যাদি।
সামাজিক অধিকার: সমাজে মানুষের মত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য এসব অধিকার গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- সংগঠন করার অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি।

এছাড়াও রাষ্ট্র নাগরিকদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে থাকে।
নাগরিক কর্তব্য: রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করে থাকে

(১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন
(২) কর ও খাজনা প্রদান
(৩) রাষ্ট্রীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শন
(৪) দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা।

নাগরিক একটি আইনগত বিষয়। কোন অধিবাসী যখন এ মর্যাদা লাভ করে তখন তাঁর মধ্যে নাগরিকতার বোধ কাজ করাই সঙ্গত। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ একজন নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। একজন নাগরিক বিশেষ কোন যোগ্যতা ছাড়াই রাষ্ট্র প্রদত্ত নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি ছক আকারে দেখান।

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। প্রত্যেকটি দেশের নাগরিকত্ব আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নাগরিকত্ব দুটি পদ্ধতিতে লাভ করা যায়। যথা- জন্মস্থাননীতি ও জন্মনীতি। যে পদ্ধতিতেই নাগরিক হোক না কেন একজন ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। মৌলিক ও মানবাধিকার এর অন্তর্গত। অপরদিকে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, নিয়মিত কর প্রদানের মতো নানা ধরণের কর্তব্য পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নাগরিকতা কী ধরণের বিষয়?
(ক) সামাজিক (খ) রাজনৈতিক (গ) অর্থনৈতিক (ঘ) আইনগত

২। মুকুলের জন্ম আমেরিকায়। কিন্তু তার মা-বাবা বাংলাদেশি। মুকুলের নাগরিকত্ব কী হবে?
(ক) আমেরিকান (খ) বাংলাদেশি (গ) দ্বৈতনাগরিক (ঘ) নাগরিকত্ব নেই

পাঠ-৭.৩ আইন
Law

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আইন কী তা বলতে পারবেন;
- আইনের উৎসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- আইনের প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন, নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, প্রথা, রীতি-নীতি, আইনসভা ইত্যাদি।

আইন হল বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আইন কেবল কোন নিয়ম-কানুন নয়। এ নিয়ম-কানুন অবশ্যই সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। আইন সকলের জন্য সমান ও অপরিবর্তনীয়। আইন হচ্ছে রাষ্ট্র অনুমোদিত এমন কিছু নিয়ম-কানুন যা স্থান, কাল, ব্যক্তিভেদে সমভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইন বিশেষজ্ঞগণ নানাভাবে আইন সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন:

জিওফ্রে বরার্টসনের মতে- আইন হল "আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ম কানুনের প্রক্রিয়া যা সামাজিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রণীত ও বলবৎ হয়।"

অর্থাৎ আইন হল স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে কার্যকর হয়। আইন স্থির, সুস্পষ্ট, সর্বজনীন, যুক্তিসঙ্গত ও গতিশীল।

আইনের উৎস ঃ আইনের প্রধান উৎসগুলো নিচে আলোচনা করা হল।

(১) প্রথা : বহুদিন ধরে সমাজে প্রচলিত আচার-আচরণ হল প্রথা। প্রথা মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রথা কখনো কখনো অবশ্য পালনীয় হয়ে উঠতে পারে। প্রথা থেকে আইন তৈরি হয়। যেমন, ব্রিটেনে আইনের অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রথা।

(২) **ধর্ম :** ধর্ম আইনের একটি প্রাচীন উৎস। যেমন বর্তমানে সৌদি আরব, ভ্যাটিকান সিটিসহ আরও বিভিন্ন রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক আইনে পরিচালিত হয়। সৌদি আরবে কোরআন এবং ভ্যাটিকান সিটিতে বাইবেলের বিধানই আইন।

(৩) **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত :** বর্তমান কালের বিচারালয় এবং অতীতকালে কাজীর সিদ্ধান্ত আইনের উল্লেখযোগ্য উৎস। ভারতীয় উপমহাদেশে বাদশাহী আমলে রাজা-বাদশাগণ কাজীর অনেক মতামত আইন হিসেবে কার্যকর করতেন। বর্তমান কালেও দেখা যায় বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে আইন পরিষদে আইন হিসেবে গ্রহণ করেন।

(৪) **আইন সভা :** আধুনিককালে আইন প্রণয়ন জন্য আইন সভা রয়েছে। জনকল্যাণে প্রযোজ্য সব বিষয় নিয়ে আইন সভায় আলাপ-আলোচনা হয়। উত্থাপিত বিষয়টিকে বিল বলা হয়। এ বিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়। আইন সভাই বর্তমানে আইনের প্রধান উৎস।

(৫) **আইন গ্রন্থ :** বিভিন্ন সময়ে আইন বিশেষজ্ঞগণের প্রকাশিত পুস্তক থেকে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

আইনের প্রকারভেদ

আইনের উৎস ও প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুযায়ী আইন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেন্ট টমাস একুইনাস আইনকে চারভাগে শ্রেণীকরণ করেছেন। (১) শ্বাশত আইন (২) প্রাকৃতিক আইন (৩) ঐশ্বরিক আইন ও (৪) মানবিক আইন।

বর্তমানে আইনের যেসব প্রয়োগ দেখা যায় তা মূলত মানবিক আইনেরই শ্রেণিবিভাগ। আধুনিককালে রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় নিম্নরূপ আইন রয়েছে-

আইনের শ্রেণি বিভাগের ছক

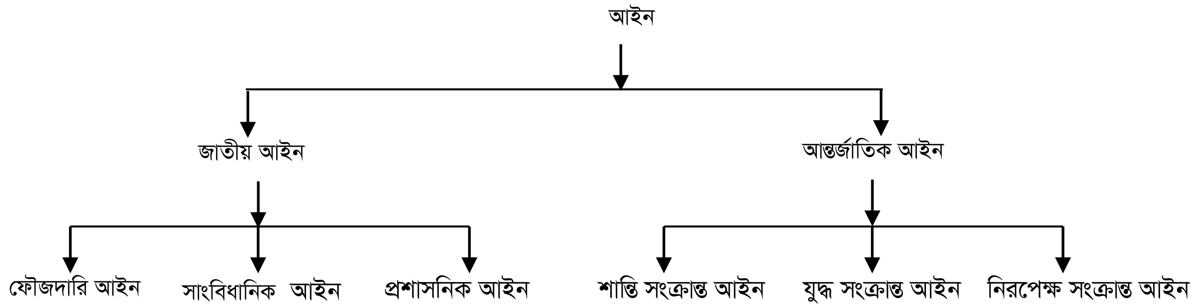

জাতীয় আইন : কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেসব আইন প্রয়োগ হয় তাই জাতীয় আইন। জাতীয় আইন সরকারি ও বেসরকারি হতে পারে। সরকারি আইন আবার তিন ধরনের। যেমন (১) ফৌজদারি আইন (২) শাসনতান্ত্রিক আইন (৩) প্রশাসনিক আইন।

আন্তর্জাতিক আইন : বিশ্বায়নের এ যুগে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ ও আন্তঃসম্পর্ক রক্ষার জন্য যেসব আইন প্রণীত হয় তাই আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক আইন শান্তি সংক্রান্ত, যুদ্ধ সংক্রান্ত এবং নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত হতে পারে। জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে অনেক আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর হয়।

পরিশেষে বলা যায় আইন আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। এসব আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, অনুমোদিত এবং কার্যকর হয়ে থাকে। আইনের সৃষ্টি যেমন অনেক সূত্র থেকে তেমনি তা প্রয়োগের ক্ষেত্রও বিবিধ। তবে উৎস এবং প্রয়োগে ভিন্নতা থাকলেও আইন রাষ্ট্রের কল্যাণেই তৈরি এবং প্রযোজ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

আইন হল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রণীত নিয়ম-কানুন। নানাবিধ উৎস যথা প্রথা, ধর্ম বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, বিখ্যাত পুস্তক থেকে আইন তৈরি হয়। তবে আধুনিককালে আইন পরিষদ হচ্ছে আইনের প্রধান উৎস। আইনের প্রয়োগেও বৈচিত্র রয়েছে। আইন ব্যক্তি পর্যায়ে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োগ হয়। রাষ্ট্রের সাফল্য অনেকটাই সঠিকভাবে আইন প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। “আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ম কানুনের প্রক্রিয়া যা সামাজিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রণীত ও বলবৎ হয়”। আইনের এ সংজ্ঞা টি কে দিয়েছে?

(ক) জে. এস মিল (খ) এইচ. কে. লাস্কি (গ) হার্বাট স্পেনসার (ঘ) জিওফ্রে রবার্টসন

২। সেন্ট টমাস একুইনাস আইনকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?

(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

পাঠ-৭.৪ সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা
Necessity of Law for Good Governance

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

এই পাঠের শেষে

- সুশাসন সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন;
- সুশাসন এর উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সুশাসন, মানবাধিকার, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের সহজাত লক্ষ্য হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। কেননা একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি মানবাধিকার নিশ্চিত হয়। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র উন্নতি ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহন করতে পারে। 'সুশাসন' (Good Governance) শব্দটি সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে প্রচলন করে বিশ্বব্যাংক । উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দাতাদেশগুলো নানা ধরণের নির্দেশনা প্রদান করে সুশাসনের ধারণা পেশ করা হয়।

বিশ্বব্যাংক এর মতে "সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের যথার্থ ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা প্রয়োগের প্রকৃতিকে বুঝায়।"

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর মতে সুশাসন হল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জাতীয় বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা।

বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত বিভিন্ন গবেষণাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত আটটি উপাদানের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

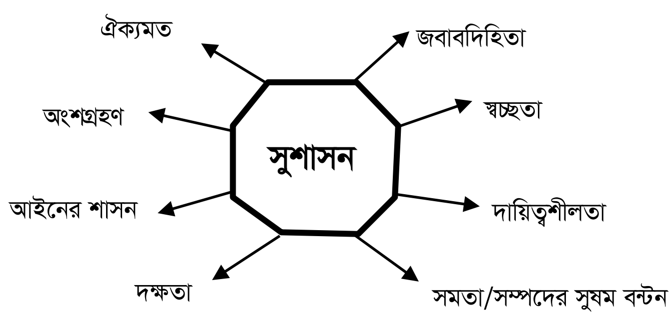

তাছাড়া বিশ্বব্যাংক ২০০০ সালে সুশাসনের চারটি স্তরের কথা বলে। যথা- (১) দায়িত্বশীলতা (২) স্বচ্ছতা (৩) আইনী কাঠামো (৪) অংশগ্রহণ।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে সুশাসন সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতেই আইনের শাসন ও আইনী কাঠামোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইনের শাসন নিম্নরূপভাবে সুশাসনের অন্যান্য উপাদান নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে-

জবাবদিহিতা : সরকারের প্রত্যেক বিভাগ ও কর্মচারিগণের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলো সাধারণ কার্যবিধি এবং অন্যান্য আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে। এসব আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে জবাবদিহিতা শিথিল হয়ে পড়ে। এর ফলে জনগণ সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত ও হয়রানির শিকার হয়। তবে বর্তমানে জনগণেরও অধিকার তৈরি হয়েছে। যেমন তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমের তথ্য জনগণ সহজেই পেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা সুযোগের সমতা : বাংলাদেশের সংবিধানসহ সকল আইনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সমতার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধানে নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ-২৯), পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-৪০), সম্পত্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ-৪২), মৌলিক অধিকার বলবৎ করার মতো বিষয়গুলো ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা রয়েছে।

অংশগ্রহণ : প্রাচীন গ্রীসে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করত। আধুনিক বৃহদায়তন ও জনবহুল রাষ্ট্রে সেটি সম্ভব নয়। আধুনিক রাষ্ট্রের পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের নানা পদ্ধতি রয়েছে। তার একটি হল নির্বাচন। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াটিই আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভোটার নির্বাচন, প্রার্থী মনোনয়ন সবক্ষেত্রেই নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ খুব জরুরি। তাই নির্বাচন প্রক্রিয়া ছাড়াও রাজনৈতিক কর্মসূচি, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সরকারি নীতি প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব। এসব প্রক্রিয়ায় যে কোন বাধা আইনী কাঠামো দ্বারা মোকাবেলা করা সম্ভব।

অর্থাৎ জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসনের বিকাশ নেই। এ বিষয়ে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিবের বক্তব্য স্বরণযোগ্য। তিনি বলেন- "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য 'সম্ভবত সুশাসনই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়।" তবে এই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী আইনী কাঠামো, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূর্বশর্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনের শাসন কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে?

সারসংক্ষেপ

সুশাসন একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে ধারণাটির অবতারণা করে। ঐক্যমত, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ, দক্ষতা, সম্পদের সুষম বণ্টন, দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক ২০০০ সালে সুশাসনের চারটি স্তরের কথা বলেছে যার মধ্যে আইনী কাঠামো উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনী কাঠামোর উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "দারিদ্র দূরীকরণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সম্ভবত সুশাসনই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান " কে বলেছেন?

(ক) জাতিসংঘ মহাসচিব (খ) বিশ্বব্যাংক প্রধান (গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ঘ) সার্ক

শিক্ষক পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরকে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে পাঠদান করছিলেন। এক পর্যায়ে বললেন, প্রত্যেকটি উন্নয়ন কাজে অনেক বরাদ্দ দেয়া হয়, কিন্তু আমরা সে অনুপাতে ভাল কাজ পাই না। কারণ এসব কার্যক্রমে প্রায়ই দুর্নীতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতার অভাব থাকে।

২। শিক্ষক মূলত উন্নয়ন কার্যক্রমে কীসের অভাবের কথা বলেছেন-

(ক) স্বচ্ছতা (খ) দক্ষতা (গ) বরাদ্দ (ঘ) সুশাসন

৩। সুশাসনের উপাদান হল-

i. স্বচ্ছতা ii. জবাবদিহিতা iii. অতিরিক্ত বরাদ্দ iv. আইনের শাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iv

পাঠ-৭.৫ বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ
Right to Information Act and its Application in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- তথ্য কমিশনের গঠন আলোচনা করতে পারবেন;
- তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তথ্য, অধিকার, সেবা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ধারা, পরামর্শ ইত্যাদি।

তথ্যের অপর নাম শক্তি। তথ্য প্রাপ্তি নাগরিকের অধিকার। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সে জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনিবার্য। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেকটা তরান্বিত হতে পারে। সরকার বর্তমানে জনগণের জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করছে। এসব তথ্য জানা থাকলে নানা ধরনের ভোগান্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। এ লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন

সরকারি সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া, সরকারি কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে। এ আইনে আটটি অধ্যায়, ১টি তফসিল ও ৩৭টি ধারা রয়েছে। এর মূল কথা হল কয়েকটি দপ্তর ব্যতীত যেকোন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

তথ্য কমিশন

এ আইন প্রণয়নের ৯০ দিনের মধ্যে একটি তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায়। কমিশন গঠন বিষয়ে আইনটির ১২ নং ধারায় বলা হয়েছে যে একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং ২ জন তথ্য কমিশনার নিয়ে এটি গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত: একজন হবেন নারী।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

এই আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ নং ধারায় প্রত্যেকটি দপ্তর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের কার্যাবলি

তথ্য কমিশনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি রয়েছে। ধারা:১৩ অনুযায়ী তথ্য কমিশন নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করে-

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তি বিষয়ে নির্দেশনা দিবে

(খ) নাগরিকের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ, বাস্তবায়ন, পদ্ধতি ও মূল্য নির্ধারণ

(গ) দেশি-বিদেশি দলিল ও আইন পর্যালোচনা করে নাগরিকের জন্য অধিকতর তথ্য সহজলভ্য করা

(ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে গবেষণা করা

(ঙ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা

সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার আইন খুব কার্যকরি। এ আইন বাস্তবায়ন হলে সরকারি ক্রয় থেকে শুরু করে সেবা বিষয়ে জনগণ তদারকি করতে পারে যা যে কোন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গোপনভাবে সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব। জনগণ ইচ্ছে করলেই নানা প্রক্রিয়ায় তথ্য পেতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকার যদি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তবে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং গণতন্ত্র সুসংহত হয়। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুনীর্তি প্রতিরোধে তথ্য অধিকার আইনের সঠিক বাস্তবায়ন এর বিকল্প নেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার সুশাসনের পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেল। এ আইনের দ্বারা নাগরিকগণ যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিত নিশ্চিত হচ্ছে। তথ্য আধিকার আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে খুব সহজেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের তফসিল কয়টি?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি

(গ) ১টি (ঘ) ৭টি

২। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের ফলে-

i. সরকারের স্বচ্ছতা বাড়ে

ii. সরকারি কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে

iii. জবাবদিহিতা বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ক্লাসে শিক্ষক বললেন আমরা সবাই একটি বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা বিস্তারে স্কুল, কলেজ স্থাপন, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হাসপাতাল নির্মাণসহ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে। যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় একদল নিয়মনীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করে। সাধারণ জনগণও নিজ নিজ আবস্থান থেকে অবদান রাখার চেষ্টা করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিষ্ঠানটিকে সমর্থন দান ও বিভিন্ন খাজনা পরিশোধ করা।

(ক) রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? ১
(খ) দ্বৈত নাগরিকত্ব কী? ২
(গ) উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য আলোচনা করুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

সেলিম, করিম, মাহবুব খুব ভালো বন্ধু। স্কুল ছুটির পর তারা একই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে। পথে তারা খেলাধুলা, রাজনীতি-অর্থনীতি পাড়া প্রতিবেশীদের নানা কথা নিয়ে গল্প করে। দুই দিন আগে তাদের পাড়ায় জমি দখলের একটি ঘটনা ঘটে। সে ঘটনায় একটি মামলাও হয়। কিন্তু প্রভাবশালী এক লোক অন্য একজনের জমি দখল করেছে। মামলা হলেও পুলিশ তাকে আটক করছে না। এ বিষয়ে মাহবুব খুব হতাশ। আইন থাকলেও আইনের কোন প্রয়োগ হচ্ছে না। সাধারণ লোকটি স্বাধীনভাবে শান্তিতে বসবাস করার অধিকারটুকুও পাচ্ছে না। এ অবস্থা দেখে পাড়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তার পক্ষ নিয়ে আন্দোলনে নেমে আসে। সাধারণ লোকটির প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে ব্যবস্থা নেবার জন্য প্রশাসনকে চাপ দিতে থাকে। এ অবস্থায় প্রশাসন ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিয়ে আইনগতভাবে সাধারণ লোকটিকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিল। করিম এর এই মন্তব্যে সেলিম বলল আসলে আইন না থাকলে মানুষের স্বাধীনতাও থাকে না। আবার কেউ একজন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হলে অনেকের মাঝেই অস্বস্তি কাজ করে।

(ক) আইন এর তিনটি উৎস লিখুন। ১
(খ) আইনের শাসন বলতে কি বুঝায়? ২
(গ) আইনের শাসন নিশ্চিত না হলে কি সমস্যা হয়? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য প্রত্যয় তিনটির সম্পর্ক আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১। গ ২। গ

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা

Different Organs of Government and Administrative System in Bangladesh

ইউনিট ৮

ভূমিকা : আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলি আইন, শাসন ও বিচার এই তিনটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আইন বিভাগ সরকারের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ সেই আইন বাস্তবায়ন করে এবং বিচার বিভাগ প্রণীত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল বিচারকার্য সম্পন্ন ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারের কাজের পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক ও কাজের সমন্বয় থাকা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের সেবা ও কার্যাবলি কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসন এই দু'ভাগে বিভক্ত। সচিবালয়কে ঘিরেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সকল কাজ পরিচালিত হয়। এই ইউনিটে মূলত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, বিভাগগুলোর গঠন কার্যাবলি তাদের সম্পর্ক কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও মাঠ প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : আইন বিভাগ

পাঠ-৮.২ : নির্বাহী বা শাসন বিভাগ

পাঠ-৮.৩ : বিচার বিভাগ

পাঠ-৮.৪ : তিন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক

পাঠ-৮.৫ : কেন্দ্রীয় প্রশাসন

পাঠ-৮.৬ : বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি

পাঠ-৮.১ আইন বিভাগ
The Legislature

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আইন বিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আইন বিভাগের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন বিভাগ, আইন প্রণয়ন, কক্ষ, সংবিধান, সংশোধন, অভিশংসন, গণপরিষদ ইত্যাদি।

সরকার যে তিনটি বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে, আইন বিভাগ তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আইন বিভাগের মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা এবং প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। সরকারের এ অঙ্গ বা বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে, সময় ও চাহিদা অনুযায়ী প্রচলিত আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনে বাতিল করে নতুন বিধান প্রবর্তন করে।

আইন সভার প্রকারভেদ

গঠন কাঠামোর দিক থেকে আইনসভা দুই প্রকারের হতে পারে।

(১) এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয়। বাংলাদেশ, চীন, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট।

(২) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত প্রভৃতি দেশের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন বিভাগের প্রণীত আইনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে। বিচার বিভাগ আইন সভাতে প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা দেয় এবং সে আইনানুযায়ী অপরাধীর বিচার করে।

আইন বিভাগ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে

(১) **আইন প্রণয়ন :** আইন প্রণয়ন করা আইনসভার মুখ্য কাজ। গণতন্ত্রে কিংবা একনায়কতন্ত্রে যেকোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে আইনসভা। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী আইনসভা নতুন আইন তৈরি করার পাশাপাশি পুরানো আইন সংশোধন, পরিবর্তন ও বাতিল করে থাকে।

(২) **সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন :** সংবিধান দেশের মৌলিক আইন। সংবিধান প্রণয়নের মত গুরুত্বপূর্ণতম কাজটি আইনসভাই করে থাকে। সংবিধান প্রণয়নের সময় আইনসভা গণপরিষদ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তী সময়ে সংবিধানের যেকোন ধারা সংশোধন, সংযোজন কিংবা প্রতিস্থাপন করা আইনসভার এখতিয়ার।

(৩) শাসন সংক্রান্ত : মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতিশাসিত উভয় ধরনের সরকার ব্যবস্থাতেই আইনসভা শাসন বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। আইনসভা সরকারের উচ্চপদাধিকারীদের নিয়োগদান করে। আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি অনুমোদন করে। সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিরা তাঁদের সরকারি কার্যাবলির জন্য একক ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।

(৪) সরকার গঠন : সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই হল প্রকৃত সরকার। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় সরকার গঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আইনসভা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা আইসভার অনুমোদন লাভ করা পর্যন্ত কাজ করতে পারে না।

(৫) অর্থ সংক্রান্ত কাজ : আইন সভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও ব্যবস্থাপক। প্রতি অর্থবছরে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় সম্বলিত বাজেট জাতীয় আইনসভায় পাস হওয়ার পর তা কার্যকর হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার কোন করারোপ ও কর সংগ্রহ করতে পারে না এবং কোন অর্থ ব্যয় মঞ্জুর করতে পারে না।

(৬) বিচার সংক্রান্ত কাজ : আইনসভা কিছু বিচার বিভাগীয় কাজও করে থাকে। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি ও আইনসভাতেই হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের নিষ্পত্তি আইনসভাতে করা হয়।

(৭) জনমত গঠন : আইনসভায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গঠনমূলক বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে কোন বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত ও জন সচেতনা তৈরি হয়।

(৮) বিবিধ কার্যাবলি : আইনসভা নির্ধারিত কাজের বাইরেও বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। নির্বাচনী যোগ্যতা নির্ধারণ, প্রশংসা বা নিন্দাজ্ঞাপন, নিজ দলের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ ও ভোটদানের অপরাধে বহিষ্কার, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে স্পিকার কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন আইনসভার বিবিধ কার্যাবলির অন্তর্ভূক্ত। বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠন রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবজ্ঞাপনও আইন সভার কাজের আওতাভুক্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনসভার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

আইন বিভাগের মূল কাজ জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও সম্মতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা এবং আইন সংশোধন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পর্ষদ মন্ত্রিসভার গঠন আইন সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, রাষ্ট্রপতির অভিসংশনের মত বিষয়ও আইন সভায় নিষ্পত্তি হয়। বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে আইন সভা জনমত গঠনের কাজ করে গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের আইনসভা কত কক্ষ বিশিষ্ট?

(ক) এক (খ) দুই

(গ) তিন (ঘ) কোনটি নয়

২। কোনটি আইন বিভাগের কাজ নয়?

(ক) সংবিধান প্রণয়ন (খ) আইন প্রণয়ন

(গ) অপরাধের দণ্ডদান (ঘ) অভিশংসন

পাঠ-৮.২ নির্বাহী বা শাসন বিভাগ
The Executive Branch

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শাসন বিভাগ কী বলতে পারবেন;
- শাসন বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শাসন বিভাগ, সরকারি নীতি, সেবা, কল্যাণ, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি।

আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলি আইন, শাসন ও বিচার এই ৩টি বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ৩টি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সরকারের এ বিভাগ রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করে, রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং দ্রব্য ও সেবা সরবরাহে দায়িত্ব পালন করে। অন্যভাবে বলা যায় শাসন বিভাগ হল সরকারের সেই বিভাগ যা রাষ্ট্রের সব আইন কার্যকর করে এবং সরকারি নীতি প্রয়োগ করে। অধ্যাপক স্যামুয়েল ফাইনার এর মতে শাসন সংক্রান্ত সব কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে শাসন বিভাগ গঠিত।

শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের চালিকা শক্তি এবং নিত্যদিনের সরকারি কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। নিচে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল।

(১) শাসন সংক্রান্ত : রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে শাসনকার্যের মাধ্যমে জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করাই শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বন্টন থেকে শুরু করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সকল নাগরিকের মৌলিক ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের কাজ করে থাকে শাসন বিভাগ।

(২) আন্তর্জাতিক সংক্রান্ত : আন্তর্জাতিক কার্যাবলি বলতে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বুঝায়। বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন এবং প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সরকারের পক্ষ থেকে শাসন বিভাগই সম্পন্ন করে থাকে।

(৩) অর্থনৈতিক কার্যাবলি : আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষে শাসন বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট প্রণয়ন করে। নাগরিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর আদায় ও ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি কার্যাবলি শাসন বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে।

(৪) প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত : রাষ্ট্রের সব ধরনের সামরিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি শাসন বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। শাসন বিভাগের প্রধান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাঁর নির্দেশেই যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপন হতে পারে।

(৫) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত : বর্তমানে সব ধরনের সরকার ব্যবস্থাতেই আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে আইন কার্যকর হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে শাসন বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা আইনের বাস্তবায়নের কাজটি করে থাকে শাসন বিভাগ। অনেক ক্ষেত্রেই একটি আইন প্রণয়নের পূর্বে খসড়া আইনটির বিভিন্ন বিষয়ে শাসন বিভাগের মতামত নেয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যর্পিত আইন প্রণয়ন (Delegated Legislation) এর কাজ আধুনিককালে শাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

(৬) বিচার সংক্রান্ত : শাসন বিভাগের সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ তার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। বিচারক নিয়োগ থেকে শুরু করে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ

অন্য অনেক বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি শাসন বিভাগের সহযোগিতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাছাড়া শাসন বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া বিচার বিভাগ প্রদত্ত রায় বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

আধুনিককালে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রই কমবেশি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনকল্যাণমূলক কাজ বেড়ে যাওয়া শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া মোকাবেলা করা কেবল শাসন বিভাগের মাধ্যমেই সম্ভব। রাষ্ট্রের কার্যপরিধি বেড়ে যাওয়ায় আয়-ব্যয়ের হিসাবও পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাজেট শাসন বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা ও সঙ্কট সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এক্ষেত্রে শাসন বিভাগকেই বেশির ভাগ সময় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে গিয়েই আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ কী? বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

শাসন বিভাগ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের সর্বাধিক সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসন বিভাগের কাজের পরিধি ও ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি সরকারের পক্ষ থেকে শাসন বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে। প্রত্যর্পিত আইন প্রণয়ন ও বিচারক নিয়োগের মত কিছু কাজও শাসন বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের বিভাগ হল-

i. আইন বিভাগ
ii. স্বরাষ্ট্র বিভাগ
iii. পররাষ্ট্র বিভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) i ও iii

২। শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ-

i. কল্যাণমূলক কাজের বৃদ্ধি
ii. জনগণের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়া
iii. উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) সবকটি

পাঠ-৮.৩ বিচার বিভাগ
The Judiciary

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিচার বিভাগ কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলির ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিচার বিভাগ, অধিকার, ব্যাখাদাতা, রায়, কার্যবিধি, তদন্ত কমিশন, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ইত্যাদি।

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মত বিচার বিভাগও আধুনিক সরকার ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হচ্ছে বিচার বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ প্রচলিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল বিচারকার্য সম্পন্ন করে তাকে বিচার বিভাগ বলে।

আলফ্রেড ডানিং এর মতে বিচার বিভাগ হল সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যা জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার রিট জারি করে।

বিচার বিভাগ রাষ্ট্র ও সরকারের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলির ব্যাপকতা পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। সাংবিধানিক কার্যাবলির পাশাপাশি আরও অনেক কাজ বিচার বিভাগকে সম্পন্ন করতে হয় যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

১। **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান :** আইন বিভাগ প্রণীত আইন ও শাসন বিভাগের কার্যক্রম সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলে। আর এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটি করে থাকে বিচার বিভাগ। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা, উপধারা এবং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রদান করা বিচার বিভাগের কাজ।

২। **আইনের ব্যাখ্যা প্রদান :** বিচার বিভাগ আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে ও আইনকে কার্যকর করে। মামলার রায় প্রদানের মাধ্যমে বিচার বিভাগ এ ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে।

৩। **আইন প্রণয়ন করা :** প্রচলিত আইনের মাধ্যমে যদি কোন জটিল মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করা না যায় সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজস্ব প্রজ্ঞা ন্যায়বোধ, বিবেক ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন সৃষ্টি করতে পারেন। এ ধরনের আইনকে বিচার বিভাগ প্রণীত আইন বলা হয়।

৪। **শাসন সংক্রান্ত :** বিচার বিভাগ বিচার সংক্রান্ত কাজের পাশাপাশি কিছু নির্বাহী কাজও সম্পাদন করে থাকে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে উচ্চ আদালত কর্তৃক অধঃস্তন আদালতগুলোর কার্যবিধিমালা প্রণয়ন। কর্মচারী নিয়োগ, নাবালকের সম্পত্তির জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ ইত্যাদি।

৫। **পরামর্শ দান :** সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ের মধ্যে কোন ধরনের জটিলতা দেখা দিলে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ পরামর্শের জন্য বিচার বিভাগকে অনুরোধ করলে সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য বিচার বিভাগ পরামর্শ প্রদান করে।

৬। **তদন্ত কার্য :** রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ের তদন্তভার অনেক ক্ষেত্রে সরকার বিচার বিভাগের ওপর অর্পণ করে। এক্ষেত্রে সরকার বিচার বিভাগের বিচারকদের নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে। জনগণের অধিকার সংশ্লিষ্ট এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এ তদন্তকার্যের আওতাভুক্ত থাকে।

৭। **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :** সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা বিচার বিভাগের মুখ্য কাজ। সকল ধরনের মামলায় সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে খালাস দেয়া বিচার বিভাগের দায়িত্ব।

৮। **নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় বিচার বিভাগ অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগ যখন তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ হুমকি ও চাপ থেকে মুক্ত থেকে কেবল সংবিধান প্রচলিত আইন, মূল্যবোধ, বিবেক, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পেশাদারিত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারলে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নিম্নোক্ত উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় :

১। বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে। যে পদ্ধতিতেই নিয়োগ দেয়া হোক না কেন নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়ায় কোন রকম পক্ষপাতমূলক আচরণ ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া যাবে না।

২। যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত। কারণ বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা কিছুটা হলেও বিচারকদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে।

৩। বিচারকরদের চাকরির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে। বিচারকগণ একবার নিয়োগ লাভ করলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থায় নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।

৪। বিচারকদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চতর বেতন ও পদোন্নতির নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।

৫। শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত রাখা ছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বিচারকদের অপসারণ কিংবা পদচ্যুতি সকল ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তবেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের উপায়গুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

প্রণীত ও প্রচলিত আইনানুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন করা এবং সকল আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করা বিচার বিভাগের মূখ্য কাজ। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে সংবিধানের সাথে অন্য কোন আইন সাংঘর্ষিক কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কাজ বিচার বিভাগের। বিচার প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিশীল থাকাও বিচার বিভাগের দায়িত্ব। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সর্বোপরি রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সরকারের গুরুদায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের যে বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা দান করে-

(ক) আপিল বিভাগ (খ) বিচার বিভাগ

(গ) নির্বাহী বিভাগ (ঘ) শাসন বিভাগ

২। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায়-

(ক) স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া (খ) জোরদার নিরাপত্তা

(গ) বেতন-ভাতা বৃদ্ধি (ঘ) কোনটি নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৮.৪ সরকারের তিন বিভাগের সম্পর্ক
Relationship among Three Organs of Government

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সরকারের তিনটি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক থাকা দরকার তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য, সমন্বয়।

একটি রাষ্ট্রে সরকারের তিনটি বিভাগ থাকার ধারণার সূচনা হয় অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায়। পরবর্তীকালে এটি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু তাঁর 'দ্য স্পিরিট অভ দ্য লজ' গ্রন্থে ১৭৪৮ সালে। তবে এ ধারণা বিকাশ লাভ করেছে সংবিধানবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আধুনিক রাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। এ কাজগুলো সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে। উদারনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানই উপস্থিত এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন থাকে। এটি নিশ্চিত করতে না পারলে রাষ্ট্রের অনেক কার্যক্রমেই জটিলতা সৃষ্টি হয়।

তিনটি বিভাগের স্বাধীন উপস্থিতির অর্থ হল প্রতিটি বিভাগ পরস্পর থেকে আলাদা থাকবে এবং তাদের নির্ধারিত ভূমিকা ও কার্যাবলি স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করবে। স্বাধীনভাবে কাজ করায় অর্থ এই নয় যে, বিভাগগুলো স্বেচ্ছাচারি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এজন্য একটি আরেকটির ওপরে নজরদারি করতে পারবে। নির্বাহী বিভাগ যেন ইচ্ছে মত চলতে না পারে তা আইনসভা ও বিচার বিভাগ দেখবে। আইনসভার সদস্যগণ যেন এমন আইন তৈরি করতে না পারেন, যা নাগরিক অধিকার সীমিত করে তা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। এ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স' বা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বাধীন করেছে এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির মাধ্যমে বিভাগগুলো যেন স্বেচ্ছাচারি হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য একটি আরেকটিকে নিয়ন্ত্রণের ম্যধ্যমে এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দুই নীতি রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় যত সহজে কার্যকর করা যায় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা তত সহজে পারা যায় না। কারণ নির্বাহী বিভাগ আইন বিভাগ বা আইনসভার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্য না থাকলে গণতন্ত্রের যাত্রা ব্যাহত হবে এবং আধুনিক উদার নৈতিক রাষ্ট্রের চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ হবে। যেকোন সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে হলে আইন, শাসন ও বিচার এই তিন বিভাগের কাজের সমন্বয় জরুরি। আবার একই রকম জরুরি হচ্ছে একে অপরের কাজের ওপর নজর রাখা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করা।

বাংলাদেশে বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনটি বিভাগ পরস্পরের সাথে ওতোপ্রতোভাবে সম্পৃক্ত। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে এবং শাসন বিভাগ সেই আইন বাস্তবায়ন করে থাকে। বিচার বিভাগ আইনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করে। সংসদীয় সরকারে নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইনসভায় আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিচার বিভাগ প্রণীত আইন বা আইনের কোন অংশ সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা তা যাচাই-বাছাই করে এবং ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে থাকে। তিনটি বিভাগের মাঝে কোনো একটি বিভাগ যদি অসহযোগিতা করে তাহলে আইনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এজন্য এই তিন বিভাগের মাঝে সমন্বয় থাকা জরুরি।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কেন প্রয়োজন?

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মোতাবেক রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক থাকবে । আবার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির কারণে তিন বিভাগের কোনটিই স্বেচ্ছাচারি হয়ে উঠতে পারবে না। এক বিভাগ অন্য বিভাগের উপরে হস্তক্ষেপ করবে না, তবে একে অন্যের কাজের ওপর নজর রাখতে পারবে। আধুনিক রাষ্ট্রর মূল লক্ষ্য জনকল্যাণ নিশ্চিত করা, তাই তিনটি বিভাগের ভূমিকা ও কার্যাবলি জনকল্যাণমুখী হবে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সমন্বয় থাকা অত্যন্ত জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মন্টেস্কু এর বইয়ের নাম কী?

(ক) ডাস ক্যাপিটাল খ) দ্য প্রিন্স
(গ) লেভিয়াথান (ঘ) দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

জনাব ফেরদৌস আলম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যম পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। তিনি রুটিন মাফিক বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভা থেকে নির্দেশিত বিষয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ভূক্তি দিয়ে থাকেন। সম্প্রতি তিনি দীর্ঘদিন বেদখলে থাকা একটি সরকারি জমি উদ্ধারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

২। জনাব ফেরদৌস যেসব ভূমিকা পালন করছেন-

i. শাসন বিভাগের
ii. আইনের খসড়া প্রস্তুত
iii. বিচারিক দায়িত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৮.৫ কেন্দ্রীয় প্রশাসন
Central Administration

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় প্রশাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে করবেন;
- সচিবলায় এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্রীয় প্রশাসন, স্তর, মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, পদসোপান, প্রশাসনিক সংগঠন, আমলাতন্ত্র।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ আধার, যা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় প্রশাসন বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম স্তর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মূল অংশ। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুটি অংশ। তা হল-রাজনৈতিক অংশ ও অরাজনৈতিক অংশ। অরাজনৈতিক অংশ আমলাতন্ত্র নামে পরিচিত। সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এর মতে "আমলা হল সরকারের স্থায়ী, বেতনভুক্ত ও প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী"। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অরাজনৈতিক অংশ প্রশাসনের রাজনৈতিক অংশকে সহযোগিতা করে। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রকৃত প্রধান। তবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হল মহামান্য রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। প্রশাসনিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তাছাড়া সরকারের সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে সম্পাদিত হয়।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

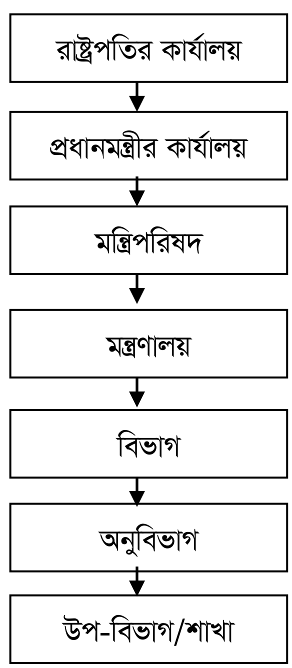

বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো

সচিবলায়: সাধারণভাবে যেকোন দপ্তরই সচিবালয় এবং আক্ষরিক অর্থে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অর্থাৎ সচিব যেখানে কর্মরত থাকে তাই সচিবালয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়াধীন বিভাগসমূহ নিয়ে যে প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে ওঠেছে তাই বাংলাদেশ সচিবালয়। সচিবদের কর্মস্থল থেকে সচিবালয় নাম হলেও সেখানে অনেক জনপ্রতিনিধি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ক্ষমতার স্নায়ুবিন্দু হিসেবে সচিবালয় সরকারের কর্মসূচি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে। সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের নীতি নির্ধারণে সাহায্য করার পাশাপাশি মন্ত্রীদের সংসদীয় সমালোচনা ও প্রশ্নের উত্তর প্রণয়ন এবং তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করে থাকেন।

মন্ত্রণালয় : মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব দয়িত্ব পালন করে থাকেন। মন্ত্রণালয় সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা। বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়গুলো নিদিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাবিষয়ক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্যবিষয়ক নীতি নির্ধারণ করে থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে এক বা একাধিক বিভাগ বা দপ্তর এবং উপবিভাগ বা শাখা থাকে। বিভাগ বা দপ্তরগুলো মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ থেকে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে। উপবিভাগ বা শাখাগুলো বিভাগের অধীন ন্যস্ত থাকে। বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত আদেশ, নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে এসব উপবিভাগ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সচিবালয় কী?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তর ব্যবস্থার প্রথম স্তর হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়। মন্ত্রণালয়ের সকল কাজ এবং প্রশাসনিক সকল সিদ্ধান্ত সচিবালয় থেকে গৃহীত হয়। মন্ত্রণালয়গুলো বিভিন্ন বিভাগ/ দপ্তর এবং উপবিভাগ/ শাখা নিয়ে গঠিত হয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন একজন মন্ত্রী। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সচিবালয় থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও স্থানীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রশাসনের অরাজনৈতিক অংশ কী নামে পরিচিত?

(ক) জনতন্ত্র (খ) কর্মীতন্ত্র

(গ) প্রশাসনতন্ত্র (ঘ) আমলাতন্ত্র

২। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অংশ-

i. রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

ii. ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

iii. মন্ত্রণালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৮.৬ বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি

Structure and Functions of Local Administration of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- স্থানীয় প্রশাসন কী তা বলতে পারবেন;
- স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- স্থানীয় প্রশাসনসমূহের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্থানীয় প্রশাসন, রাজস্ব, পদমর্যাদা, সমন্বয়, নীতিমালা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন।

বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসন। প্রথম স্তরটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন। স্থানীয় প্রশাসনের প্রথম ও সর্বোচ্চ ধাপ হচ্ছে বিভাগীয় প্রশাসন। এর দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জেলা প্রশাসন এবং তৃতীয় বা সর্বনিম্ন ধাপে রয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

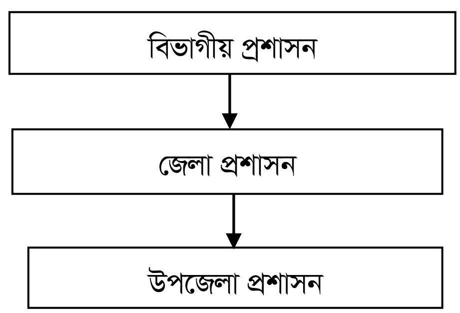

ছক ১: বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন

বিভাগীয় প্রশাসনের গঠন

বিভাগীয় প্রশাসনের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে একজন বিভাগীয় কমিশনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য কয়েক জন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ রয়েছেন। বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাঁর পদ মর্যাদা জেলা প্রশাসকের উপরে এবং রাজস্ব বোর্ডের সদস্যদের নিচে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনার যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন।

বিভাগীয় প্রশাসনের কার্যাবলি/বিভাগীয় কমিশনারের কার্যাবলি

১. বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকগণের কাজের সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।
২. তিনি নিজ বিভাগের রাজস্ব সংগ্রহ ও তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করে থাকেন।
৩. বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করেন।
৪. বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রধান হিসেবে শিক্ষামূলক কাজ, সেবামূলক কাজ এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক কাজের তদারকি করেন এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
৫. বিভাগের যাবতীয় কাজের সার্বিক পরিস্থিতি তিনি সরকারকে অবহিত করেন।

জেলা প্রশাসনের গঠন

স্থানীয় প্রশাসনের দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জেলা প্রশাসন। ডেপুটি কমিশনার (DC) বা জেলা প্রশাসক এ প্রশাসনের প্রধান। জেলা প্রশাসনিক কাঠামোতে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ADC) থাকেন। একাধিক সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও সহকারী কমিশনার এবং অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারির থাকেন। বাংলাদেশে বর্তমানে জেলা প্রশাসক উপসচির পদমর্যদা সম্পন্ন।

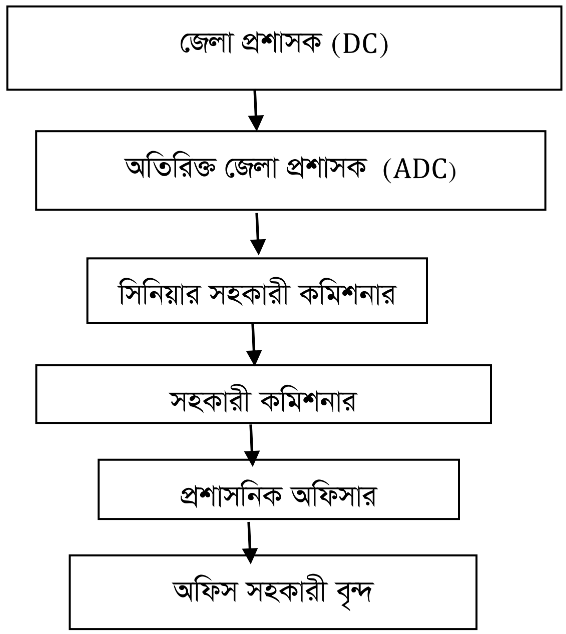

ছক-২:

বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি/জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি

১. বাংলাদেশ সচিবলায় হতে প্রেরিত সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা অধঃস্তন সহকর্মীদের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করেন।
২. জেলায় অবস্থিত সরকারের বিভিন্ন দফতরের সাথে সংযোগ রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনে এগুলোর কাজের তদারকি করেন।
৩. জেলা প্রশাসক সরকার ও জনগণের সাথে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করেন। সরকারের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ তিনি জনগণকে অবহিত করেন। একই সাথে জেলার প্রকৃত চিত্র তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন।
৪. জেলার সকল ধরনের কাজ ও কর আদায় করে থাকেন।
৫. জেলার সকল ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহ দান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নির্দেশাবলী প্রদান করে থাকেন
৬. জেলা প্রশাসক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

উপজেলা প্রশাসনের গঠন

স্থানীয় প্রশাসনের সর্বশেষ স্তর হল উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেন্দ্রীয় প্রশাসন কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।

উপজেলা প্রশাসনের কার্যাবলি

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার সিদ্ধান্ত ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।
২. উপজেলার রাজস্ব ও বাজেট তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন।
৩. অধীনস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজের তদারকি করেন।
৪. উপজেলার সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন।
৫. সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন গঠিত। স্থানীয় প্রশাসন তিনটি স্তরের প্রধান ব্যক্তি হলেন কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে প্রেরিত ও নিয়োগকৃত জনবলের অংশ। তারা সব সময় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্থানীয় প্রশাসনের অংশ-
i. উপজেলা প্রশাসন
ii. বিভাগীয় প্রশাসন
iii. জেলা প্রশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

২। কোন প্রশাসনটি স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের মত কাজ করে?
(ক) উপজেলা পরিষদ (খ) জেলা পরিষদ
(গ) ইউনিয়ন পরিষদ (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ : ১। গ ২। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ প্রতিষ্ঠানটির সঠিক পরিচালনা এবং সাধারণ সদস্যগণের অধিকার হবার উদ্দেশ্যে এর কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। তার মধ্যে একটি বিভাগের দায়িত্ব হল জনসেবার কার্যক্রম পরিচালনা। আর একটি বিভাগ কেবল নিয়মনীতি প্রণয়ন করবে, তাছাড়া তৃতীয় বিভাগটি নিয়মনীতি অনুযায়ী ন্যায় নিশ্চিত করবে। এক সময় দেখা গেল জনসেবা পরিচালনা বিভাগটি কার্যক্রম অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিগণ সভা করে বিভাগগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(ক) সরকার কী? ১
(খ) সরকারের বিভাগ কয়টি ও কি কি? ২
(গ) উদ্দীপকের ভাষ্য অনুযায়ী শাসন বিভাগের কাজ বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আলোচক সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়? ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রহিম, দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। পরবর্তীতে সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে সরকারের একটি বিভাগে চাকরি লাভ করেন। যোগদান করার পর সে লক্ষ করলেন অন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ একই পদ্ধতিতে নিয়োগ পেলেও কয়েকজন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। সেই প্রতিনিধিই দপ্তরের প্রধান। এখান থেকেই সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়। মাঠ পর্যায়েও দেখা যায় তাঁর মতো অনেকে সে নীতির আলোকে কাজ করছে। প্রথম দিকে বুঝতে অসুবিধা হলেও পরে বুঝতে পারেন যে, পুরো কাঠামোটি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত এবং বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিবর্গ এই কাঠামোতে কাজ করছে।

(ক) বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা কয় স্তর বিশিষ্ট? ১
(খ) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাঠামো উল্লেখ করুন। ২
(গ) উদ্দীপকে রহিম সরকারের কোন বিভাগে কাজ করে, সে বিভাগের গঠন কাঠামো বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপক অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের যেকোন একটি প্রশাসন ব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করুন। ৪

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন
Democracy and Election in Bangladesh

ইউনিট ৯

ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা বলে। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় উপস্থিতির উপর গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে। রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। এই গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলের সাথে যে বিষয়টি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সেটি হল নির্বাচন। অবাধ, নিরপেক্ষ ও নিয়মিত নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের সুফল কখনো সাধারণ মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছায় না। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নানা কারণে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়েছে। ১৯৯০ সালে সামরিক শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুণঃপ্রবর্তন হয়। এরপর থেকে সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও গণতন্ত্র শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। এ ইউনিটে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ও নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : গণতন্ত্র

পাঠ-৯.২ : রাজনৈতিক দল

পাঠ-৯.৩ : বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন

পাঠ-৯.৪ : নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পাঠ-৯.১ গণতন্ত্র
Democracy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গণতন্ত্র বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- গণতন্ত্রের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন;
- গণতন্ত্রের গুনাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণতন্ত্র, শাসন, আইনগত, প্রতিনিধি, অংশগ্রহণ, প্রাপ্তবয়স্ক, শাসন ব্যবস্থা, দেশপ্রেম।

আধুনিক যুগে বিশ্ববাসীর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা হল গণতন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিশ্বে অধিকাংশ দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। এ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে গণতন্ত্র সারা দুনিয়াতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসনকে বুঝায়। গণতন্ত্র বা Democracy শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Demos' এবং 'Kratia' শব্দদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Demos শব্দের অর্থ জনগণ এবং Kratia শব্দের অর্থ শাসন বা ক্ষমতা। সুতরাং শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন বা ক্ষমতা।

সাধারণভাবে গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তাঁর *Modern Democracy* গ্রন্থে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন, 'গণতন্ত্র হল এমন এক ধরনের সরকার যাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা আইনগতভাবে কোনো বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর হাতে না থেকে সমাজের নাগরিকদের হাতে থাকে'। গণতন্ত্রের একটি জনপ্রিয় সংজ্ঞায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) বলেছেন, Democracy is the government of the people, by the people, for the people. অর্থাৎ, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের সরকার, যা জনগণ দ্বারা জনগণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

গণতন্ত্র দুই প্রকার হতে পারে।

(ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র: নাগরিকগণ সরাসরি শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করে থাকে।

(খ) পরোক্ষ গণতন্ত্র: জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে ও মতামত প্রদান করে। পরোক্ষ গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা হয়।

গণতন্ত্রের গুণাবলি

নিম্নলিখিত গুণাবলির জন্য গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বব্যস্থায় সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা।

(১) **জনমতের শাসন ব্যবস্থা:** গণতন্ত্র জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে।

(২) **সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার গুরুত্ব:** সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এ তিনটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে সকলেই সমান। সমঅধিকারের নীতিটি শুধু তত্ত্বগতভাবে নয় বাস্তবেও গৃহীত হতে দেখা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সবাই নিজ নিজ অধিকার ভোগ করতে পারে।

(৩) সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা: শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কেবল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেই সম্ভব বলে গণতন্ত্র সমর্থকরা দাবি করেন।

(৪) দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিত পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে।

(৫) রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন: গণতন্ত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এর ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার ঘটে।

(৬) দেশপ্রেমের জাগরণ: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ নিজেদেরকে শাসনকার্যে সম্পৃক্ত রাখে। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের অধিকারবোধ ও দেশপ্রেম জাগরিত হয়।

(৭) তুলনামূলকভাবে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা: জনগণের সমর্থন, সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বিধায় অন্য যেকোন শাসনব্যবস্থার তুলনায় গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব বেশি।

(৮) বিপ্লবের সম্ভাবনা কম: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকায় জনগণের মাঝে অসন্তোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে পারে না। ফলে এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শতার্বলি ও সীমাবদ্ধতা

গণতন্ত্রকে যথাযথভাবে সফল ও জনকল্যাণমূলক করতে হলে কতগুলো বিষয়ের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। এগুলো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন ছাড়া গণতন্ত্রকে কার্যকর করা যায় না। গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তসমূহ নিচে আলোচনা করা হল-

(১) গণতান্ত্রিক পরিবেশ: গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশের কোন বিকল্প নেই। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই এ পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

(২) সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল: গণতন্ত্রের ভিত্তি জনমত। এ জনমত গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে রাজনৈতিক দল। তাই গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

(৩) শিক্ষা প্রসার ও সুনাগরিক: শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না। শিক্ষার প্রসারের ফলে সুনাগরিকের সৃষ্টি হয় যা গণতান্ত্রিক সফলতার জন্য অনস্বীকার্য।

(৪) সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব: সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন। তাই গণতান্ত্রিক সাফল্যের জন্য সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব অপরিহার্য।

(৫) আইনের শাসন: গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আইনের চোখে সবাই সমান এ নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৬) স্বাধীন বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রাধান্য: স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। কেবল বিচার বিভাগ স্বাধীন হলেই বিচার বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

(৭) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম পূর্বশর্ত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মাঝে সরকারের সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গণতন্ত্রের সুবিধাগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

গণতন্ত্র জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। তবে গণতন্ত্রের সফলতা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। আবার গণতন্ত্রের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। গণতন্ত্রের সফলতা রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য যেমন সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সক্রিয় উপস্থিতি প্রয়োজন, একইভাবে দক্ষ নেতৃত্ব তৈরি এবং রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশেরও প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গণতন্ত্র কত প্রকার?

(ক) এক　　(খ) দুই

(গ) তিন　　(ঘ) চার

২। গণতন্ত্রের গুণাবলি হল-

i. সর্বাধিক কল্যাণ সাধন

ii. জনমতের প্রাধান্য

iii. বিচ্ছিন্নতাবাদী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i　(খ) i ও ii　(গ) i, ii ও iii　(ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৯.২ রাজনৈতিক দল
Political Party

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাজনৈতিক দল কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক দল, সরকার, জনসমষ্টি, সাংবিধানিক, নীতি-আদর্শ কর্মসূচি, নির্বাচনী ইশতেহার, সমালোচনা।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সম্ভব। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলেরই বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল বলতে এমন একদল জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং সুসংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকরি করে সরকারি ক্ষমতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে।

অধ্যাপক আর এম ম্যাকাইভার (R.M. MacIver) তাঁর *The Modern State* গ্রন্থে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলেন, "যারা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে তৎপর হয়, তাদেরকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ এডমন্ড বার্ক রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "রাজনৈতিক দল হল নির্দিষ্ট ও স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে এবং সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য একত্রিত এক জনসমষ্টি।"

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

১. রাজনৈতিক দল একটি সুসংগঠিত জনসমষ্টি।
২. রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট নীতিমালা ও মতাদর্শের অধিকারী।
৩. রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা।
৪. নেতৃত্ব তৃণমূল পর্যায় হতে কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।
৫. রাজনৈতিক দল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং দলের সমর্থনে জনমত গঠনে চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও কার্যাবলি

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল নিম্নোক্ত ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে:

১. **নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন:** দেশের প্রধান সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে দলীয় ভিত্তিতে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা এবং কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করা রাজনৈতিক দলের মুখ্য কাজ। সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলই নিজ নিজ কর্মসূচির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করতে তৎপর থাকে।

২. **জনমত গঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি :** গণতন্ত্র জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের

নেতৃবৃন্দ দলের কর্মসূচি ও দেশের সার্বিক অবস্থা জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এর ফলে কোনো বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে সুষ্ঠু জনমত গঠিত হয় এবং জনসাধারণের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতাও তৈরি হয়।

৩. **সংযোগ স্থাপনকারী:** রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগনের মাঝে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের কার্যনীতি জনগনের কাছে পৌঁছে দেয় এবং জনগনের আশা-প্রত্যাশা সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়।

৪. **সরকার গঠন :** রাজনৈতিক দল জনগনের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন, সরকার গঠন ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পদ্ধতি অবশ্যই শান্তিপূর্ণ এবং সাংবিধানিক হতে হবে ।

৫. **সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ :** দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের বাইরের রাজনৈতিক দল বা দলসমূহ সরকারকে জনকল্যাণ বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

৬. **বিকল্প সরকার ও ছায়া মন্ত্রিসভা :** সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল বিকল্প সরকার গঠন করে এবং ছায়া মন্ত্রিসভা হিসেবে কাজ করে। কার্যকর বিরোধী দল গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যেমন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দল হল রাজা বা রাণীর 'বিকল্প সরকার'।

৭. **নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যম :** যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে রাজনৈতিক দলের কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দল তাদের বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্র সুসংহতকরণে এটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করা। জনগণের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করা এবং কোন বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের কাজ। জনগণের প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে এবং শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল বিকল্প সরকার ও ছায়া মন্ত্রিসভা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল তাদের কার্যাবলির মাধ্যমে সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাজনৈতিক দল-

i. সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি

ii. নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শবিশিষ্ট

iii. ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

২। রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

(ক) স্বৈরতন্ত্র (খ) সামরিক শাসন

(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) গণতন্ত্র

পাঠ-৯.৩ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন
Democracy and Election in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংসদীয় গণতন্ত্র, জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন, সর্বজনীন ভোটাধিকার।

গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ গণতন্ত্র হচ্ছে জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত যাচাই করার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় হচ্ছে নির্বাচন। একটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সফলতা ও ব্যর্থতার উপর গণতন্ত্রের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপক্ষে নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়। মূল সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতির একটি হল গণতন্ত্র, যা সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নিচে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনগুলোর একটি চিত্র তুলে ধরা হল:

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচন	সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আসন	দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রাপ্ত আসন ও দল
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩	আওয়ামী লীগ (২৯৩)	স্বতন্ত্র (০৫)
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (২০৭)	আওয়ামী লীগ-(মালেক) (৩৯)
তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬	জাতীয় পার্টি (১৫৩)	আওয়ামী লীগ (৭৬)
চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮	জাতীয় পার্টি (২৫১)	সম্মিলিত বিরোধী দল (১৯)
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (১৪০)	আওয়ামী লীগ (৮৮)
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (২৭৮)	স্বতন্ত্র (১০), ফ্রিডম পার্টি (০১)
সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬	আওয়ামী লীগ (১৪৬)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (১১৬)
অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (১৯৩)	আওয়ামী লীগ (৬২)
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮	আওয়ামী লীগ জোট (২৩০)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (৩০)
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪	আওয়ামী লীগ জোট (২৩৪)	জাতীয় পার্টি (৩৪)
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮	আওয়ামী লীগ জোট (২৬৬)	জাতীয় পার্টি (২২)
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৪	আওয়ামী লীগ (২২৪)	স্বতন্ত্র (৬২), জাতীয় পার্টি (১১)

গণতন্ত্র ও নির্বাচন

নিয়মিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। ১৯৭৩ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। বার বার সামরিক শাসনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। তীব্র গণঅভ্যুত্থানের মুখে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অবসান হয়। ১৯৯১ সালে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনের নতুন অভিযাত্রা শুরু হয়। তবে দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক

দলগুলোর সম্মিলিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের নির্বাচনে মৌলিক পরিবর্তন আনে। ফলে ১৯৯৬ সালের সপ্তম সাধারণ নির্বাচন, ২০০১ সালের অষ্টম সাধারণ নির্বাচন এবং ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হিসেবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয় এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত দলীয় সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন, এবং ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়েও বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। ভুয়া ভোটার তৈরি, বিরোধী দলসমূহের বর্জন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া, সরকারি দলের আধিপত্য, পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব, নির্বাচনের আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভরে রাখাসহ অসংখ্য অভিযোগ এসব নির্বাচনকে বিতর্কিত করেছে। বিভিন্ন সময় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং নির্বাচন শেষে প্রতিপক্ষ এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণি-গোষ্ঠীর উপর সন্ত্রাসী হামলাও দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কালিমা লেপন করেছে। সমাজে ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এখন অবধি অবিকশিত থাকার কারণেই এ ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ইতিহাস আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের ভোটদানের সমানাধিকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি কারণে বাংলাদেশ এখন অবধি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়মিত অনুশীলন হয়ে ওঠেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনমত যাচাইয়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল-

(ক) লটারি (খ) বল প্রয়োগ

(গ) নির্বাচন (ঘ) কোনটি নয়

২। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত সরকার গঠন করেছে-

i. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ii. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

iii. মুসলিম লীগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ-৯.৪ নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Structure, Power and Functions of Election Commission

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচন কমিশনার, সংবিধান, বিধান, শর্ত, কমিশন সচিবালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও আইননুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন আছে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় পর্যায়ের অনান্য নির্বাচন পরিচালনা কওে থাকে।

নির্বাচন কমিশনের গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ অনুসারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদেরকে নিয়োগ দান করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে "নির্বাচন কমিশন আইন ২০২২" প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে। সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কাজের শর্তাবলি মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করেন।

নির্বাচন কমিশনের মেয়াদকাল

নির্বাচন কমিশন ৫ বছরের জন্য গঠিত হয়। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র পেশ করে পদত্যাগ করতে পারবেন। আবার গুরুতর অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে একজন কমিশনার তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। তবে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে না।

কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নির্বাচন কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে। একজন সচিব ও অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গঠিত হয়। তাছাড়া সমগ্র দেশের জেলা এবং উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব দপ্তর ও জনবল রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনানুযায়ী নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে।

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি) পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। এটি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

২. জাতীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন করা নির্বাচন কমিশনের গুরু দায়িত্ব। বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের আইনানুযায়ী ১৮ বছর কিংবা তদুর্ধ বয়সী নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রত্যেক সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে

হয়। অর্থাৎ সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা প্রদান করা নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা।

৪. বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপ্রত্র গ্রহণ ও যাচাই বাছাই সংক্রান্ত কাজ করা।

৫. নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ও সরকারি গেজেট আকারে তা প্রকাশ করা ।

৬. রাজনৈতিক দল নিবন্ধন ও গেজেট প্রকাশ করা। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচনী ইস্যুতে সংলাপ করাও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

৭. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

মোটের উপর সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ক্ষমতা হস্তান্তরে নির্বাচন কমিশন যেকোন আইনানুগ ও যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দাপ্তরিক কাঠামো বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। দেশের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় কার্যাবলি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনানুযায়ী সম্পন্ন হয়। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সময়ানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্থার নাম কী?

(ক) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (খ) নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ

(গ) নির্বাচন কর্তৃপক্ষ (ঘ) নির্বাচন কমিশন

২। নির্বাচন কমিশনের কাজ

i. নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ

ii. ভোটার তালিকা প্রণয়ন

iii. স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

'ক' রাষ্ট্রটিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকায় ঘন ঘন সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে। কালক্রমে জনগণ সচেতন হয় এবং রাষ্ট্র গঠনও মোটামুটি এগিয়ে যায়। গত ২০ বছরে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে দেশটির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনো ভঙ্গুর বলেই অনেকে মনে করেন। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত অনেক নির্বাচন নিয়েই বিতর্ক ও সমালোচনা লক্ষ করা যায়।

(ক) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কী? ১
(খ) গণতন্ত্র কাকে বলে? ২
(গ) রাজনৈতিক দল কীভাবে দেশের গণতন্ত্র বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে? আলোচনা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত রাষ্ট্রটির গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

সম্প্রতি রাজনগর রাজ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে জনগণ ব্যাপক বিক্ষোভ করে। ফলে সেখানে একটি নির্বাচনকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠান ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণসহ যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে। নির্দিষ্ট সময় পর সংস্থাটি জাতীয়ভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের আয়োজন করে। সে জন্য সংস্থাটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে। সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সংস্থাটি একটি আদর্শ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়। ফলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে।

(ক) ভোট কী? ১
(খ) জাতীয় সংসদের গঠন কেমন? ২
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দল ও নাগরিকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১। খ ২। ঘ

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ
United Nations and Bangladesh

ইউনিট ১০

ভূমিকা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে জন্ম হয় জাতিসংঘের। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারা বা না পারা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও, জাতিসংঘের বিকল্প ব্যবস্থা এখনও পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু। জাতিসংঘ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুণর্গঠনে সহযোগিতা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও তেমনি জাতিসংঘের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষ করে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ ইউনিটে মূলত জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি, বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা, জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি
পাঠ-১০.২ : বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ
পাঠ-১০.৩ : নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

পাঠ-১০.১ জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি
Bacground of the Foundation of United Nations

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করতে পারবেন;
- জাতিসংঘের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জাতিসংঘ, বিশ্বশান্তি, বিশ্বযুদ্ধ, জাতিপুঞ্জ, জাতিসংঘ সনদ, সচিবালয়, মহাসচিব, স্থায়ী, অস্থায়ী অধিবেশন, ভেটো।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ও কাঠামো

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একক বিশ্বসংস্থা হল জাতিসংঘ (United Nations)। জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে কিন্তু এর বিকল্প এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা তেমনি এর জন্মও পূর্বতন রূপের শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা থেকে, যা জাতিপুঞ্জ (League of Nations) নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং এর ধ্বংসযজ্ঞ জাতিপুঞ্জের কবর রচনা করে। তার পরিবর্তে শান্তিকামী ও কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্যোগে প্রথমে এগিয়ে আসেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট যিনি জাতিসংঘ (United Nations) নামটি রাখেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল এবং রুজভেল্টের সহযোগী হ্যারি হপকিনস ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে একটি খসড়া তৈরি করেন। পরবর্তীতে মিত্রশক্তি গঠিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনও এতে যোগ দেয়। ১৯৪২ সালের ১-২ জানুয়ারি ২৬টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ ঘোষণায় সাক্ষর করে।

প্রতিষ্ঠা

জাতিসংঘ ঘোষণায় স্বাক্ষরের পর আমেরিকার ডাম্বরটন ওকস সম্মেলনে মিত্রশক্তির বড় চার সদস্যদের মধ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিলে সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই জাতিসংঘ সনদের খসড়া প্রণীত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবরে বিশ্বের ৫০টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ (UN Charter) স্বাক্ষর করে। এর মধ্য দিয়েই বর্তমান জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই ২৪ অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস বলা হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে জাতিসংঘ পাঁচটি অঙ্গ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যথা- (১) সাধারণ পরিষদ (The General Assembly) (২) নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council) (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council) (৪) সচিবালয় (The Secretariat) ও (৫) আন্তর্জাতিক আদালত (The International Court of Justice)। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত অছি পরিষদ নামে জাতিসংঘের আরও একটি অঙ্গ সংস্থা ছিল।

সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ সংস্থা। জাতিসংঘের সব সদস্য এ পরিষদের সদস্য। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি। বাৎসরিকভাবে এ পরিষদের অধিবেশন বসে যা সাধারণ অধিবেশন নামে পরিচিত। তবে জরুরি প্রয়োজনেও সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী কাঠামো। অন্য পরিষদ কেবল কোন বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত নিরাপত্তা পরিষদের। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজার রাখার দায়িত্বটি মূলত এ পরিষদই তদারকি করে থাকে। এ পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই ধরনের সদস্য রয়েছে। স্থায়ী সদস্য হল ৫টি। যথা, (১) যুক্তরাষ্ট্র,

(২) রাশিয়া, (৩) যুক্তরাজ্য, (৪) ফ্রান্স ও (৫) চীন। তাছাড়াও ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। এসব সদস্য দুই বছরের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত হয়। স্থায়ী সদস্যদের ভেটো (Veto) নামে বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

সচিবালয়

জাতিসংঘ সচিবালয় নিউইয়র্কে অবস্থিত। সচিবালয়ের প্রধান হচ্ছেন মহাসচিব (UN General Secretary)। তিনি জাতিসংঘের মুখপাত্র। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী মহাসচিব হলেন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নিযুক্ত করে থাকে। জাতিসংঘ মহাসচিবের মেয়াদ পাঁচ বছর। তিনি সর্বোচ্চ দু'বারের জন্য মনোনীত হতে পারেন। পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আন্তোনিও গুটারেস ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এ বিশ্বসংস্থাটির নবম মহাসচিব।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত দাঙ্গা এ বিষয়গুলো এ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। এ আদালতে মোট ১৫ জন বিচারক রয়েছেন। তাঁরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

এ পরিষদ মূলত জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ছোট ও মধ্যম সারির রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৫৪। রাষ্ট্রগুলো সাধারণ পরিষদ দ্বারা ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘ এ যাবৎকালে সৃষ্ট সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ কার্যকরি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিশৃঙ্খলতার পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে জাতিসংঘ প্রথাগত নিরাপত্তার পাশাপাশি অপ্রথাগত নিরাপত্তার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়াও বিশ্ববাসীর জীবনমান উন্নয়নে জাতিসংঘ অপরিসীম ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব প্রতিষ্ঠান হল জাতিসংঘ। ১৯৪৫ সালে ৫০টি দেশ 'জাতিসংঘ সনদ' স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়। এক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও উইন্সটন চার্চিল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে ১৯৩টি দেশ এ বিশ্বসংস্থার সদস্য। সংস্থাটি পাঁচটি কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যথা, সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয় ও আন্তর্জাতিক আদালত। জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন মহাসচিব। তাঁর মেয়াদ ৫ বছর। পাঁচটি পরিষদ থাকলেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদই বিশ্বশান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতিসংঘ বর্তমানে কয়টি অঙ্গ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

২। জাতিসংঘ সনদ কত সালে সাক্ষরিত হয়?

(ক) ১৯৪২ (খ) ১৯৪৩ (গ) ১৯৪৪ (ঘ) ১৯৪৫

পাঠ-১০.২ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ
Bangladesh and United Nations

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জাতিসংঘ, বাংলাদেশ, সদস্যপদ, মুক্তিযুদ্ধ, শান্তিরক্ষী বাহিনী, গণতন্ত্র ও সুশাসন।

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের অকৃত্রিম সম্পর্ক সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। সাধারণত নব্য স্বাধীন দেশ দ্রুত জাতিসংঘের সদস্য হয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ইঙ্গিতে চীন সদস্য হওয়ার পথে ভেটো দিয়েছিল। অবশেষে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর এক সপ্তাহ পর, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা করেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা

জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘে নানামুখী ভূমিকা রেখে চলেছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়। ১৯৭৬ ও ১৯৮১ সালে দুই মেয়াদে চার বছরের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তাছাড়াও ১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে ৪১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী। বাংলাদেশ দুইবার অর্থাৎ ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ২০০০-২০০১ মেয়াদে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। এ সময়ে আরব-ইসরাইল মতবিরোধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, এঙ্গোলা, কসোভো, গণতান্ত্রিক কঙ্গো ও সিয়েরলিওনের সঙ্কট নিরসনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে ভূমিকা পালন করে।

জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য হল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতিসংঘে সর্বোচ্চ শান্তি সেনা প্রেরণকারী দেশ। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ইরাক ও নামিবিয়া শান্তি মিশনে যোগ দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অংশ নেয়া শুরু করে। তারপর থেকে ২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্রায় ৫৪টির মতো শান্তি মিশনে ২৫টি দেশে দায়িত্ব পালন করে। এ সময়ে বাংলাদেশের সেনার শান্তি প্রতিষ্ঠায় জীবন দিয়েছেন। সিয়েরালিওন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে ২০০২ সালে বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশন (UNHCR), নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন (CEDAW), উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (FAO) ইত্যাদি সংস্থায় বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সমর্থন ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা আরম্ভ হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘ বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং শরণার্থীদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে মানব ইতিহাসে অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদল জাতিসংঘে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জাতিসংঘের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতিসংঘ ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে লক্ষ-লক্ষ শরণার্থীদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান শরণার্থী কার্যক্রম (UNEPRO) ঘোষণা করে। এ সময়ে সূচিত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি

(WFO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) কার্যক্রম অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে UNDP ১৯৭২ সাল থেকেই তাদের পুনর্গঠনমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। এক্ষেত্রে সংস্থাটি আর্থিক, সামাজিক, কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। ২০০৫ সালে গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) বাস্তবায়নে ২০০৬-২০১০ সালে UNDP বিপুল অঙ্কের সহায়তা দিয়েছে। গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণও প্রদান করে সংস্থাটি। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নে UNDP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। টিকাদান কর্মসূচি, প্রজনন স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবেলা ইউনিসেফ (UNICEF), পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) বড় ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বাংলাদেশে শ্রম শক্তির উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৩৫টি কনভেনশনে অনুসমর্থন করেছে। এর ফলে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে।

জাতিসংঘের এসব সংস্থাগুলো সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ-লক্ষ শরণার্থীদের সহযোগিতা করা থেকে শুরু করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়াসহ যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্র গঠনে নীতিগত, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে জাতিসংঘ। বর্তমানে জাতিসংঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য

(ক) ১৩৬ (খ) ১৩৭ (গ) ১৩৮ (ঘ) ১৩৯

২। বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্য হয়:

(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৩ (গ) ১৯৭৪ (ঘ) ১৯৭৫

৩। জাতিসংঘ বাংলাদেশে কাজ করে-

i. শিশু উন্নয়নে

ii. নারী অধিকার রক্ষায়

iii. স্বাক্ষ্য রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৩ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

Role of United Nations in the Elemination of all forms Discrimination Against Women

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- CEDAW কী বলতে পারবেন;
- CEDAW এর নীতি ও উদ্দেশ্য আলোচনা করতে পারবেন;
- নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে CEDAW এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এ বিষয়ে জাতিসংঘের অন্যান্য ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সিডো, নারী বৈষম্য, প্রতিরোধ, সমতা, অধিকার, সনদ, প্রবেশাধিকার, অনুসমর্থনকারি, ধারা, শরীয়া, পন্থা।

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সভ্যতায় নারীর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে পৃথিবীর সব দেশেই নারীরা কম বেশি বৈষম্যের শিকার। শুধু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে নয়, উন্নত বিশ্বের নারীরাও বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার। এ প্রেক্ষিতেই জাতিসংঘ নারীদের অধিকার রক্ষায়, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য প্রতিরোধ কনভেনশন বা Convention on the Elemination of all forms of Discrimination Against Women- CEDAW (সিডো) গ্রহণ করে। এ কনভেনশন গৃহ নির্যাতন, প্রজনন, আইনগত, রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রের নারীদের সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে।

সিডো'র (CEDAW) নীতি/উদ্দেশ্য

আইনী কাঠামোতে পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি অন্তর্ভুক্ত করা এবং বৈষম্যমূলক সব আইন বাতিল করে বৈষম্য নিরোধ করে এমন আইন গ্রহণ করা।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

যেকোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠকের দ্বারা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করা।

সিডোর (CEDAW) উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা

সিডোতে মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। ধারাগুলোতে অনেক উপধারায় নারীদের বিভিন্ন বৈষম্য, বৈষম্যরোধ ও অধিকার আদায়ের নির্দেশনা যুক্ত। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গ্রামীণ, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান ও করণীয় শীর্ষক ধারা যুক্ত হয়েছে সিডো'তে। মূলত ১-১৬ পর্যন্ত ধারায় এসব বর্ণিত আছে। তাছাড়া ১৭-৩০ ধারা পর্যন্ত CEDAW পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত। নিচে CEDAW এর কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হল।

ধারা-৪ (১) সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীদের ইতিবাচক পদক্ষেপ।

ধারা-৭ (১-৬) নির্বাচিত, উচ্চ উপদেষ্টা সংস্থা, বিচারিক, রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়নে নারীদের ভূমিকা।

ধারা-১০ : প্রাক বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নারীদের সামগ্রিক স্বাক্ষরতা নিশ্চিত করা।

ধারা-১১ : নারীদের জন্য সামাজিক এবং কর্মপরিবেশ তৈরি। তাদেরকে কর্মগুণে ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতিবাচক কর্মপন্থা নির্ধারণ।

ধারা-১৩ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

CEDAW ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সিডো অনুসমর্থনকারী একটি দেশ। ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সিডো অনুসমর্থন করে। শুরুতে ধর্মীয় অনুভুতির যুক্তিতে বাংলাদেশ সিডো সনদের চারটি ধারা সমর্থন করেনি। পরবর্তীতে দুটি ধারার ওপর বাংলাদেশ সরকার আপত্তি প্রত্যাহার করে। তবে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সিডো'র ২ এবং ১৬.১(গ) ধারা থেকে আপত্তি তুলে নেয়নি। এই দুই ধারা দুটিতে প্রথমটিতে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য অবসানে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৬.১(গ) ধারাতে বিয়ে ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘের অন্যান্য পদক্ষেপ

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ পদক্ষেপে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মানব উন্নয়নে জাতিসংঘের অন্যান্য অনেক পদক্ষেপ রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ নারী ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে এটি জাতিসংঘের উন্নয়ন গ্রুপের অন্যতম সদস্য। এ ইউনিটের মাধ্যমে জাতিসংঘের বিভিন্ন নারী উন্নয়নমূলক উদ্যোগকে এক ছাতার নিচে আনা হয়। এ বিষয়ে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন বলেন, 'জাতিসংঘ নারী ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হবে লিঙ্গ সমতা, সুযোগের সম্প্রসারণ এবং বিশ্বব্যাপী নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রতিহত করা। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের সংবিধানকে নারীবান্ধব করার জন্য জাতিসংঘ ২০১৩ সালের শেষের দিকে একটি তথ্য ভাণ্ডার চালু করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (MDG) উল্লেখযোগ্য উন্নতির পর টেকসহ উন্নয়ন মাত্রায় (SDG) শিক্ষা সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিডো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যাপী নারী বৈষম্যের শিকার। নারীদের এমন অবস্থা বিবেচনা করে জাতিসংঘ ১৯৭৯ সালে CEDAW প্রণয়ন করে। এ সনদে নারীদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্য ও তা দূরীকরণে বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ CEDAW এর সদস্য। ২টি ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারাগুলোকে দেশটি অনুসমর্থন করেছে। জাতিসংঘ সিডো ছাড়াও নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের চেষ্টা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সিডো (CEDAW) অনুসমর্থন করে কত সালে?

(ক) ১৯৭৬ (খ) ১৯৭৮ (গ) ১৯৮৪ (ঘ) ১৯৯৮

২। সিডো'র উদ্দেশ্য হল-

i. নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান

ii. বৈষম্যমূলক আইন টিকিয়ে রাখা

iii. বৈষম্যের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ : ১। গ ২। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রসুলপুর ইউনিয়নের পাঁচটি গ্রামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকে। চেয়ারম্যান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তা প্রতিরোধ করতে পারছে না। এ অবস্থায় প্রত্যেক গ্রাম থেকে পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি সমিতি তৈরি করা হল। এই সমিতির কাজ হবে গ্রামগুলোর অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তাছাড়া গ্রামগুলোর উন্নয়নে শিক্ষা সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি বিভিন্ন সহযোগিতা করে থাকে।

(ক) জাতিসংঘ কী? ১
(খ) জাতিসংঘের সাংগঠণিক কাঠামো উল্লেখ করুন? ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপ অনুযায়ী জাতিসংঘের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

‘ক’ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী-দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এবং নারী-পুরুষের বৈষম্যও উল্লেখ করার মতো। ফলে নারীরা বিভিন্ন সময় নির্যাতনের শিকার হয়। এরকম অন্যান্য রাষ্ট্রের অবস্থা বিবেচনায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে একটি ঐক্যমতে পৌঁছে। তাঁদের লিখিত মতামত সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আনতে বাধ্য করে। ফলে সকল ধরণের রাষ্ট্রেই নারীদের সুযোগ নিশ্চিত হচ্ছে।

(ক) বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? ১
(খ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের নাম লিখুন। ২
(গ) উদ্দীপক অনুযায়ী কেমন ধরণের রাষ্ট্রে এবং কেন নারী নির্যাতন বেশি হয়। ৩
(ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধে কি কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়? ৪

জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
National Resources and Economic System

ইউনিট ১১

ভূমিকা : প্রত্যেক সমাজ এবং দেশের কিছু না কিছু জাতীয় সম্পদ রয়েছে। এ জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত দেশের জাতীয় আয় সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুযায়ী এ জাতীয় আয় দেশের সকল জনগণের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জিত হয়। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র এবং ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ বণ্টন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয়। ধনতান্ত্রিক (পুঁজিবাদী) অর্থনীতিতে বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, সমাজতান্ত্রিক বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারের দর্শন বা নীতি অনুযায়ী, মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের চাহিদা যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সরকারের আংশিক হস্তক্ষেপ স্বীকৃত। আবার, ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ, হালাল ও হারামের পার্থক্যকরণ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ : জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ের বণ্টন
পাঠ-১১.২ : জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ
পাঠ-১১.৩ : বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন
পাঠ-১১.৪ : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পাঠ-১১.১ জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ের বন্টন

National Resources and Distribution of National Income

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতীয় সম্পদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- জাতীয় আয়ের উৎপত্তির ভিত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জাতীয় আয়ের বন্টন কাদের মাঝে কীভাবে হবে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনৈতিক দ্রব্য, জাতীয় সম্পদ, জাতীয় আয়, খাজনা, মজুরি, সুদ মুনাফা।

অর্থনীতিতে 'সম্পদ' ধারণাটি শুধুমাত্র ধন-সম্পত্তি বা টাকা পয়সাকে বোঝায় না। শুধুমাত্র 'অর্থনৈতিক দ্রব্য'কে[*১] সম্পদ বলে। অর্থাৎ যে সব বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের উপযোগ[*২] আছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান সীমাবদ্ধ[*৩] এবং উক্ত দ্রব্য হস্তান্তরযোগ্য[*৪] ও বাহ্যিকতা[*৫] বিদ্যমান, সেগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সম্পদ বলে। এছাড়া সম্পদের বিনিময় মূল্যও বিদ্যমান।

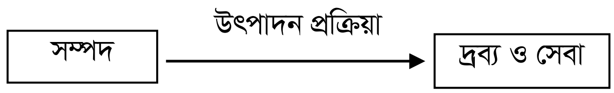

জাতীয় সম্পদ (National Wealth)

জাতীয় সম্পদের ধারণাটি ব্যাপক। এক্ষেত্রে প্রথমেই দেশপ্রেম, দেশের জনগণের কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ এসব গুণাবলির সমন্বিত জাতিগত গুণাবলিকে নির্দেশ করে। এরূপ জাতি কখনো দরিদ্র থাকলেও পরবর্তীতে উন্নত জাতিতে পরিণত হতে পারে। বিশ্বসভায় অন্যান্য দেশও এরূপ জাতিকে অত্যন্ত সম্মান করে, ভালোবাসে। জাতিগত গুণাবলির সাথে উন্নত 'মানব সম্পদ'ও (Human Resources) এক প্রকার জাতীয় সম্পদ। মানব সম্পদ বলতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সুপ্রশিক্ষিত কর্মঠ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানব সম্পদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

যেকোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনÑ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, খনিজতেল, শক্তিসম্পদ, পানি সম্পদ, বনজ ও মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিও জাতীয় সম্পদ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শক্তিশালী জননিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীও জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। এসকল বাহিনীর রুটিন কার্যক্রমের ফলে উৎপাদক, ভোক্তা এবং ব্যবসায়ী অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রাণবন্ত বা সজীব থাকে।

অতএব, দেশের সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের সর্বমোট পরিমাণকে জাতীয় সম্পদ বলে। এ সম্পদ হিসেবের সময় সরকারি ঋণ ও বিদেশের নিকট দেনা বাদ দিতে হয় ও বিদেশের নিকট পাওনা হিসাবের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেমনÑ রাষ্ট্রীয় ঋণ, রাষ্ট্রীয় পাওনা, জনগণের সুনাম, নৈপুণ্য, দক্ষতা, স্বদেশ বা বিদেশের মালিকানাধীন সম্পদ।

---

*১. **অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods)** : স্বল্প সম্পদ হতে যে স্বল্প দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় এবং চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের যোগান স্বল্প তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে।

*২. **উপযোগ (Utility)**: দ্রব্যের একটা বিশেষ গুণ যা ভোক্তার কোনো বিশেষ অভাব পূরণ করতে পারে।

*৩. **অপ্রাচুর্য/সীমাবদ্ধ যোগান (Scarcity)** : যে সব দ্রব-সামগ্রী বা সেবার যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প বা নগন্য।

*৪. **হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability)** : বই, কলম, জমির মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য, তাই এগুলো সম্পদ। কিন্তু লেখক, শিল্পী, অধ্যাপকের প্রতিভা হস্তান্তরযোগ্য নয়।

*৫. **বাহ্যিকতা (Externality)** : মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণের অন্তর্ভুক্ত নয়, বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে, এরূপ দ্রব্য সম্পদ। যেমন বাড়ি, গাড়ি সম্পদ। প্রতিভা, চরিত্র, স্নেহ-মমতা সম্পদ নয়।

জাতীয় আয় (National Income)

অর্থনীতিতে 'জাতীয় আয়' ধারণাটি একটি বৃহৎ বা প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ বা অঞ্চলে সকল ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সম্মিলিত উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে। ইহা রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী (Employees), মালিক উদ্যোক্তা (Proprietors), প্রতিষ্ঠান (Corporate) এর আয়, ভাড়া, খাজনা ও সুদ এবং সরকারি আয়ের সমষ্টি হতে সরকারি ভর্তুকি বাবৎ প্রদেয় অর্থ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট আয়কে বোঝায়।

অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে। অর্থনীতিতে n পর্যন্ত খাত বিদ্যমান থাকলে, চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা যদি $X_1, X_2, X_3 \ldots X_n$ হয় এবং এদের বাজার দাম যদি যথাক্রমে $P_1, P_2, P_3 \ldots P_n$ হয়। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় $(NI) = Y = X_1P_1 + X_2P_2 + \ldots + X_nP_n$

সুনির্দিষ্টভাবে, জাতীয় আয় বলতে দেশীয় নাগরিক কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং দেশের বাইরে থেকে প্রবাসীদের আয় হতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বাদ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে জাতীয় আয় বলে।

জাতীয় আয়ের বণ্টন

জাতীয় আয় হল উৎপাদনের উপকরণসমূহের যৌথ প্রচেষ্টার ফল। যে নীতির মাধ্যমে জাতীয় আয় সৃষ্টিকারী উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) মালিকদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা বণ্টন করে দেয়া হয়, তাকে জাতীয় আয়ের বণ্টন বলা হয়। নিম্নে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে ধারণাটি স্পষ্ট করা হল :

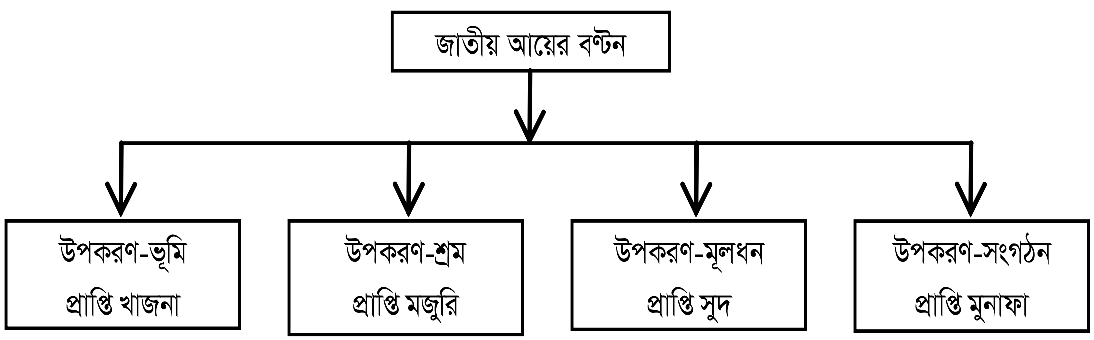

খাজনা

খাজনা বলতে আমরা বুঝি- কোনো নির্দিষ্ট জমি, বাড়ি বা উৎপাদনে ব্যবহৃত যে কোনো উপকরণ (যার যোগান সীমিত) ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী তার মালিককে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, তাই খাজনা।

খাজনার বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞার আলোকে খাজনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল :

১. খাজনা হল উৎপাদকের উদ্বৃত্তের অংশ।

২. যে কোনো উপকরণের সীমাবদ্ধতা হতেই খাজনার উদ্ভব হয়।

৩. উপকরণের অবস্থানগত গুরুত্ব এবং উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার পার্থক্য ঘটে।

৪. একই জমি ক্রমাগত চাষের ফলে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে চাষী জমির মালিককে খাজনা দিয়ে থাকে।

মজুরি

মজুরি হলো শ্রমিকের শ্রমের দাম। শ্রমের বিনিময়ে মালিক শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক প্রদান করে, তা হলো মজুরি।

স্বাধীনভাবে বা চুক্তির অধীনে উৎপাদন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক তার দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগকারীর নিকট থেকে যে পারিশ্রমিক লাভ করে, তাকে মজুরি বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞার আলোকে মজুরির বৈশিষ্ট্য হলো :

১. মজুরি হলো শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক শ্রমের পুরস্কার।

২. এটি সময়ভিত্তিক বা কর্মভিত্তিক, চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

৩. সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মজুরির হারেও পরিবর্তন আসে।

সুদ

সুদ হলো মূলধন বা ঋণ ব্যবহারের মূল্য। ঋণগ্রহীতা মূলধন বা ঋণ ব্যবহারের জন্য ঋণদাতাকে যে মূল্য প্রদান করে, তাকে সুদ বলে। বিশদভাবে বললে- মূলধন ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ান্তে মূলধনের মালিককে স্থিরকৃত হারে আসলের অতিরিক্ত যে অর্থ বা দাম দেয়, তাকে অর্থনীতিতে সুদ বলা হয়।

মুনাফা

সংগঠক বা উদ্যোক্তার ব্যবসায় পরিচালনার পারিশ্রমিক বা বিনিময় মূল্য হলো মুনাফা। উদ্যোক্তা তার দক্ষতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে বলেই সে মুনাফা অর্জন করে।

উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। আবার এ জাতীয় আয়ে প্রত্যেকটি উপাদানের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের প্রাপ্য অংশ (খাজনা, মজুরি, সুদ, ও মুনাফা আকারে) বণ্টন করে দেয়া হয়।

এছাড়া জাতীয় আয় সামগ্রিক অর্থনীতিতেÑভোগ (C) বিনিয়োগ (I) এবং সরকারি ব্যয়ের (G) মাধ্যমেও বণ্টিত হয়। সরকারি ব্যয় উন্নয়ণমূলক খাতে এবং অনুন্নয়নমূলক (রাজস্ব) খাতে ব্যয় হয়।

এছাড়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আমদানি ব্যয় নির্বাহেও সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে। এভাবে জাতীয় আয় বণ্টিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক. জাতীয় সম্পদের ধারণা বুঝিয়ে লিখুন। খ. জাতীয় আয় কীভাবে বণ্টিত হয়-বুঝিয়ে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ বলে। চাহিদার তুলনায় যে দ্রব্যের যোগান স্বল্প তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে।
- কোনো আর্থিক বছরে (১২ মাস) কোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে।
- জাতীয় আয় সৃষ্টিকারী উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) মালিকদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা বণ্টন করে দেয়াই হলো জাতীয় আয়ের বণ্টন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **অর্থনীতিতে 'সম্পদ' বলতে কোনটিকে বোঝায়?**

(ক) মুক্ত বায়ু (খ) সমুদ্রের পানি
(গ) রাঙামাটির পাহাড় (ঘ) প্রাকৃতিক গ্যাস

২। **প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?**

i. কয়লা
ii. রাষ্ট্রীয় ঋণ
iii. শক্তি সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৩। **জাতীয় আয় বণ্টনের প্রাপ্য অংশ পাবে-**

i. ভূমি
ii. শ্রম
iii. মুনাফা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.২ জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ

Preservation and Misuse Prevention of National Resources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- জাতীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সম্পদের সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয় রোধ।

জাতীয় সম্পদের গুরুত্ব

সম্পদ হচ্ছে অর্থনৈতিক দ্রব্য-সামগ্রী। এসব দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে ভোক্তা যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তৃপ্তি অনুভব করে তাই হচ্ছে কল্যাণ। সম্পদ হল অভাব পূরণের অন্যতম উপাদান। তবে সকল সম্পদ কল্যাণ বৃদ্ধি করে না। যেমন- বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য (মদ, সিগারেট প্রভৃতি) সম্পদ হলেও তা কল্যাণ না বাড়িয়ে বরং মানুষের ক্ষতি করে। তাই বলা হয়, সম্পদের উপার্জন বা অর্জন এবং ব্যবহার দ্বারা মানবজীবনের কল্যাণ প্রভাবিত হয়।

জাতীয় সম্পদ হলো যেকোনো দেশের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত মোট সম্পদের পরিমাণ। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পদের পাশাপাশি সমষ্টিগত সম্পদ যেমন- বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ (খনিজ, পানি সম্পদ ও শক্তি সম্পদ); রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, হাসপাতাল এর সাথে দেশপ্রেম, জনগণের সুনাম, কারিগরি দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

জাতীয় সম্পদ যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচ্য।

জাতীয় সম্পদে যেদেশ সমৃদ্ধ সে দেশের উন্নয়নকে কেউ বাধাগ্রস্ত করে রাখতে পারবে না। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম শক্তির অন্যতম উৎস।

এগুলো উৎকৃষ্ট জ্বালানি হিসেবেও বিবেচ্য। এছাড়া চুনাপাথর, চীনামাটি, কঠিনশিলা, তামা, লোহাসহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পানি সম্পদও জাতীয় সম্পদ হিসেবে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়াও কৃষিকাজ, নৌচলাচল, মৎস্য চাষ ও পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

এছাড়া, কঠোর পরিশ্রমী জাতি, দেশপ্রেমিক এবং কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধ, শান্তিপ্রিয় এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহে উন্নত মানব সম্পদ হিসেবে রপ্তানির সুযোগ লাভ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা যায়।

জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ

অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্য জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ জরুরী। এ লক্ষ্যে জাতিগত উন্নত গুণাবলি অর্জন করা এবং তা ধরে রাখা আবশ্যক। কোনো দেশের মানুষ যদি শান্তিপ্রিয়, কঠোর পরিশ্রমী, সত্যবাদী, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, সেদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন দ্রুত সংঘটিত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনগণ তথা বিনিয়োগকারী, উক্তদেশকে আদর্শ দেশ হিসেবে স্বীকার করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, উত্তোলন এবং দক্ষ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। প্রাকৃতিক সম্পদ হতেই শিল্পে ব্যবহৃত শক্তি সম্পদ, জ্বালানী এবং শিল্পের কাঁচামাল সংগৃহীত হয়।

এছাড়া, বিভিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থার (সড়ক, রেল, নৌপথ, আকাশপথ) উৎকর্ষ সাধন, উন্নত আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, বিমা) গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিদেশ হতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি হ্রাস

করে, দেশিয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এরফলে বিদেশিদের নিকট পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে দেনার পরিমাণ হ্রাস পাবে। এভাবে উন্নয়ন মনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমেই জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে।

জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধের উপায়

যেকোনো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন হলো :

দক্ষ মানব সম্পদ গঠনের লক্ষ্যে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। গ্রাম থেকে শহরে, বস্তি, পাহাড়ী জনপদ বা হাওর বিল এলাকা হতে নগর-বন্দরে কোনো শিশু যেন আধুনিক জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। উন্নত শিক্ষা ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেকোনো কুসংস্কার, গোঁড়ামি হতে মানুষ মুক্ত থাকতে পারে। ব্যক্তিগত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জাতিগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক গঠনের জন্য মূল্যবোধ, নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জরুরি। এরূপ কোনো নাগরিক দেশিয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অর্থ নিম্নমানের কাজ করে আত্মসাৎ করতে পারে না। উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী যেকোনো নাগরিক রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার রোধ করতে পারে।

প্রাকৃতিক গ্যাসসহ যেকোনো রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর দেশের সকল জনগণের সমান অধিকার রয়েছে। সস্তায় এসকল সম্পদের বেশিরভাগ যেন ধনীক শ্রেণির কল্যাণে ব্যয় না হয়। সকল জাতীয় সম্পদ সর্বাধিক যৌক্তিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া উচিত, যার ফলে বেশিরভাগ জনগণের কল্যাণ অর্জিত হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আবশ্যক। বিদ্যমান যেকোনো সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ যাতে বিপন্ন না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এভাবে জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে আপনার সুপারিশ কী কী?

সারসংক্ষেপ

- জাতীয় সম্পদ হলো যেকোনো দেশের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত মোট সম্পদের পরিমাণ। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক দ্রব্য-সামগ্রীর পাশাপাশি দেশজ প্রাকৃতিক সম্পদ, রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, হাসপাতাল, দেশপ্রেম, জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা সুনাম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. উন্নত মানব সম্পদের বৈশিষ্ট্য কোনটি নয়?

(ক) কঠোর পরিশ্রমী জাতি (খ) কারিগরি দক্ষতায় সমৃদ্ধ

(গ) দেশপ্রেমিক (ঘ) আমদানি নির্ভর জাতি

২. জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করার উপায়-

i. ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এর মাধ্যমে

ii. দেশিয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তাড়াহুড়ো করে শেষ করে

iii. সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বিপন্ন না করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৩ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টন

Distribution of Resources in Different Economic System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের বন্টন কীভাবে সম্পাদন হয়, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, মিশ্র অর্থব্যবস্থা, ইসলামি অর্থব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

যেকোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বণ্টনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। অথবা, প্রত্যেক সমাজ বা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে কেন্দ্র করে নানারূপ সামাজিক ও আইনগত রীতিনীতি গড়ে ওঠে। এ রীতিনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়-

১. সম্পদের মালিকানা নির্ধারণ,
২. উদ্যোক্তা ও ভোক্তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ,
৩. বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতি নিরূপণ,
৪. মুনাফা অর্জনের বিষয়ে নীতি নির্ধারণ,
৫. সমাজে শ্রেণিবিভক্তি বা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ এবং
৬. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্বাচন প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ

পৃথিবীর সকল সমাজেই, সব দেশেই অর্থনীতির মৌল সমস্যাগুলোর প্রকৃতি বা স্বরূপ একই কিন্তু বিভিন্ন সমাজে সম্পদের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সমাধান পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে। এ ভিন্নতা অনুযায়ী পৃথিবীতে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন :

(ক) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy)
(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Socialistic Economy)
(গ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy) এবং
(ঘ) ইসলামি অর্থব্যবস্থা (Islamic Economy)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যদিয়ে সমগ্র ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এরূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ধনতন্ত্র বিকাশের জন্য চারটি শর্তের প্রয়োজন-

(ক) উন্নত যন্ত্রপাতি

(খ) পণ্যের বিস্তৃত বাজার

(গ) কতিপয় লোকের হাতে প্রচুর অর্থ জমা হওয়া এবং

(ঘ) শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য এরূপ একদল শ্রমিক।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান, ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান এর মিথষ্ক্রিয়া পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা'।

সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা থাকার কারণে এখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণির উদ্ভব হয় অর্থাৎ এ সমাজে শ্রেণিবিভক্তি বিদ্যমাণ। মুনাফা আহরণকে সামনে রেখে ধনতন্ত্রে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়। সমাজে শ্রেণিবিভক্তি বিদ্যমান থাকার কারণে অসম আয়ের বণ্টন ঘটে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মান, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া সহ পৃথবীর অনেক দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

বিশ্বের সর্বপ্রথম সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের পতন ও লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়।

সমাজতন্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এরূপ এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই তবে সামাজিক মালিকানা রয়েছে, উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়।

এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে। ব্যক্তিগত মুনাফার আশায় পণ্য উৎপাদিত হয় না। কী এবং কতটুকু উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন ও বণ্টন করা হবে-এসব সিদ্ধান্তের মালিক হলো রাষ্ট্র। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোক্তার বা ক্রেতার চাহিদাকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাতে শ্রমিকেরা ভোগ করতে পারে, সে দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমাজের সব সদস্যকে জীবনের সকল সাধারণ ঝুঁকির বিরুদ্ধে আর্থিক নিরাপত্তা দেয়া হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করে বিধায় সুষম উন্নয়ন সাধিত হয়। রাশিয়া, চীন, কিউবা, উত্তর কোরিয়া ও পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রচলিত হয়। তবে বর্তমানে রাশিয়া, চীনসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো বাজার অর্থনীতি প্রচলন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা

যে অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণত এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। কিছু সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় এবং কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন সড়ক পথ নির্মাণ, রেলপথ, সমুদ্র বন্দর, বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, হাসপাতাল, টেলিযোগাযোগ নির্মাণে সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগ অপেক্ষা সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধুনা এরূপ অনেক বৃহৎ উদ্যোগ সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ (Public Private Partnership–PPP) এর মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মিশ্র অর্থনীতিতে পণ্য-দ্রব্যের দাম নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয়। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণে বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভূমিকা পালন করে। তবে সরকার রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে দাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ অর্থব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তি মালিকানা-ব্যক্তি উদ্যোগ স্বীকৃত, তাই মুনাফা অর্জনও স্বীকৃত। মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময়, শ্রম আদালত, শিল্প বিরোধ নিস্পত্তিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরূপ অর্থনীতিতে কখনো অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে সরকার কালোবাজারী, মজুতদারি, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও বাণিজ্যচক্র মোকাবেলা করে সরাসরি তা নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইংল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নরওয়েসহ বর্তমানে অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বিশুদ্ধ নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র কোনোটিই সমাজের উন্নয়নের জন্য এককভাবে যথেষ্ট নয়। তাই অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেন।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলতে ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায়-পরায়নতার সাথে সমাজে সম্পদের দক্ষ বরাদ্দ ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ইসলামি আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ উপস্থিত থাকে এবং অধিকাংশ মানুষ ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী এবং এ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করে।

ইসলামি অর্থনীতির উৎস হলো চারটি। যেমন- (১) পবিত্র কুরআন, (২) সুন্নাহ বা হাদিস (মহানবীর (স) ২৩ বছরের কথা, কর্ম, অনুমোদন, সম্মতি, অসম্মতি) (৩) ইজমা বা ঐকমত্য (কোনো বিতর্কিত বিষয়ে মুজতাহিদগণ যদি ঐকমত্র্য হন, তখনই তাকে ইজমা বলা হয়।) (৪) কিয়াস (নতুন সমস্যায় পুরাতন সমস্যার সমাধান প্রয়োগ করাকে কিয়াস বলে।)

এ অর্থব্যবস্থায় স্বীকার করা হয় যে, সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, মানুষ তার প্রতিনিধি হিসেবে আমানতদার। সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন, ভোগ, দখলে হালাল ও হারামের বিধান বাস্তবায়ন। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অতি স্বার্থপরতা, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, মজুতদারী, কালোবাজারী, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ অর্থব্যবস্থায় ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এখানে শ্রমিক শোষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহান রসূল (স)-এর হাদিসে উল্লেখ আছে, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ কর।"

ইসলামি অর্থনীতিতে উত্তরাধিকার আইনের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়। পিতার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের অধিকার স্বীকৃত। এখানে অপচয় ও বিলাসকে সমর্থন করে না।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান থাকে। ভোক্তাদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে সামাজিক উৎপাদন তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন লক্ষ্য করা যায়। এখানে বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে ছোট ছোট উৎপাদনকারীরা ক্রমেই দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই এরূপ অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি বৈষম্যের উদ্ভব হয়। সমাজে শক্তিশালী ধনিক শ্রেণি উৎপাদনের বেশিরভাগ সুফল ভোগ করে। মধ্যবর্তী ও দরিদ্র শ্রেণির জনগণ ক্রমান্বয়ে এ সুফল কম ভোগ করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী সমাজে আয় বন্টন করা হয়। তাই জাতীয় আয় বা সামাজিক উৎপাদন বণ্টনে শ্রমিকদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়। দাম ব্যবস্থা নির্দেশমূলক বা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সম্পদের প্রবাহ-ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো একমুখী বা পুঁজিপতির দিকে ধাবিত হয় না। এ কারণে সর্বহারা শ্রেণি এখানে অনুপস্থিত।

রাষ্ট্রের আঞ্চলিক উন্নয়নের মধ্যেও কোনো প্রকার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় না। সব অঞ্চল সমানভাবে গুরুত্ব পায় বিধায় সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পদের সামাজিক ও আঞ্চলিক বণ্টন এক্ষেত্রে সুষম হয়।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ ও সম্পদের মালিকানায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহ অবস্থান বিদ্যমান থাকে তাই বণ্টন ব্যবস্থায়ও উভয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন-

সরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য হলো, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা মজবুত করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রিত আয় বৈষম্য তথা টেকসই সামাজিক উন্নয়ন যেন সাধিত হয়।

কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তা মুনাফাকে কেন্দ্র করেই গ্রহণ করা হয়। সুযোগ পেলেই পুঁজিপাতিরা ভোক্তাকে জিম্মি করে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করেলুটে নেয়। এটি মূলত ধনতন্ত্রের চরিত্র। তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এ সকল উপাদান সজীব থাকে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

ইসলামি অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ লক্ষ্যে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে তা দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাকাত, ওশর (শস্যের উপর যাকাত), জিজিয়া (মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তার কর), খারাজ (যুদ্ধে বিজিত ভূমির উপর কর), খুমুস, আশুর, ওয়াক্ফ, সাদ্‌কাহ (স্বেচ্ছামূলক দান), দারায়ের প্রভৃতি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা হয় ইসলামি অর্থনীতিতে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক. বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহের পার্থক্য চিহ্নিত করুন। খ. বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন কীরূপ-তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

- যে কোনো দেশের বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বণ্টনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।
- যে অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেরূপ অর্থব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এরূপ এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই তবে সামাজিক মালিকানা রয়েছে, উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়।
- যে অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। এরূপ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ যৌথভাবে ভূমিকা পালন করে।
- অর্থব্যবস্থা ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায়পরায়নতার স্বার্থে সমাজে সম্পদের দক্ষ বরাদ্দ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়, তাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. 'যাকাত' কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?

(ক) পুঁজিবাদী (খ) সমাজতন্ত্রিক
(গ) মিশ্র (ঘ) ইসলামি

২. 'উৎপাদনের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন' কোন অর্থ ব্যবস্থায়?

(ক) ইসলামি (খ) মিশ্র
(গ) সমাজতান্ত্রিক (ঘ) ধনতান্ত্রিক

৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে-

i. শ্রেণি শোষণ অনুপস্থিত
ii. উপকরণের ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান
iii. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

*** নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

A দেশে বাজার নির্ধারিত দামে ক্রেতা-বিক্রেতারা দ্রব্য-সামগ্রী কেনা-বেচা করেন। অবশ্য সরকার মাঝে মাঝে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কোনো কোনো দ্রব্যের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করে দেন। অন্যদিকে B দেশে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৪. A দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

(ক) ধনতান্ত্রিক (খ) মিশ্র
(গ) সমাজতান্ত্রিক (ঘ) ইসলামি

৫. B দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়-

(ক) মুনাফা ও সেবার ভিত্তিতে (খ) সেবার ভিত্তিতে
(গ) মুনাফার লক্ষ্যে (ঘ) ন্যায় বিচার ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

*** নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রহিম সাহেব 'X' দেশের নাগরিক। তিনি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে 'Y' দেশে এসে দেখলেন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তখন রহিম সাহেব বললেন-আমার দেশে সকল প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৬. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি কিরূপ?

(ক) ধনতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক
(গ) ইসলামি (ঘ) মিশ্র

৭. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য যথাক্রমে-

i. নিয়ন্ত্রিত দাম ব্যবস্থা ও স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা
ii. মুদ্রাস্ফীতি অনুপস্থিত অপর দিকে মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি
iii. জনকল্যাণ নিশ্চিত অপরদিকে মুনাফা অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

Economic System in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মিশ্র অর্থব্যবস্থা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভোক্তার সার্বভৌমত্ব, স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র বা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, এককভাবে কোনটিই নয়। বরং এ দুটো অর্থনীতির কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন-

১. সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উপস্থিতি বিদ্যমান : সম্পদের মালিকানা, বিনিয়োগ, উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি রয়েছে। জনগুরুত্বপূর্ণ খাতসহ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা খাত; বৃহৎ মৌলিক ও ভারী শিল্পকারখানাসহ গুরুত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায়-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। তবে একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের উপর সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

২. ভোক্তার সার্বভৌমত্ব : মিশ্র অর্থনীতিতে ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী যেমন উৎপাদন করতে পারে তেমনি ভোক্তা নিজের পছন্দ অনুযায়ী তা ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। সরকার প্রয়োজন অনুসারে কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা : বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থায় দাম ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় থাকে। এ ব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির ধারণাকে উৎসাহিত করা হয়। বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে এখানে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে সরকার কখনো কখনো দাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ধারণাটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :

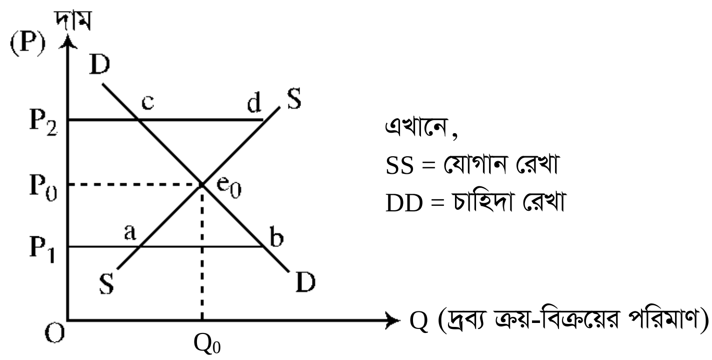

চিত্র : স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা

মিশ্র অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে OP_1 দামে যোগান অপেক্ষা চাহিদা ab পরিমাণ অধিক। ফলে দাম বৃদ্ধি পাবে। OP_2 দামে চাহিদা অপেক্ষা যোগান cd পরিমাণ অধিক। এক্ষেত্রে দাম হ্রাস পাবে। এরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় OP_0 এবং ভারসাম্য পরিমাণ OQ_0। ভারসাম্য দামে চাহিদা ও যোগান সমান হয়।

৪. মুনাফা : প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তি মালিকানা, ব্যক্তি উদ্যোগ বিদ্যমান রয়েছে, তাই মুনাফা অর্জনও এখানে স্বীকৃত। অনেক সময় অতি উৎপাদন এবং অনেক সময় কম উৎপাদনও এখানে সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতিও এখানে রয়েছে।

৫. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন কর্মসূচিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। বাণিজ্যচক্র, কালোবাজারী, মজুদদারী, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে কখনো অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে সরকার তা সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

৬. শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় সরকার শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নানারূপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যেমন- ন্যূনতম মজুরি প্রদান, কাজের সময় নির্ধারণ, শ্রম আদালত, শিল্প-বিরোধ নিস্পত্তিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এখানে সরকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। কাজের বিনিময়ে টাকা/খাদ্য, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, নারী ও শিশু সুরক্ষা তহবিল, পেনশন, গ্রাচুইটি প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

৭. বণ্টনব্যবস্থা : বাংলাদেশে যেহেতু সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত, তাই সমাজে বণ্টনব্যবস্থার দ্বারা সমতা স্থাপন করা যাবে না। জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন এ ব্যবস্থায় নিশ্চিত হবে না।

উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মিশ্র প্রকৃতির।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে যে স্থির দামে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য-সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়, সেরূপ ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীরূপ?

(ক) শুধু সরকারি খাতের উপস্থিতি (খ) শুধু বেসরকারি খাতের উপস্থিতি

(গ) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত দাম ব্যবস্থা (ঘ) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উপস্থিতি

২. বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় স্বীকৃত-

i. ব্যক্তির স্বাধীনতা

ii. চিন্তার স্বাধীনতা

iii. আয়ের সুষম বণ্টন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা :

পাঠ- ১১.১ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক

পাঠ- ১১.২ : ১। ঘ ২। খ

পাঠ- ১১.৩ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ ৫। খ ৬। খ ৭। ক

পাঠ- ১১.৪ : ১। ঘ ২। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

X দেশের নাগরিকরা অত্যন্ত সৎ, নির্ভীক, পরিশ্রমী। কিন্তু Y দেশের নাগরিকরা অত্যন্ত দুর্বল ও অলস প্রকৃতির। X দেশের অনেকের ন্যায় মি. জন অনেক সম্পদশালী হলেও Y দেশের সাধারণ জনগণ, উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সবই অত্যন্ত স্বল্প আয়ের মাধ্যমে দিনাতিপাত করছে।

(ক) জাতীয় সম্পদ কী? ১

(খ) দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় কী জাতীয় আয়ে অন্তর্ভূক্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) X দেশে জাতীয় সম্পদ কীভাবে বণ্টিত হয়? বুঝিয়ে লেখ। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের মধ্যে কোনটিতে উপকরণের প্রাপ্য অংশ কম বা সর্বনিম্ন হারে বণ্টিত হয়? বুঝিয়ে লেখ। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

'A' একটি সম্ভাবনাময় দেশ। সেখানে শিল্প ও সেবাখাতের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেমন-প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, ডাক ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের একটা বড় অংশ সরকার করে থাকেন। পাশাপাশি, প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। অপরদিকে 'B' দেশে সমস্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে সরকারের ভূমিকাই মুখ্য।

(ক) মজুরি কী? ১

(খ) বাংলাদেশের অর্থনীতি 'ধনতান্ত্রিক' অর্থনীতি নয়-বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে A এবং B দেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কী? তোমার যুক্তি দাও। ৪

অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি

Economic Determinants and Nature of Bangladesh Economy

ইউনিট ১২

ভূমিকা : যেকোনো দেশের জন্য অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসমূহের অবস্থান ও অবদান জানা যায়। বাংলাদেশও এসকল নির্ধারক এর আলোকে উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা কীরূপ তা আমরা অবগত হতে পারি। বর্তমান ইউনিটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত চিহ্নিত করা যেতে পারে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্পর্ক কীরূপ হবে- তারও একটি রূপরেখা রচনা করা যায়।

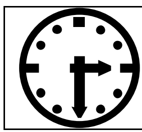 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ : মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন
পাঠ-১২.২ : মাথাপিছু আয়ের ধারণা
পাঠ-১২.৩ : দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহ
পাঠ-১২.৪ : বিভিন্ন দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা
পাঠ-১২.৫ : বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ
পাঠ-১২.৬ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ
পাঠ-১২.৭ : উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি
পাঠ-১২.৮ : উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

পাঠ-১২.১ মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন
Gross National Product and Gross Domestic Product

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট দেশজ উৎপাদন।

মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product–GNP)

অর্থনীতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন ধারণাটি একটি বৃহৎ বা প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে।

এখানে 'চূড়ান্ত দ্রব্য' বলতে, আলোচ্য সময়কালে যে সকল দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এবং ভোক্তা হিসেবে আমরা ভোগ করি সেগুলোকে বুঝায়।

অধ্যাপক র‌্যাগান (Ragan) এবং থমাস (Thomas) এর মতে, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা কোনো অর্থনীতিতে উৎপাদিত হয়, তার সামগ্রিক অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।"

সূত্র : GNP = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় – দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।

GNP তে মোট বিনিয়োগ ব্যয় ধরা হয়। এ ধারণাটি স্বল্পকালীন বিষয় বিবেচনার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। GNP ধারণার সাহায্যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এর সাহায্যে একটি দেশকে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। GNP হতে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না বা মাথাপিছু আয়ও নির্ণয় করা হয় না। অর্থনীতিবিদরা হঠাৎ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরের সম্মুখীন হলে, সেরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তৎক্ষণাৎ GNP ধারণাটি ব্যবহার করে থাকেন।

তবে GNP থেকে মূলধন সামগ্রী ব্যবহার জনিত ব্যয় বা অবচয় ব্যয় (Depreciation Cost) বাদ দিলে নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয় নির্ণয়ে NNP ব্যবহৃত হয়। অর্থনৈতিক গুরুত্ব GNP অপেক্ষা NNP এর অধিক হলেও এর ব্যবহার কম।

মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product–GDP)

জাতীয় আয় নির্ধারণ, সামষ্টিক বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন নীতি নির্ধারণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP। মোট দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ আয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত (includes) হয় এবং দেশীয় নাগরিক যারা প্রবাসে, তাদের প্রেরিত অর্থ ধরা হয় না।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং উক্ত দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের উপার্জিত আয় এর সমষ্টি (includes) থেকে বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ বাদ (excludes) দেয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

অর্থাৎ GDP = মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) + উক্ত দেশে অবস্থানকারী বিদেশিদের অর্জিত আয় - বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিকদের আয়।

সমীকরণের সাহায্যে

সামগ্রীক ব্যয়ের প্রেক্ষিতে তিনখাত বিশিষ্ট বদ্ধ অর্থনীতিতে $GDP = C + I + G$ এবং উন্মুক্ত অর্থনীতিতে বৈদেশিক লেনদেন যুক্ত হলে তখন $GDP = C + I + G + X_n$

এখানে, C = বেসরকারি ভোগ ব্যয়, I = বেসরকারি মোট বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয় এবং X_n = নিট রপ্তানি = $X - M$, যেখানে X = পণ্যদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ এবং M = পণ্যদ্রব্য আমদানির পরিমাণ।

উদাহরণ : ফেনীর যাত্রাসিদ্দি গ্রামের বাবুল মিঞা জার্মানির একটি কোম্পানিতে মাসিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করেন। তার এই বেতন নিজ দেশে পাঠালে তা GNP তে হিসাব করা হবে। পক্ষান্তরে উক্ত আয় জার্মানির হিসাবে GDP তে বিবেচনা করা হবে।

GNP অপেক্ষা GDP ধারণাটির অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক. মোট জাতীয় উৎপাদন এর ধারণাটি লিখুন। খ. মোট দেশজ উৎপাদন এর ধারণাটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরেও দেশের বাইরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে, তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।
- নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং উক্ত দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের উপার্জিত আয় এর সমষ্টি থেকে দেশীয় নাগরিককর্তৃক বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **বাংলাদেশের প্রফেসর মি. মোতালেব যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। তাঁর আয় নিজ দেশে কোনটির অন্তর্ভুক্ত?**

(ক) মোট জাতীয় উৎপাদন (খ) মোট দেশজ উৎপাদন (গ) মাথাপিছু আয় (ঘ) প্রত্যক্ষ কর

২। **কোনটি চূড়ান্ত দ্রব্য?**

(ক) গম (গ) চাউল (গ) ময়দা (ঘ) রুটি

৩। **কোনটি মধ্যবর্তী দ্রব্য?**

(ক) বিস্কুট (খ) পাউরুটি (গ) কেক (ঘ) ময়দা

৪। **মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভূক্ত হয়-**

i. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়
ii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়
iii. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.২ মাথাপিছু আয়ের ধারণা
Conception of Per Capita Income

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মাথাপিছু আয় কীভাবে নির্ণয় করা হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাথাপিছু আয়।

মাথাপিছু আয় (Per-Capita Income)

সাধারণত মাথাপিছু আয় বলতে জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে কোন দেশের মোট জাতীয় আয়কে ঐ বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

World Development Report 2010 অনুযায়ী Gross National Income (GNI) Per-Capita is gross national income devided by midyear population.

$$\text{সূত্র : মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয় (GNI)}}{\text{ঐ বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা}}$$

সারণি ১২.২.১ : কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় (২০১০-২০১২) (মার্কিন ডলার)

দেশ	মাথাপিছু আয় ($)	
	World Dev. Report 2010	World Dev. Report-2012
সুইজারল্যান্ড	৬৫,৩৩০	৭০,৩৫০
নরওয়ে	৮৭,০৭০	৮৫,৩৮০
ডেনমার্ক	৫৯,১৩০	৫৮,৯৮০
জাপান	৩৮,২১০	৪২,১৫০
সিঙ্গাপুর	৩৪,৭৬০	৪০,৯২০
যুক্তরাষ্ট্র	৪৭,৫৮০	৪৭,১৪০
বাংলাদেশ	৫২০	৬৪০

উৎস : World Development Report ; 2010, 2012

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১৪৬৬ মার্কিন ডলার।*

যদিও বলা হয়, মাথাপিছু আয় হলো যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক। বাস্তবে, মাথাপিছু আয় দ্বারা একটি দেশ বা সমাজের সকল জনগণের সত্যিকার আর্থিক ক্ষমতার স্বরূপ বোঝা যায় না।

যেমন, ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুরে বাংলাদেশের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্ম। কিন্তু তাঁর গ্রামের অন্য সকল জনগণ যদি দরিদ্র কৃষক, স্বল্প আয়ী হয়, তখন উক্ত গ্রামের জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে চাইলে, কোনো নির্দিষ্ট বছরের ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির আয়কে দরিদ্র জনগণের আয়ের সাথে যোগ করে ঐ গ্রামের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। মনে করি প্রত্যেক

* অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা xvii

কৃষক এর মাথাপিছু আয় পাওয়া যায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। বাস্তবে এ আয় কৃষকের উন্নয়ন বা জীবনযাত্রার মানের প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	`X' নদী ভাঙ্গন কবলিত একটি দরিদ্র জনগোষ্ঠির গ্রাম। সে গ্রামের লোক সংখ্যা ৫২০ জন। উক্ত গ্রামের শিল্পপতি রহমান সাহেব প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার মালিক। কিন্তু অন্য সব লোকের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা। প্রতি বছর রহমান সাহেবের আয় ৩০% বৃদ্ধি পেলে উক্ত গ্রামের জনগণের জীবযাত্রার মানের কীরূপ পরিবর্তন হবে, মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- কোনো দেশের কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের মোট জাতীয় আয়কে ঐ বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **কোন দেশের মাথাপিছু আয় সর্বনিম্ন?**

(ক) নরওয়ে (খ) ডেনমার্ক

(গ) সিঙ্গাপুর (ঘ) বাংলাদেশ

২। **মাথাপিছু আয় দ্বারা স্বরূপ বোঝা যায়-**

i. জনগণের সত্যিকার আর্থিক ক্ষমতার

ii. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের

iii. জীবনযাত্রার মানের

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i. ও ii. (খ) i. ও iii. (গ) ii. ও iii. ঘ i., ii. ও iii.

পাঠ-১২.৩ দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহ

Sectors of National Income in Domestic Product

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- দেশজ উৎপাদন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজস্ব কর, কর বহির্ভূত রাজস্ব, প্রত্যক্ষ কর, পরোক্ষ কর, প্রশাসনিক রাজস্ব, বাণিজ্যিক রাজস্ব।

দেশজ উৎপাদন

দেশজ উৎপাদন হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি। এক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত বিদেশিদের আয় এ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয় কিন্তু বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় যুক্ত হয় না।

সরকার জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আয় করতে হয়। সরকার যে সব উৎস থেকে আয় সংগ্রহ করে থাকে তাকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) রাজস্ব কর (Revenue-Tax) ও (খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব (Non-Revenue Tax)

বাংলাদেশে সরকারের আয় বা রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ (৮৩ শতাংশ)* আসে রাজস্ব কর হতে যা গঠিত হয় প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সমন্বয়ে। অবশিষ্ট আয় সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন উৎস হতে যেমন : ফি, মাসুল, টোল, জরিমানা ইত্যাদি খাত হতে।

রাজস্ব কর

সরকার করের মাধ্যমে যে আয় বা রাজস্ব সংগ্রহ করে তাকে রাজস্ব কর বলা হয়।

কর : জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণ সরকারের নিকট হতে প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ-সুবিধা বা সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে, তাকে কর বলা হয়।

অথবা, রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য নাগরিকের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ-আদায় করা হয়, তাকে কর বলে।

কর দু ধরনের হতে পারে। যথা :

প্রত্যক্ষ কর : করের একটি ভার বা বোঝা আছে। প্রথম যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য করা হয় বা যাকে কর দিতে বাধ্য করা হয়, সে যদি তার উপর আরোপিত কর অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে বা স্থানান্তর করতে না পারে, সেক্ষেত্রে উক্ত করের প্রাথমিক ভার ও সর্বশেষ ভার তার উপর অর্থাৎ একই ব্যক্তি বহন করে। এরূপ করই প্রত্যক্ষ কর। অর্থাৎ যে করের প্রাথমিক ভার ও সর্বশেষ ভার একই ব্যক্তি বহন করে, তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন- আয় কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, মুনাফা কর, ব্যাংক সঞ্চয়ের উপর কর ইত্যাদি।

পরোক্ষ কর : প্রথম ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে সে যদি এ করের ভার অন্য কোনো ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিতে পারে সেরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে। অর্থাৎ এরূপ কর প্রথম যার উপর ধার্য করা হয়, সে প্রাথমিকভাবে করের বোঝা বহন

---

* অর্থমন্ত্রণালয় (২০১৬), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ৪০

করলেও শেষ পর্যন্ত করের চূড়ান্ত ভার অন্যের উপর পড়ে। যেমন- বিক্রয় কর, মূল্য সংযোজন কর (VAT), আবগারি শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি।

কর-বহির্ভূত রাজস্ব

কর ছাড়াও অন্যান্য যে সব উৎস হতে সরকার আয় সংগ্রহ করে, তাকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে। যেমন-

১. প্রশাসনিক রাজস্ব : সরকারের নিকট থেকে কোনো বিশেষ উপকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ স্বেচ্ছায় যে অর্থ প্রদান করে, তাকে প্রশাসনিক রাজস্ব বলা হয়। প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে উপজাত হিসেবে (by Product) সরকার এ ধরনের রাজস্ব পেয়ে থাকে। যেমন : কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, রেডিও-টেলিভিশনের লাইসেন্স ফি, আদালতে জরিমানা আদায়, নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত থেকে আয় ইত্যাদি।

(২) বাণিজ্যিক রাজস্ব : অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে বহু প্রতিষ্ঠান ও শিল্প পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট সেবা বিক্রয় করে রাষ্ট্র বা সরকার যে অর্থসংগ্রহ করে, তাকে বাণিজ্যিক রাজস্ব বলে। যেমন- রেলওয়ে ও বিমান থেকে ভাড়া, ডাক ও তার বিভাগ থেকে মাশুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন, ব্যাংক-বিমা ও মৌলিক ভারী শিল্প থেকে মুনাফা ইত্যাদি লাভ করে থাকে।

এছাড়াও সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যক্তি বিশেষের লাভের একটি অংশ আদায়, স্থানীয় কর (ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ); সরকারি ঋণ, সুদ, নোট প্রচলন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ, পুরস্কার, টাকশাল, সরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং অনুদান ও দান ইত্যাদি থেকেও যথেষ্ট পরিমান আয় পেয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

- জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণ সরকারের নিকট হতে প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।
- প্রথম যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য করা হয়, তাকেই যদি ঐ কর দিতে বাধ্য করা হয়, সে যদি উক্ত কর অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে না পারে, সে করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন- আয় কর, সম্পদ কর প্রভৃতি।
- প্রথম কোনো ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য করা হলে উক্ত কর যদি সে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে, সেরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে। যেমন- বিক্রয় কর। মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রভৃতি।
- সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো বিশেষ উপকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ স্বেচ্ছায় যে অর্থ প্রদান করে, তাকে প্রশাসনিক রাজস্ব বলে। যেমন- কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি প্রভৃতি।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পণ্য/সেবা বিক্রয় করে রাষ্ট্র যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাকে বাণিজ্যিক রাজস্ব বলে। যেমন- রেলওয়ে ও বিমান ভাড়া, ডাক ও তার বিভাগ থেকে মাশুল প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি প্রত্যক্ষ কর?

(ক) বিক্রয় কর (খ) মূল্য সংযোজন কর

(গ) আবগারি শুল্ক (ঘ) মুনাফা কর

২। কোনটি পরোক্ষ কর?

(ক) ভূমি রাজস্ব (খ) মূলধনী লাভ কর

(গ) মুনাফা কর (ঘ) বাণিজ্য শুল্ক

৩। কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনগুলো?

i. প্রশাসনিক রাজস্ব

ii. প্রমোদ কর

iii. টোল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৪ বিভিন্ন দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা

Comparison of GNP, GDP and Per Capita Income of Different Countries

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির প্রেক্ষিতে জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ, GDP, মাথাপিছু GDP।

বিশ্বব্যাংক (World Bank) মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশসমূহকে চার শ্রেণিতে বিভাজন করেন। যথা: (১) নিম্ন শ্রেণির আয়ের দেশ, (২) নিম্ন মধ্য শ্রেণির আয়ের দেশ, (৩) উচ্চ মধ্য শ্রেণির আয়ের দেশ এবং (৪) উচ্চ শ্রেণির আয়ের দেশ।

কিন্তু মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, কার্যকর অর্থব্যবস্থার প্রেক্ষিতে প্রচলিত অর্থে পৃথিবীর দেশসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. উন্নত দেশ। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন।

খ. অনুন্নত দেশ। যেমন- সিয়েরা লিওন, ইথিওপিয়া।

গ. উন্নয়নশীল দেশ। যেমন- বাংলাদেশ।

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে নিম্নে তিন শ্রেণির দেশের আর্থিক সূচকের তুলনা তুলে ধরা হলো :

যুক্তরাষ্ট্র : একটি উন্নত দেশ। 2015 ও 2016 সালে যুক্তরাষ্ট্রের GDP ছিল 18.558 (নমিনাল বা আর্থিক) ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (2016)। GDP এর প্রবৃদ্ধি 2.6 শতাংশ (2015) এবং মাথাপিছু GDP 57,220 মার্কিন ডলার (2016)[*1]

জাপান : একটি উন্নত দেশ। 2016 সালে জাপানের GDP 4.41 ট্রিলিয়ন (নমিনাল) মার্কিন ডলার। মাথাপিছু GDP (নমিনাল-2016) 34,870 মার্কিন ডলার এবং 2015 সালের হিসেবে বার্ষিক GDP প্রবৃদ্ধি[*2] – 1.4%।

চীন : নিকট অতীতে চীন উন্নয়নশীল দেশ হলেও বর্তমানে চীন একটি উন্নত দেশ। 2016 সালের হিসেব অনুযায়ী চীনের GDP 11.38 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (নমিনাল), বার্ষিক GDP এর প্রবৃদ্ধি 6.9% (2015); মাথাপিছু GDP 6,807.43 (2013); 8,240 (2016) (নমিনাল) মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) 11,850 (2013) মার্কিন ডলার।

সিয়েরা লিওন : এটি আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত একটি অনুন্নত দেশ। 2012 সালের হিসেব অনুযায়ী সিয়েরা লিয়ন এর GDP 8.412 বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ইথিওপিয়া : ইথিওপিয়াও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত একটি অনুন্নত দেশ। এর GDP 132 বিলিয়ন (2014) মার্কিন ডলার। মাথাপিছু GDP 570 (2014) (নমিনাল) মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। 2016 সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের GDP 223.94 বিলিয়ন মার্কিন ডলার; বার্ষিক GDP এর প্রবৃদ্ধি 7.1% এবং মাথাপিছু GDP 1386.51 মার্কিন ডলার।[*3] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাথাপিছু GDP ২০৯৭ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু GNI ২২২৭ মার্কিন ডলার।

---

*1. Ref. Wikipedia, the free encyclopedia

*2. **প্রবৃদ্ধি (Growth) :** নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে (১২ মাসে) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উৎপাদন বা আয়ের শতকরা পরিবর্তন। এর মান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যেকোনোটিই হতে পারে।

*3. Wikipedia, the free encyclopedia

এ থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহের উন্নয়নের স্তর একই সারিতে নেই। বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন স্তরের মাত্রাগত পার্থক্যের কারণে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের বা সকল শ্রেণির দেশের অর্থনৈতিক সূচক যেমন মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট দেশজ উৎপাদন এবং মাথাপিছু আয় এক নয়। এ সকল সূচকের মান বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়। বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান সম্পদ, উন্নয়ন কৌশল, উন্নয়ন স্তর, দক্ষ জনশক্তি, উপকরণ উৎপাদন সম্পর্ক এসবের মাধ্যমে জিএনপি; জিডিপি এবং মাথাপিছু আয় প্রভাবিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিশ্বব্যাংক এর শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী পৃথিবীর দেশসমূহ হল-

i. উচ্চ শ্রেণির আয়ের

ii. নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়ের

iii. অনুন্নত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। নিম্ন শ্রেণির আয়ের দেশ কোনটি?

(ক) ইথিওপিয়া (খ) চীন

(গ) জাপান (ঘ) বাংলাদেশ

পাঠ-১২.৫ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ
Characteristics of Bangladesh Economy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনৈতিক অঞ্চল, EPZ, PPP।

গ্রাম ভিত্তিক কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ। স্বাধীনতা-উত্তর সাড়ে তিন দশকে দেশের আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে প্রত্যাশার চেয়েও অধিক হারে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে একটি 'মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিগত এক দশকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. কৃষি : কৃষি বাংলাদেশের প্রাণ এবং অর্থনীতিতে একক বৃহত্তম খাত। ১৯৭১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বসবাসের জন্য আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারের নানামুখী সমর্থনসূচক কর্মকাণ্ড ও এদেশের কৃষক ভাইদের অদম্য প্রচেষ্টায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ১৪৯.৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩৮১.৭৪ ও ৩৮৪.১৯ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়।*

২. শিল্পের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ : বর্তমানে সরকার শিল্প স্থাপনে অধিক উৎসাহপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করছে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সরকার সুপরামর্শ, বিনিয়োগ নীতি সহজীকরণ, ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা, শিল্প নিরাপত্তা বৃদ্ধি, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে প্যাকেজ সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করছে। এছাড়াও সরকার দেশে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতে মোট দেশজ উৎপাদন ছিল ৮,৭৫,৯৫৮ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১৫,৯৫,৬৮০ কোটি টাকা।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস : ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭% এবং ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৬% এ উপনীত হয়। ২০১৬ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা (প্রক্ষেপিত) ১৫৯.৯ মিলিয়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% উল্লেখ করা হয়।

৪. বেকার সমস্যা : বাংলাদেশে তীব্র বেকার সমস্যা বিরাজমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কম। যার ফলে বিনিয়োগ আশানুরূপ নয়। তাই বেকার সমস্যার তেমন উন্নতি হয়নি। তবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারিগণ যেহেতু এদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে EPZ, 'অর্থনৈতিক অঞ্চল' চালু হচ্ছে, এছাড়া ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের ফলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যা হ্রাস পাবে।

৫. মাথাপিছু আয় : বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ সালে যেখানে এদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ৮৪৮ মার্কিন ডলার, তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ সালে ১৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

৬. জীবনযাত্রার মান : জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ এর হিসাব অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান পূর্বের চেয়ে উন্নত হওয়ায় প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে পুরুষ ৬৯.১ ও মহিলা ৭১.৬ বছর হয়েছে। নিরাপদ সুপেয় পানি গ্রহণকারী ৯৭.৮%। সাক্ষরতার হার ৬২.৩%।

* অর্থমন্ত্রণালয় (২০১৬), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ১৮

৭. বৈদেশিক বাণিজ্য : বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্বে প্রচুর ঘাটতি ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন বন্ধুদেশে আমাদের দেশের পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পাবার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। তবে এখনো বৈদেশিক বাণিজ্য অনুকূলে আসেনি।

৮. শিক্ষার হার : দেশে বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক জেলাকে সরকার 'নিরক্ষর মুক্ত' ঘোষণা করেছে। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬২.৩% এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, পৃষ্ঠা (xvii)।

৯. সামাজিক কুসংস্কার : বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির ফলে সামাজিক নানা কুসংস্কার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। বর্ণবৈষম্য, বাল্য ও বহু বিবাহ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

১০. কারিগরি জ্ঞানের প্রসার : দেশে বর্তমানে যুবকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটছে। কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করে এর নানামুখী ব্যবহারের প্রতি যুব সমাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১. দারিদ্র্য বিমোচন : দারিদ্র্য বিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুমাত্রিক জটিল ও বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উচ্চহারে বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসুচি নেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। ফলে তাদের মাথাপিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. বেসরকারিকরণ : দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারি খাত উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

এ লক্ষ্যে গঠিত বেসরকারি কমিশন কাজ করছে। সরকার সমগ্র দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership–PPP) মাধ্যমে বৃহৎ অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত বা অনুন্নত কোনটিই নয়। দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ এর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

- স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় পাঁচ দশক শেষ হতে চললো। এ সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার একইরূপ ছিল না। দীর্ঘসময় বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের (যেমন কৃষি, শিল্প ও সেবা) তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। শিক্ষার হার ছিল নিম্ন, জনগণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল উচ্চ। কিন্তু বর্তমানে কৃষি, শিল্প ও সেবা প্রতিটি খাতেরই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে, মাথাপিছু আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নযনশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। জনগণের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিম্নের কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে?

(ক) বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে

(খ) সামাজিক কুসংস্কার বৃদ্ধি পাচ্ছে

(গ) কারিগরি জ্ঞানের তেমন প্রসার ঘটেনি

(ঘ) শিল্পের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ

২। বাংলাদেশের অর্থনীতির অতীত বৈশিষ্ট্য হল-

i. কৃষিতে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি

ii. শিল্প উৎপাদন স্বল্প

iii. মাথাপিছু আয় স্বল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ

Obstacles of Economic Development of Bangladesh and Initiatives of Economic Development

উদ্দেশ্য **এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-**

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কাঠামোগত পরিবর্তন, শিল্পনীতি ২০১৬।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। এর পূর্বে বৃটিশ ও পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের অধীনে ছিল যথাক্রমে ১৯০ বছর ও ২৪ বছর। স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

১. শিক্ষার অভাব : উন্নয়নের জন্য প্রধান সহায়ক শক্তি হল শিক্ষা। পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে যেমন- নরওয়ে, জাপান, ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর-এ শিক্ষার হার ১০০%। অন্যদিকে ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে শুধু সাক্ষরতার হার ৬২.৩ শতাংশ। এর মধ্যে মৌলিক শিক্ষার হার এখনো অনেক কম। এ বিষয়টি বোঝা যায়, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বিনয় বা নম্রতা, অন্যের অধিকারকে সম্মান করা এসব গুণাবলি মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে কি-না, তা হতে। এছাড়া, আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষতাও অর্জিত হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে।

২. মূলধনের অপর্যাপ্ততা : যে দেশের মূলধনের মজুদ যত বেশি, সেদেশ তত বেশি শিল্পে সমৃদ্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ দেশ অনেক বেশি অগ্রসর। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব রয়েছে। আর্থিক মূলধন ও দক্ষ মানবীয় মূলধন কোনটিই পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই।

৩. কৃষি ও শিল্পে অনগ্রসরতা : বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কৃষিতে একরপ্রতি কম উৎপাদন হয়। এছাড়া শিল্প ক্ষেত্রেও অন্যান্য দেশ যেভাবে অগ্রসর হয়েছে, সেতুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে।

৪. অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো : যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য মসৃন বা উন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নত নয়। যেমন- রাস্তাঘাট, সেতু, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্দর, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা অনুন্নত। তাই উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৫. জনসংখ্যার চাপ : বাংলাদেশের সীমিত ভূখণ্ডে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ও অবকঠামো সম্প্রসারিত হয়নি। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যাকে দ্রুতগতিতে মানবসম্পদে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক মানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

৬. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব : এদেশের জনগণের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবমুখী কোন পরিকল্পনা অতীতে নেয়া হয়নি। অনেক সময় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পূর্ববর্তী সরকারের নেয়া পরিকল্পনাগুলোকে বাতিল করা হয়। এরফলে সম্পদের অপচয় ও উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়।

৭. প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদের স্বল্পতা ও অপূর্ণ ব্যবহার : বাংলাদেশে কিছু খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। প্রয়োজনীয় মূলধন, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবের কারণে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এখানে সম্ভব হয়নি।

৮. দেশীয় পরিকল্পনাকারীকে অবহেলা : যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য নিজ দেশীয় পরিকল্পনাকারীকে দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ, তারা দেশের বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে। অতীতের সরকারগুলো এদেশের বেশিরভাগ

উন্নয়ন পরিকল্পনা বৈদেশিক দাতা সংস্থার পরামর্শে প্রণয়ন করেছে। এরূপ পরিকল্পনা বাস্তবতার সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় জাতীয় সম্পদের অপচয় হয়।

৯. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বিনিয়োগ, উৎপাদন প্রভৃতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রায় অশান্ত থাকে।

উপরিউক্ত কারণসমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ

বর্তমানে সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিগত এক দশকে দেশে কাঠামোগত অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যেমন-

১. শিক্ষা : সরকার সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন করছে। এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে মানবতার বিকাশ, মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা।

২. কৃষি : দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির সমৃদ্ধির জন্য কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। ১৯৮০-৯০ এর তুলনায় বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণেরও অধিক বেড়েছে।

৩. শিল্প : শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতি ২০১০ এর ধারাবাহিকতায় সরকার শিল্পনীতি ২০১৬ যুগোপযোগী করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে-

(ক) অভ্যন্তরীণ শিল্পপণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, (খ) উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ, (গ) আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস, (ঘ) টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশের উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ, (ঙ) পণ্যবহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং (চ) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একই সাথে সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন। বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করায় বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও, বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকার লক্ষ্যে এ খাতের উন্নয়নে সরকার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশীয় পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নানামুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কর্মসৃজন, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ সর্বোত্তম আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	(ক) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করুন। (খ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কী কী?

সারসংক্ষেপ

- প্রত্যেক দেশই উন্নয়নের চরম অবস্থায় পৌঁছাতে চায়। বাংলাদেশেরও এ লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জন বাংলাদেশের জন্য সহজ নয়, কারণ অনেক প্রতিবন্ধকতা (বাঁধা) রয়েছে। যেমন-

  জনসংখ্যা বহুল দেশ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক, ২. সুশিক্ষার অভাব, ৩. মূলধনের স্বল্পতা, ৪. অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, ৫. কৃষি ও শিল্পে অনগ্রসরতা, ৬. উচ্চ বেকারত্ব, ৭. প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের অপর্যাপ্ততা, ৮. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ৯. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা ও বিলম্ব।
- বর্তমানে সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে- ১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ, ২. শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন, ৩. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, ৪. কৃষির উন্নয়নে গবেষণাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, ৫. দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে দ্রুত শিল্পের উন্নয়ন সাধনের দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান, ৬. প্রাকৃতিক সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ, ৭. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন এবং ৮. স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হল-**

i. সময়োপযোগি শিল্পনীতি বাস্তবায়ন

ii. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন

iii. দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কর্মসৃজন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ হলো-**

(ক) উচ্চ বেকারত্ব (খ) দ্রুত শিল্পের উন্নয়ন সাধন

(গ) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা (ঘ) সুশিক্ষার অভাব

পাঠ-১২.৭ উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি

Economy of Developed, Under Developed and Developing Countries

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- উন্নত দেশ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- অনুন্নত দেশ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন;
- উন্নয়নশীল দেশ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উন্নত দেশ, অনুন্নত দেশ, উন্নয়শীল দেশ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা এবং উন্নয়ন কাঠামোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল দেশের অবস্থান এক সারিতে অবস্থিত নয়। কতগুলো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত অন্যদিকে অনেক দেশে দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, পুষ্টিহীনতা জনগণের নিত্যসঙ্গী। বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরের প্রেক্ষিতে পৃথিবীর দেশসমূহকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা : (ক) উন্নত দেশ, (খ) অনুন্নত দেশ এবং (গ) উন্নয়নশীল দেশ।

(ক) উন্নত দেশ

উন্নত দেশ বলতে স্ব-নির্ভর অর্থনীতি যে দেশে বিরাজমান, সেরূপ দেশকে নির্দেশ করে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন যে, মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশি, প্রকৃত জাতীয় আয় অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমাজের সম্পদের তুলনায় কম, বেকারত্বের হার নগন্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত ভোগ করে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।

উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য : উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

১. আর্থিক কাঠামোগত পরিবর্তন : উন্নত দেশসমূহে আর্থিক কাঠামোগত পরিবর্তন অর্থাৎ ব্যাংক, বীমা প্রভৃতির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যে দেশটি একসময়ে কৃষি নির্ভর ছিলো তা এখন হয়েছে শিল্প নির্ভর।

২. অধিক উৎপাদন ও আয় : উন্নত দেশসমূহ পূঁজি নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করে বিধায় অধিক উৎপাদন হয়। তাই এসকল দেশের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয়ও অধিক হয়।

৩. উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : আমরা জানি, 'Transport is civilization'. অর্থাৎ পরিবহনই সভ্যতা। উন্নত দেশগুলোর এ খাত অনেক উন্নত বিধায় জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার : উন্নত দেশে শিক্ষার হার উচ্চ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক প্রসারের কারণে এর সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। তাই এসকল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে।

উন্নত দেশসমূহে ব্যাপক বা পর্যাপ্ত মূলধন রয়েছে। এসকল দেশ বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে থাকে। এখানে দ্রুত ও বিস্তৃত নগরায়ণ ঘটে। জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক উন্নত এবং বেকার সমস্যার তীব্রতা কম। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশকে উন্নত দেশ বলা যায়।

(খ) অনুন্নত দেশ

যেসব দেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষিনির্ভর, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাব রয়েছে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুন্নত এবং জনগণ নিম্ন জীবনযাত্রার মান ভোগ করে, সেসব দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়।

এদেশে শিক্ষার হার স্বল্প, জনসংখ্যা অধিক, বেকারত্ব অধিক, মূলধন কম, কম উৎপাদন, মাথাপিছু আয়ও কম হয়। অনুন্নত দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব রয়েছে। এখানে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এসব দেশের জনগণ অদক্ষ। অনুন্নত দেশের জনগণ তীব্রভাবে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বর্তমানে ইথিওপিয়া, সিয়েরালিওন, মোজাম্বিক, মালি, আফগানিস্তানকে অনুন্নত দেশের শ্রেণিভূক্ত করা যায়।

(গ) উন্নয়নশীল দেশ

যে সব দেশের জনগণ উন্নত জীবনযাত্রার মানের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, সচেতনভাবে উন্নতির চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, দেশের সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমশ উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে এ সমস্ত দেশের উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়।

এ দেশগুলো এক সময় অনুন্নত ছিল, অর্থনীতি ছিল স্থবির। কিন্তু বর্তমানে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, মোট উৎপাদন প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা অর্জনের চেষ্টা চলছে। মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন হচ্ছে। বিভিন্ন কুসংস্কার হ্রাস পাচ্ছে। এসব দেশে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ছে।

বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তানসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশ উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণিভুক্ত। তবে উন্নয়নশীল সকল দেশের অবস্থান এক সারিতে নেই।

শিক্ষার্থীর কাজ

উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহের তালিকা প্রস্তুত করুন। যেমন-

বিষয়	উন্নত দেশ	অনুন্নত দেশ	উন্নয়নশীল দেশ
শিক্ষা			
মাথাপিছু আয়			

সারসংক্ষেপ

উন্নত দেশ : স্ব-নির্ভর অর্থনীতি যে দেশে বিরাজমান, সেরূপ দেশকে উন্নত দেশ বলে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন যে, মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশি। জাতীয় আয় অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায়, সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম, বেকারত্বের হার নগণ্য এবং জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত।

অনুন্নত দেশ : অনুন্নত দেশ বলতে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশকে নির্দেশ করে। এসব দেশে শিক্ষার হার স্বল্প, মূলধন স্বল্প, মাথাপিছু আয়ও স্বল্প হয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল। জনগণ অদক্ষ হয়।

উন্নয়নশীল দেশ : এ সকল দেশের অর্থনীতি একসময় স্থবির ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে উন্নত জীবনযাত্রার মানের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ সচেতনভাবে উন্নতির চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ফলে শিক্ষার হার, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বাড়ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্ব-নির্ভর অর্থনীতির দেশে-

i. বেকারত্বের হার অধিক

ii. মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেশি

iii. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত ভোগ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। নিম্নের কোনটি উন্নয়নশীল দেশ?

(ক) লুক্সেমবার্গ (খ) সিয়েরালিওন

(গ) মালি (ঘ) নেপাল

৩। নিম্নের কোনটি উন্নত দেশ?

(ক) বেলজিয়াম (খ) মোজাম্বিক

(গ) শ্রীলঙ্কা (ঘ) ভারত

পাঠ-১২.৮ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

Economic Relationship of Bangladesh with Developed and Developing Countries

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)।

উন্নত দেশ বলতে, যে দেশের শিক্ষার হার অধিক, মূলধন অধিক, শিল্প নির্ভর, উৎপাদন অধিক, জাতীয় আয় অধিক, মাথাপিছু আয় অধিক, কুসংস্কার মুক্ত এবং উন্নত জীবনযাত্রা ভোগ করে, সেসব দেশকে বোঝায়। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশ বলতে, যে সব দেশ একসময় কৃষি নির্ভর ছিল, মূলধন স্বল্প, শিক্ষার হার কম, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান কম ছিল, কিন্তু বর্তমানে-শিল্পে অগ্রসর হচ্ছে, মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষার হার বাড়ছে, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে-সেসব দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থবির নয়, গতিশীল।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নশীল দেশের অনুরূপ। গত শতাব্দীর ৮০ ও ৯০ দশকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আজকের বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঐ সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষার হার স্বল্প, বেকারত্ব অধিক, উৎপাদন স্বল্প, আমদানি অধিক, রপ্তানি কম ছিল। জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ও কম ছিল। অধিকাংশ মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল বন্যা ও অভাবগ্রস্ত দেশ। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ অন্যরকম। উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান বাংলাদেশ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে অভাবনিয় উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীখাত, সেবা খাত, শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতে প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ আসছে। জাপান, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত,মালয়েশিয়াসহ অনেক বন্ধুপ্রতিম দেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা (প্রকল্প ও অর্থ সহায়তা) পাচ্ছে।

সারণি : ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) এর পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) :

উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	
জাপান	২.০
হংকং	৭০.৫
যুক্তরাজ্য	০.৮
জার্মানী	২.০
সিংগাপুর	০.২
দক্ষিণ কোরিয়া	১.৪
চীন	০.৫
গ্রীস	৭.৪
নেদারল্যান্ড	৬.০

উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	
ভারত	০.৫

উক্ত বছরে মোট প্রাপ্ত FDI ছিল ৯২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

সূত্র : অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ৫৪

শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করছে। এ ধারাবাহিকতায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ হতে ক্রমাগত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন-

সারণি : বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০১-২০১৫ (মিলিয়ন মা. ডলার)

বছর	২০০১	২০০৪	২০০৭	২০১১	২০১৩	২০১৪	২০১৫ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)
FDI	৩৫৫	৪৬০	৬৬৬	১১৩৬	১৫৯৯	১৫২৭	২২৩৫

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৬), পৃষ্ঠা ২১৮

সূত্র : এন্টারপ্রাইজ সার্ভে, বাংলাদেশ ব্যাংক

বর্তমান সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পাশাপাশি যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাও বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নত দেশ/অঞ্চলসমূহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, চীন, জাপান, ডেনমার্ক, কানাডা, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক, ইতালী, হংকং, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা, লেবানন, নাইজেরিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে দক্ষ, স্বল্প দক্ষ এমনকি অদক্ষ শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে। ক্রমাগত বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ। ১৯৮৫-৮৬ সালে এ খাত হতে বাংলাদেশে এসেছে ৫৫৫.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫,৩১৬.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের জনশক্তির ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে কর্মসংস্থান হচ্ছে।

এছাড়া, তৈরী পোশাক শিল্পে উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাজারে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য এবং বাংলাদেশী সফট্ওয়্যার এর বাজারও উল্লিখিত দেশসমূহে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের রয়েছে-'ভূ-রাজনৈতিক' সুবিধা। বাংলাদেশের দু'পাশে রয়েছে অর্থনৈতিক দু পরাশক্তি-চীন ও ভারত। রয়েছে সমুদ্র বন্দর, গভীর সমুদ্রে আসা-যাওয়ার উন্মুক্ত পথ, বিমান বন্দর, উন্নত সড়ক যোগাযোগ এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ।

এসকল কারণে বাংলাদেশের 'ভূ-খণ্ড' অনেক বেশি আকর্ষণীয় উন্নত দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া এবং জাপানের নিকট। আবার উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারত, মালয়েশিয়া এবং আরব বিশ্বের সাথেও বাংলাদেশের সুগভীর উন্নয়ন সম্পর্ক বিরাজ করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক কিরূপ বলে মনে করেন? মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- বর্তমানে কোনো দেশ এককভাবে 'একলা চলো নীতি' অনুসরণ করে চলতে পারে না। একইভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বাংলাদেশ হতে কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পের মধ্যে তৈরী পোশাক অধিক আমদানি করলেও বাংলাদেশ উন্নত দেশসমূহ হতে মূলধন দ্রব্য, প্রকল্প, প্রযুক্তি ও পরামর্শক আমদানি বা সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এসকল দেশ হতে প্রয়োজনে খাদ্য সাহায্যও গ্রহণ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। উন্নত দেশ বাংলাদেশ হতে কী আমদানি করে?

(ক) মূলধন দ্রব্য (খ) প্রকল্প (গ) প্রযুক্তি (ঘ) কৃষিজাত দ্রব্য

২। বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা পাচ্ছে নিম্নোক্ত দেশসমূহ হতে-

i. জাপান
ii. মায়ানমার
iii. চীন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

২০১৬ সালে 'A' দেশের জনগণের মোট ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা এবং বিনিয়োগ ব্যয়৩০০ কোটি টাকা। দেশটির সরকার জনগণের কল্যাণে আরও ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করেন। এছাড়া আমদানি দ্রব্যের মূল্য বাবদ দেশটি ৬০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেন এবং রপ্তানি বাবদ ৩৫০ কোটি টাকা আয় করেন। 'B' দেশের বাসিন্দা মি. 'X' উচ্চ বেতনে 'A' দেশের একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তিনি প্রতি বছর তাঁর পরিবারের জন্য নিজ দেশে টাকা প্রেরণ করেন।

(ক) উন্নত দেশ কাকে বলে? ১
(খ) অনুন্নত দেশের উন্নয়নে 'শিক্ষা' কীভাবে সহায়তা করে? ২
(গ) তিন খাত বিশিষ্ট বদ্ধ অর্থনীতিতে ২০১৬ সালে মোট দেশজ উৎপাদন কত তা উদ্দীপকের আলোকে নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) মি. X এর অর্জিত আয় 'A' দেশ ও 'B' দেশের GDP কে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

X দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান সবকিছু অধিক হলেও Y দেশের জনগণের শিক্ষার হার, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান পূর্বে অনেক কম ছিল কিন্তু বর্তমানে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। Y দেশ হতে X দেশ কৃষিজাত দ্রব্য আমদানি করলেও Y দেশ X দেশ হতে বিভিন্ন প্রকল্প সাহায্য, মূলধন দ্রব্য, প্রযুক্তি ও পরামর্শক সাহায্য গ্রহণ করছে।

(ক) প্রত্যক্ষ কর কাকে বলে? ১
(খ) 'বেসরকারিকরণ' বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২
(গ) উদ্দীপকে কোনটি উন্নত দেশ তার ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত দেশসমূহের মধ্যে কোনটির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির মিল রয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৪

উত্তরমালা :

পাঠ- ১২.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ক
পাঠ- ১২.২ : ১। ঘ ২। গ
পাঠ- ১২.৩ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ
পাঠ- ১২.৪ : ১। ক ২। ক
পাঠ- ১২.৫ : ১। ঘ ২। গ
পাঠ- ১২.৬ : ১। ঘ ২। খ
পাঠ- ১২.৭ : ১। গ ২। ঘ ৩। ক
পাঠ- ১২.৮ : ১। ঘ ২। খ

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

Money and Banking System of Bangladesh Government

ইউনিট ১৩

ভূমিকা : মানব সভ্যতার ইতিহাসের বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়নে। অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা এ পথে এক বিস্ময়কর সংযোজন। অতীতে দ্রব্য-কড়ি বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও ক্রমবিবর্তনে মানুষের চলার পথকে সহজ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৩.১ : সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ও বাংলাদেশ সরকারের আয়-ব্যয়
পাঠ-১৩.২ : বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা
পাঠ-১৩.৩ : বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী
পাঠ-১৩.৪ : দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা

পাঠ-১৩.১ সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ও বাংলাশে সরকারের আয়-ব্যয়

Conception of Public Finance and Income-Expenditure of Bangladesh Government

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সরকারি অর্থব্যবস্থা, কর রাজস্ব, কর-বহির্ভূত রাজস্ব।

সরকারি অর্থব্যবস্থা

সরকারি অর্থব্যবস্থা অর্থনীতি শাস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য সরকারের যেমন আয়ের খাত থাকে তেমনি ব্যয়ের খাত বা লক্ষ্য থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী, তাই সরকারকে ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়ের সামঞ্জস্য বিধান, সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে নানারূপ রাজস্ব উপকরণ-কর, সঞ্চয়, বিনিয়োগ নিয়ে চিন্তা করতে হয়। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন দ্বারা সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সরকারি অর্থব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূলত স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং এ ব্যয় কীভাবে, কোন নীতিতে, কোন উৎস হতে সম্পদ আহরণ করে করা হবে; এতে জনগণের জীবনমানের কী পরিবর্তন হবে, জনগণের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য কী ধরনের বিনিয়োগ এবং কে করবে; তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

অধ্যাপক টেইলর (Philip E. Taylor) বলেন, সরকারের অধীনে সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে জনসাধারণের যাবতীয় আর্থিক সমস্যা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আর এ মাসগ্রেইভ বলেন, 'যেসব জটিল সমস্যা সরকারি আয়-ব্যয় প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।'

অতএব, অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়-ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা ও এদের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance) বলা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত

সরকার কোন কোন উৎস থেকে কত আয় করবে এবং কোন খাতে কত ব্যয় করবে, এর সমন্বিত রূপকে সরকারি আয়-ব্যয় বলে। সরকারের রাজস্ব নীতিতে সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত থাকে।

সরকারি আয়

জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন উৎস যেমন : সরকারের প্রাপ্ত রাজস্ব, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, কর ও ঋণ, টাকা ছাপানো এবং অনুদান ও দান প্রভৃতি থেকে যে আয় বা সামগ্রিক অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে, তাকে সরকারি আয় বলা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ হল **(ক)** রাজস্ব কর-যেমন : আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (VAT), আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, অন্যান্য কর ও শুল্ক (আমোদ প্রমোদ কর, ভ্রমন কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর শুল্ক), মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বিদ্যুৎ শুল্ক এবং রেজিস্ট্রেশন ও **(খ)** কর বহির্ভূত রাজস্ব-যেমন : সরকারি প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা; সুদ; সাধারণ প্রশাসন; পর্যটন, ব্যাংকিং ও ভ্রমণে অর্থনৈতিক সেবা; ভাড়া ও ইজারা, টোল ও লেভী; অবাণিজ্যিক বিক্রয়; রেলওয়ে; ডাকবিভাগ; তার ও টেলিফোন; বন এবং জরিমানা, দণ্ড ও

বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো মূল্য সংযোজন কর (VAT) এবং আয়কর।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ-ব্যয় অপরিহার্য্য। সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় (i) গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে ব্যয় বরাদ্দ, (ii) বেসরকারি খাতের উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যয়, (iii) জনকল্যাণমুখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়, (iv) সরকারি খাতের ব্যয়ে কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং (v) অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অধিকতর কর্মসংস্থান, জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	(ক) বাংলাদেশ সরকারের আয়ের খাতসমূহ কী কী? (খ) বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ কী কী-এ সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়-ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা ও এদের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলা হয়।
- জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় বা সামগ্রিক অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে, তাকে সরকারি আয় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **বাংলাদেশ সরকারের আয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত কোনটি?**

(ক) আয়কর (খ) আমদানি শুল্ক (গ) সুদ (ঘ) টোল ও লেভী

২। **সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার খাত হলো-**

i. অবকাঠামো খাতে ব্যয় বরাদ্দ

ii. বেসরকারি খাতে উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যয়

iii. জনকল্যানমূখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। **সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত বিষয় হলো রাষ্ট্রীয়-**

i. আয় ও ব্যয়

ii. ঋণ ও বিনিয়োগ

iii. স্বকর্মসংস্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.২ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা
Banking System of Bangldesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, সুদ বিহীন ব্যাংক।

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক ‘শান্সী ব্যাংক’ (Shansi Bank) এবং ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক ‘ব্যাংক অব ভেনিস’ (Bank of Venice) স্থাপন করা হয়। (উৎস : NCTB অনুমোদিত : অর্থনীতি প্রথম পত্র (XI-XII শ্রেণি) ২০১৩; রণজিত কুমার নাথ, পৃষ্ঠা- ২২০)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ‘বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ (১২৭ নং আদেশ)-এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক ‘স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান’ এর সকল সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল হতে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক হল বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রত্যেক দেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং দেশের বিভিন্ন অনুন্নত ও পল্লী এলাকায় প্রয়োজন অনুসারে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক এর শাখা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখছে।

এছাড়া, বাংলাদেশে রয়েছে-বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং সুদ বিহীন ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এরূপ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ-আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং অপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চাহিদা অনুসারে ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। যেমন-সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রূপালী ব্যাংক লিঃ, আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি।

আবার, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়-তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে। যেমন- কৃষি উন্নয়নে ‘বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক’, শিল্প উন্নয়নে ‘বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ’, গৃহ নির্মাণে ‘বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন’, শিক্ষিত বেকারদের জন্য এবং বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রভৃতি।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক শস্য উৎপাদন, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়, উদ্যান উন্নয়ন, বন উন্নয়ন ও মৎস্য চাষের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও যৌথ সংস্থাসমূহকে ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক যদিও ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে উহার কার্যক্রম গ্রহণ করে তথাপি কৃষি উন্নয়ন, গ্রামে ও শহরে কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন শিল্প স্থাপন করা এবং বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা। দেশে শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিল্প ঋণের যোগান এবং শিল্প সংক্রান্ত পরামর্শদানের মাধ্যমে দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা আবাসিক বাড়ি নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত বাড়ির রি-মডেলিং বা কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদান করে আসছে।

এছাড়া বাংলাদেশে আরও এক প্রকার ব্যাংক রয়েছে। সুদ-বিহীন ব্যাংক। এটি ইসলামি ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে হালাল ও হারামের বিধান প্রচলিত রয়েছে। এ ব্যাংকে যারা আমানত জমা রাখে তাদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। সুদ নয়, লাভ-লোকসান গ্রহণে যারা ইচ্ছুক, তারাই এ ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে জড়িত হতে পারে।

ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক। ২৮ মার্চ, ১৯৮৩ইং তারিখ হতে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ ব্যাংক সম্পূর্ণ সুদমুক্ত হালাল রোজগার ও হালাল বিনিয়োগের ব্যাপারে জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এরূপ একটি সংস্থা যেটি দেশে মুদ্রার প্রচলন, ঋণের যোগান ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের পক্ষে দেশে ও বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, সরকারকে মুদ্রা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কাজের একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ স্বল্প সুদে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ বা উদ্যোক্তাকে তুলনামূলক অধিক সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ব্যাংককে সকল ব্যাংকের ব্যাংক বলা হয়?

(ক) বাণিজ্যিক (খ) বিশেষায়িত

(গ) ইসলামি (ঘ) কেন্দ্রীয়

২। কোনটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক?

(ক) সোনালী ব্যাংক লিঃ (খ) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক (ঘ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

৩। নিম্নের কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক?

(ক) জনতা ব্যাংক লিঃ (খ) রূপালী ব্যাংক লিঃ

(গ) ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ (ঘ) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ

পাঠ-১৩.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

Functions of Bangladesh Bank and Commercial Bank

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, নোট প্রচলন, বিনিময় হার, আমানত গ্রহণ, ঋণদান।

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থার নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংকও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে থাকে। যেমন-

১. নোট প্রচলন : বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করা। দেশের অভ্যন্তরে নোট চালু করার একচেটিয়া অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া এ ব্যাংক মুদ্রাও স্বর্ণমান নির্ধারণ করে দেয়।

২. শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা : বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান ব্যাংকসমূহের সেবার মান উন্নীতকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সংগঠক, নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।

৩. সরকারের ব্যাংক : বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা পড়ে এবং সরকারি ঋণের হিসাব নিকাশ পরিচালনা করে ও প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ দেয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নীতি যেমন-ঘাটতি ব্যয়, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক বিনিময় হার নীতি, বাণিজ্যনীতি-এসব বিষয়ে পরামর্শদাতারূপে কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের তহবিল ও সম্পদ বিনা সুদে তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করে। এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় এবং বিভিন্ন উৎসে সরকারের দেনাও পরিশোধ করে।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক : বাংলাদেশ ব্যাংক এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংককে তাদের মোট আমানতের শতকরা ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণদান, এদের নগদ জমা সংরক্ষণসহ প্রভৃতি কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পাদন করে। এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ তদারকি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, হিসাব নিরীক্ষণ প্রভৃতি কাজও করে থাকে।

এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে চেক আদান প্রদানের ফলে যে দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়-তার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিকাশ ঘর হিসেবেও ভূমিকা রাখে।

৫. বিনিময় হার ও মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদেশের বিনিময় হার ঠিক রাখা এ ব্যাংকের অন্যতম কাজ। এ ব্যাংক দেশে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং বাণিজ্যচক্র রোধেও সদা সচেষ্ট থাকে।

৬. প্রতিনিধি : বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক, ব্রিকস্ ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে, জাতীয় বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নেও কাজ করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

আধুনিকযুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকা পালনার্থে বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব কাজ সম্পাদন করে থাকে তা হলো :

১. আমানত গ্রহণ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত গ্রহণ। এ আমানত সাধারণত তিন প্রকার। যথা- (ক) চলতি আমানত, (খ) সঞ্চয়ী আমানত ও (গ) স্থায়ী আমানত। চলতি আমানতের টাকা চাওয়া মাত্র আমানতকারীকে ফেরৎ দিতে হয়। এ আমানতের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। সঞ্চয়ী আমানতে একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে টাকা আমানতকারী তুলে নিতে পারে এবং কিছু সুদ পায়। স্থায়ী আমানতে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে টাকা উঠানো যায় না। স্থায়ী আমানতে সুদের হার সঞ্চয়ী আমানতের চেয়ে বেশি।

২. ঋণদান : যথোপযুক্ত বন্ধকির মাধ্যমে গ্রাহককে ঋণদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ। এ ঋণের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে।

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি : বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুণ্ডি প্রভৃতি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

৪. মূলধন গঠন : বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান একটি কাজ হলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মূলধন গঠন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

৫. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা : দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর অর্থের যোগান দেয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য একই সাথে ভালো পরামর্শ দেয়। এ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, হুণ্ডি বাট্টাকরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কল্যাণ সাধনে একস্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ করে, জনসাধারণের বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে, জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে ভ্রমণে সহায়তা করে। বর্তমানকালে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশে অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। নোট প্রচলন, দেশে শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলন, সরকারের ব্যাংক হিসেবে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক যদিও জনগণের আমানতের টাকায় ব্যবসা পরিচালনা করে, তথাপি দেশে মূলধন গঠন, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা প্রদানে এ ব্যাংক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ?

(ক) আমানত গ্রহণ
(খ) গ্রাহককে ঋণদান
(গ) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি
(ঘ) মুদ্রা প্রচলন

২। কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ?

(ক) সরকারের ব্যাংক হিসেবে
(খ) আমানত গ্রহণ
(গ) শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা
(ঘ) সকল ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে

*** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রহিম প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখে। বছরের শেষে তার মোট জমার সাথে ব্যাংক কিছু অতিরিক্ত টাকা তার হিসেবে জমা করে।

৩। ব্যাংকটি কোন ধরনের?

i. কেন্দ্রীয়
ii. বাণিজ্যিক
iii. গ্রামীণ ব্যাংক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i
(খ) ii
(গ) iii
(ঘ) i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকে ব্যাংকটির অন্যতম কাজ হচ্ছে-

(ক) ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
(খ) নোট প্রচলন করা
(গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ
(ঘ) ঋণ আদান-প্রদান করা

পাঠ-১৩.৪ দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা

Role of Different Banks in Poverty Alleviation and Self-Employment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দারিদ্র বিমোচন, স্বকর্ম সংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি।

দারিদ্র্য বিমোচন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ এবং একই সাথে সামাজিক উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচেনের সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ যা ২০১৫ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৮ শতাংশে। বাংলাদেশে প্রতিবছর দারিদ্র্য হার ১.৭৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে।*

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্প সুদে কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, বাণিজ্যিক ব্যাংক মধ্যস্বত্বভোগী একটি ব্যবসায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংক নিরলস সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠন অপরিহার্য এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এ ব্যাংক অলসভাবে পড়ে থাকা জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে বিভিন্ন উৎপাদনকাজে বিনিয়োগ করতে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণেও ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপরিউক্ত কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হয়। কারণ এ ব্যাংকের কার্যক্রমের দ্বারা দেশে অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, বাণিজ্যিক ব্যাংক স্ব-কর্মসংস্থানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ ও পরামর্শ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এর ফলে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্ব-উদ্যোগে হাঁস-মুরগির খামার, পশু পালন খামার, সবজি উৎপাদন, নার্সারি স্থাপন, বনায়ন প্রভৃতি কাজ করার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানে উদ্যোগী হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি : তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

* অর্থ মন্ত্রণালয় (২০১৬), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২১৪

সারণি : দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।

ব্যাংকের নাম	সুবিধাভোগীর সংখ্যা		
	মহিলা	পুরুষ	মোট
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৬৪০,৬৮২	৩৫৭,২৭৬	৯৯৭,৯৫৮
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭৮	২,৭৫৯	২,৯৩৭
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২,৩০৮	৪০,২৭২	৪২,৫৮০
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৭৪৮,৩৭০	১৯৮,৯৩৫	৯৪৭,৩০৫
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১,০৫৪	১৯,১৫৫	২০,২০৯
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৩৩২,৯৯৩	৯২,৬২৮	৪২৫,৬২১
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৮২৬	১১,৫৬৮	১২,৩৯৪
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৩৬,৯০৩	১৪,৮৪০	১৫১,৭৪৩
মোট	১,৮৬৩,৩১৪	৭,৩৭,৪৩৩	২,৬০০,৭৪৭

উৎস : সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

এছাড়া, গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৭২টি উপজেলার আওতাধীন ৮১,৩৯২টি গ্রামে ৮৮.০৭ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.৫১ ভাগ মহিলা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধন গঠন, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন সাধনসহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং স্বকর্মসংস্থানে ব্যাপকভাবে অবদান রাখছে।

সারসংক্ষেপ

- দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে এখাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশে শক্তিশালী ব্যাংকিং খাত গঠনের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
- এছাড়া স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করে। এরফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অত্যন্ত সফল এবং ‘রোলমডেল’ হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হল :

i. হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন

ii. নার্সারি স্থাপন

iii. বনায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনেনর সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে-

i. সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ii. বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ

iii. সামাজিক উদ্যোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা :

পাঠ- ১৩.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। ক

পাঠ- ১৩.২ : ১। ঘ ২। গ ৩। গ

পাঠ- ১৩.৩ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ঘ

পাঠ- ১৩.৪ : ১। ঘ ২। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

‘সত্য’ সদ্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি পান যা দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। সত্যর বন্ধু নিরবও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যারা জনগণের অর্থ আমানত রাখে ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

(ক) সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

(খ) আয়কর সরকারি আয়ের উৎস কী না? বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে সত্যর প্রতিষ্ঠানের তিনটি প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে ‘সত্য’ ও ‘নিরব’ এর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? তোমার মতামত দাও। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

X দেশটি দরিদ্র জনবহুল দেশ। দেশের জনগণের শিক্ষার হার নিম্ন, মাথাপিছু আয় স্বল্প, বেকারত্বের হার তীব্র এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থবির। উক্ত দেশের সরকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয় কর, মূল্য সংযোজন কর, রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, সুদের হার, টোল, লেভী, জরিমানা প্রভৃতি খাত সম্প্রসারণ করেন। সরকার প্রাপ্ত রাজস্ব অবকাঠামো উন্নয়ন, জনকল্যানমুখী সামাজিক নিরাপত্তামূলক খাতে ব্যয় ছাড়াও ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার দ্বারা হাঁস-মুরগির খামার, পশু পালন খামার, নার্সারি স্থাপন প্রভৃতির সাহায্যে স্ব-কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে বেকারত্ব কমেছে, জনগণের মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের X দেশের এরূপ সফলতার অভিজ্ঞা পরবর্তীতে Y দেশসহ অনেকে বাস্তবায়ন করছে।

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি? ১

(খ) জনগণের আমানতই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলধন বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপক হতে ‘সরকারি অর্থব্যবস্থার’ খাতসমূহ চিহ্নিত কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপক হতে X দেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন কর। ৪

সামাজিক পরিবর্তন
Social Change

ইউনিট ১৪

ভূমিকা : সমাজ একটি প্রবহমান নদীর মত। প্রতি মুহূর্তে এটি ছুটে চলে। এ ছুটে চলার মধ্য দিয়েই সমাজ পরিবর্তিত হয়। সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে সমাজ আজকের অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। আজকের এ আধুনিক সমাজ মূলত অনিবার্য পরিবর্তনের ফসল। বস্তুত আদি হতে আজ পর্যন্ত সমাজ গতিশীল রয়েছে নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কোনো সমাজই স্থির নয়, বরং গতিশীল। তাই বলা হয়ে থাকে, মানব সমাজের ইতিহাস হচ্ছে পরিবর্তনের ইতিহাস। পরিবর্তন প্রতিটি সমাজের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। তবে সামাজিক পরিবর্তনের গতি সব সমাজে এক নয়। আদিম সমাজের পরিবর্তনের সাথে আধুনিক সমাজের পরিবর্তনের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আবার শিল্পায়িত নগর সমাজে যত দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব গ্রামীণ কৃষি সমাজে তা সম্ভব নয়। উন্নত সমাজে পরিবর্তনের গতি অনেক বেশি। কিন্তু নিরক্ষর বা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের গতি অনেক মন্থর। তবে পরিবর্তন হয় না এমন কোনো সমাজ নেই। এ ইউনিটে সামাজিক পরিবর্তন, এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৪.১ : সামাজিক পরিবর্তন
পাঠ-১৪.২ : সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ
পাঠ-১৪.৩ : সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব

পাঠ-১৪.১ সামাজিক পরিবর্তন
Social Change

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক পরিবর্তন।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

কোনো সমাজই স্থির নয়, বরং গতিশীল। গতিশীলতার মধ্য দিয়েই সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। সামাজিক পরিবর্তন বলতে বুঝায় সমাজের একটি বিদ্যমান অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় পদার্পণ। সামাজিক পরিবর্তনের গতি সব সমাজে সমান নয়। তবে যে কোনো সমাজে পরিবর্তনের ছোঁয়া সব সময়ই অব্যাহত থাকে। সমাজের কাঠামো এবং বিভিন্ন উপাদান পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবার, কৃষি অর্থনীতির স্থানে শিল্প ও সেবা নির্ভর অকৃষি অর্থনীতি, স্বল্প শিক্ষার স্থানে ব্যাপকহারে উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠী।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা (Definition of Social Change)

পরিবর্তন হচ্ছে কোনো কিছু বদলে ফেলা, নতুনকে গ্রহণ করা। সাধারণত পুরাতন বা বিদ্যমান অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় উপনীত হওয়াকে পরিবর্তন বলে। সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সনাতন বা ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি বাদ দিয়ে আধুনিক ও সময়োপযোগী রীতিনীতি গ্রহণ ও চর্চা করা। অর্থাৎ কোনো সমাজের অধিকাংশ সদস্য যদি তাদের কিংবা তাদের পূর্বপুরুষের কর্মপন্থা ত্যাগ করে নতুন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয় তবে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। যেমন সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদের পরিবর্তে প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে অভ্যস্ত হওয়া, ব্যাপক হারে নারী শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তনের উদাহরণ।

গার্থ ও মিল (Girth and Mill) বলেছেন, সামাজিক পরিবর্তন কথাটি দ্বারা আমরা একটি সামাজিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা, আচার-ব্যবস্থায় সময়ভেদে সংঘটিত বিবর্তনের উদ্ভব, বিকাশ ও অবলুপ্তি বুঝিয়ে থাকি। (By social change we refer it whatever may happen in the course of time to the roles, the institutions or the orders comprising a social structure their emergence, growth and decline.) এ সংজ্ঞার আলোকে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে, সমাজ কাঠামো বা সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার রদবদল, একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **কিংসলে ডেভিস** *(K. Davis)* বলেছেন, সামাজিক পরিবর্তন বলতে বুঝায়, সামাজিক সংগঠন, সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংঘটিত বিকল্পসমূহ। (By social change is meant only such alternations as a occur in social organization that is the structure and function of society.) ডেভিসের মতে, সামাজিক পরিবর্তন সমাজ কাঠামোর সাথে যেমন সম্পৃক্ত, তেমনি সমাজের সংস্কৃতির সাথেও এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তিনি মনে করেন, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শনসহ সংস্কৃতির যেকোনো শাখাই সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত বা প্রভাবিত করতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী **জিন্সবার্গও** *(M. Ginsberg)* সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন (By social change I understand change in social structure.) তাঁর মতে, সমাজ মূলত দু'ভাবে এর পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। প্রথমত, সামাজিক কাঠামো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, যেসব আদর্শ, মূল্যবোধ এবং বিধিবিধান সামাজিক কাঠামোকে সংহত করে এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে সেগুলোর পরিবর্তন।

বস্তুত সামাজিক পরিবর্তন সমাজের অধিকাংশ মানুষ, তাদের জীবন-জীবিকা, মূল্যবোধ, আচরণবিধি, কার্যক্রম এমনকি রুচি,

মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত করে। তাই এ পরিবর্তন সামাজিক কাঠামোকে যেমন স্পর্শ করে, তেমনি সামাজিক আচার-প্রথা, রীতিনীতি তথা সংস্কৃতিকেও স্পর্শ করে। তবে ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন নয়। যদিও এসব পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক পরিবর্তন বলতে যা বুঝায় তা হল:

১. মানুষের জীবন প্রণালীর পরিবর্তন;
২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাঠামোগত এবং ক্রিয়াগত পরিবর্তন;
৩. উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন;
৪. সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন;
৫. মূল্যবোধের পরিবর্তন।

সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজ কাঠামোগত তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংঘ, সমিতি এবং সংস্কৃতি, আচার-প্রথা, মূল্যবোধ, জীবন যাপন প্রণালীর ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন। এ পরিবর্তন ইতিবাচক হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ **সময় : ৫ মিনিট**	নিচের তালিকা থেকে টিক চিহ্নের (√) মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করুন ।

১) জলবায়ুর পরিবর্তন	২) পেশাগত পরির্বিতন	৩) শিক্ষার হার বৃদ্ধি	৪) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
৫) নদীর নাব্যতা সংকট	৬) যানজট	৭) জনসংখ্যা বৃদ্ধি	৮) সামাজিক বনায়ন
৯) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ		১০) সচেতনতা বৃদ্ধি	১১) গণতন্ত্র

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের ফল। আদিম গুহাবাসী মানুষ পরিবর্তনের মাধ্যমে আজ উন্নত নগর-জীবনের অধিকারী। শিক্ষা, পেশা, সামাজিক সম্পর্ক, রীতিনীতি, আইন-কানুন প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষ সামাজিক পরিবর্তনকে আরো ত্বরান্বিত করছে। কৃষি থেকে শিল্প, শিল্প থেকে সেবাখাতের বিস্তার হচ্ছে। যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারও অনিবার্য সামাজিক পরিবর্তনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহই সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন" কে বলেছেন?
(ক) কিংসলে ডেভিস (খ) মরিস জিন্সবার্গ
(গ) গার্থ ও মিলস (ঘ) নাজমুল করিম

২। কার মতে, সামাজিক পরিবর্তন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথেও সম্পর্কিত?
(ক) কিংসলে ডেভিস (খ) মরিস জিন্সবার্গ
(গ) গার্থ ও মিলস (ঘ) নাজমুল করিম

পাঠ-১৪.২ সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ
Causes of Social Change

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক পরিবর্তনের কারণ।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

পরিবর্তনশীলতা সমাজের অনিবার্য এক বাস্তবতা। কিন্তু কোনো সমাজই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয় না। পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। যেমন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে সমাজ উন্নত হয়। এখানে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষা। দরিদ্রতা শিক্ষা অর্জনের বড় বাধা। আবার নিরক্ষরতা দরিদ্র্যতা বৃদ্ধি করে। বস্তুত এরূপ নানা কারণ ও আন্তঃসম্পর্কের ফলেই সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ (Causes of Social Change)

সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের রূপান্তর বা রদবদল। সমাজের এ পরিবর্তন, রূপান্তর বা রদবদলের কতগুলো কারণ রয়েছে। যেমন :

১. ভৌগোলিক কারণ: ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। ভৌগোলিক ও জলবায়ুর পরিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন- কোনো নদী শুকিয়ে গেলে এর তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের পেশা পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। নদী ভাঙন বা ক্রমবর্ধমান জলবায়ুর পরির্তন নগর-স্থানান্তরকে (Urban Migration) উৎসাহিত করে।

২. আন্দোলন: সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে আন্দোলন বা বিপ্লব। সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহের প্রচলন, নারী শিক্ষা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বিলোপ ইত্যাদি সংস্কার সাধিত হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রেণি ও সামাজিক স্তররবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন করেছে। গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, নারীর সমতা (জেন্ডার), পরিবেশ, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলন মানুষকে অধিকার সচেতন করে যা সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে।

৩. উৎপাদন ব্যবস্থা: দীর্ঘমেয়াদে সমাজের দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধনে উৎপাদন ব্যবস্থার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। দাস নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা হতে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের মাধ্যমে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। একইভাবে সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের মাধ্যমেও সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শিল্পোৎপাদন এবং সেবাখাত নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য। কোনো সমাজে ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন হলে সেখানে নগরায়ন ত্বরান্বিত হয়। ফলে সমাজ সনাতন ব্যবস্থা থেকে আধুনিকায়নের দিকে অগ্রসর হয়।

৪. শিক্ষা: সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। অজ্ঞতা, অন্ধত্ব, কুসংস্কার ইত্যাদি হতে মুক্তি দিয়ে শিক্ষাই মানুষকে সমাজোপযোগী করে তোলে। এ জন্য শিক্ষা সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম। শিক্ষা একটা সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে পারে। শিক্ষা মানুষের পেশা, রুচি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ এবং আর্থিক সক্ষমতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

৫. সরকার ও রাজনীতি: সামাজিক পরিবর্তনে সরকার ও রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি প্রত্যয়। ভারতীয় সামাজিক পরিবর্তনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে ক্ষমতাসীন

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা ধর্মীয় মৌলবাদ, প্রগতিশীলতা কিংবা সাম্পদায়িকতা সমাজকেও ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। গণতান্ত্রিক সরকার এবং সামরিক সরকারের শাসনামলে সমাজে অনেক পার্থক্য ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় মৌলবাদী আদর্শের রক্ষণশীল সরকার ও প্রগতিশীল সরকারের শাসনামলেও সমাজের স্বাতন্ত্র্য ধারার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

৬. ধর্মীয় চেতনা: ধর্মীয় চেতনার যৌক্তিকতার বিকাশ সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক। সমাজে যখন নানারকম অনাচার, অসামাজিকতা বৃদ্ধি পায় তখন ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শ সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে। মুহাম্মদ (সা), যীশুখ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটনে সক্ষম হয়েছিলেন।

৭. প্রচার-প্রচারণা: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হলে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদেশী পণ্য বর্জন করে দেশীয়পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার ব্রিটিশ ভারতের সমাজে দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছিল। বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়ে বহুমুখী প্রচারণার ফলে সমাজের নেতৃত্ব, ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রচারণাও সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে।

৮. গণমাধ্যম: আধুনিক সমাজের অনিবার্য উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম। পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, বেতার, ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল ফোন প্রভৃতি বিরাট সংখ্যক মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম। সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যম জনমত গঠন এবং সামাজিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গণমাধ্যম পরিবর্তন আনয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

৯. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা: যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বশর্ত বলা যেতে পারে। ভাষাগত কিংবা অবকাঠামোগত যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন খুব অনুন্নত ছিল তখন সমাজও ছিল বদ্ধ, স্থির এবং অনগ্রসর। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হয়েছে সামাজিক পরিবর্তনও তত দ্রুততর হয়েছে। গ্রামের সাথে শহরের সড়ক, রেল বা জলপথের যোগাযোগ নিশ্চিত হলে গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হতে বাধ্য। উত্তরবঙ্গে মঙ্গা নিরসনে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে।

১০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন: ঐতিহ্যবাহী সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান সর্বাধিক। বাষ্পীয় ইঞ্জিন থেকে আজকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রেণি, পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজের পরিবর্তন যেমন অনিবার্য, শ্বাশ্বত, তেমনি কাঙ্ক্ষিততও। তবে এ পরিবর্তন আপনা-আপনি হয় না। পরিবর্তনের পিছনের কিছু কারণ সক্রিয় থাকে। ভৌগোলিক কারণে যেমন সামাজিক পরিবর্তন হয়, তেমনি অর্থনৈতিক (উৎপাদন ব্যবস্থা), রাজনৈতিক (সরকার, দল, আদর্শ), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণেও সমাজের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। প্রযুক্তির বিপ্লব ও ব্যবহার সমাজের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। গণমাধ্যম, প্রচারণা এমনকি আধুনিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়?

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (খ) জলবায়ুর পরিবর্তন

(গ) উৎপাদন ব্যবস্থা (ঘ) খ ও গ উভয়

২। সামাজিক পরিবর্তনের আধুনিক উপাদান কোনটি?

(ক) শিক্ষা (খ) আন্দোলন

(গ) গণমাধ্যম (ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পাঠ-১৪.৩ সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব
Impact of Social Change

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

নানা কারণে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এদিক থেকে সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যয়টি নিজেই বিভিন্ন কারণ বা ঘটনার ফল বা প্রভাব। যেমন আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফল বা প্রভাব হচ্ছে মানুষের ভাবনার জগতে পরিবর্তন যা সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সামাজিক পরিবর্তন একটি ব্যাপক প্রত্যয়। সামাজিক পরিবর্তন মূলত সমাজের কাঠামো এবং এর উপাদানসমূহের বিদ্যমান অবস্থার রদবদল। বিশেষ করে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব অনেক ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী।

সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ (Impact of Social Change)

সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবকে দুইভাবে বিবেচনা করা যায়। প্রথমত সামাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব; দ্বিতীয়ত এর নেতিবাচক প্রভাব। এখানে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ইতিবাচক প্রভাব

১. শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব: সামাজিক পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মানুষ এখন আগের থেকে অনেক সচেতন। ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম সবাই তাদের ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পাঠায়। ফলে সমাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পরিবর্তে আধুনিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মানুষ অনেক বেশি সক্ষমতা অর্জন করেছে।

২. মানুষের জীবন ধারা : সামাজিক পরিবর্তনের ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির বিভিন্নমুখী ব্যবহারের প্রসার বেড়েছে। ফলে মানবজীবন হয়ে উঠেছে গতিশীল, সহজ ও শান্তিপূর্ণ।

৩. মর্যাদা: শিক্ষা, জ্ঞান ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সমাজে নাগরিকের মর্যাদা নির্ণীত হচ্ছে যা পূর্বে বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে নির্ণীত হত। বিভিন্ন শ্রেণি, পদমর্যাদা, ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে।

৪. নগর-সংস্কৃতির বিস্তার: বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষ করে, টিভি, মোবাইলফোন, ইন্টারনেট, নগরায়ন নগর-সংস্কৃতির বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ফলে মানুষ আরও বেশি আধুনিক, বাস্তববাদী ও সচেতন হয়ে উঠছে।

৫. আধুনিকতার বিস্তার: সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, আদর্শ, রীতিনীতি, জীবনবোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করছে।

নেতিবাচক প্রভাবসমূহ

১. অপরাধ প্রবণতা: বিদেশি অপসংস্কৃতি, উগ্রতা, পর্ণোগ্রাফি আমাদের সনাতন সামাজিক মূল্যবোধে পরিবর্তন আনছে। ফলে কিশোর অপরাধ এবং যৌন অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। যুব সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে সমাজ বিরোধী নানাবিধ কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

২. অপরিকল্পিত নগরায়ন ও নগর দারিদ্র্য: আধুনিক সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম ফল হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন ও নগর দারিদ্র্য। নানা কারণে মানুষ সনাতন ও কৃষি পেশা ছেড়ে কাজের আশায় শহরে ছুটে আসছে। কিন্তু অপর্যাপ্ত শিল্পায়ন ও ছুটে আসা মানুষের অদক্ষতার কারণে অনেকে প্রত্যাশিত কাজের সুযোগ পায় না। ফলে বস্তি এবং নগর-দরিদ্রতা নাগরিক জীবনের স্বস্তি ও শান্তি কেড়ে নিচ্ছে।

৪. গ্রামীণ ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে : সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ জীবনে অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। তাদের পেশা, আয়-উপার্জন, শিক্ষা-সচেতনতায় যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি জ্ঞাতি সম্পর্ক, সনাতন বিনিময় প্রথা ইত্যাদি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

৫. যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন: শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে একক পরিবারের সৃষ্টি হয়ে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফলে শিশু, নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধীসহ নির্ভরশীল সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হচ্ছে। পরিবারের ভাঙ্গনে সামাজিক নিরাপত্তবলয় ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে। পারিবারিক সম্পর্কে শিথিলতার ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক, পরিবারের অমতে নিজ পছন্দে বিয়ে, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি সমস্যা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

প্রযুক্তির উৎকর্ষ, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের কারণে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রভাব ইতিবাচক হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। ইতিবাচক প্রভাবে শিক্ষা, সচেতনতা ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হয়। মানুষ আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠে। নগর জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য মানব সমাজকে অনেক বেশি গতিশীল করে। নেতিবাচক প্রভাবে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সেই সাথে অপরিকল্পিত নগরায়ন, নগর দারিদ্র, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, যৌথ পরিবারে ভাঙন ইত্যাদি। এসব প্রভাবও সামাজিক পরিবর্তনের অপরিহার্য অংশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রাথমিকভাবে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব কয় ধরনের হতে পারে?

(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার

(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২। নিচের কোনটি সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব?

(ক) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা (খ) জলবায়ুর পরিবর্তন

(গ) যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন (ঘ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়নের (বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২ : ১। ঘ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩ : ১। ক ২। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

মিসেস স্বপ্না শহরে বসবাস করেন। প্রায় দশ বছর পর তিনি গ্রামে বেড়াতে এলেন। গ্রাম দেখে তিনি অনেকটা অবাক। কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুতের আলো। প্রায় সবারই ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন আছে। গ্রামের অনেকগুলো বাড়িতে পাকাঘর তৈরি হয়েছে। ছোনের ঘরের জায়গায় এসেছে টিনের ঘার। স্বাস্থ্য, চেহারা এবং পোশাক-পরিচ্ছদেও সবার একটি পরিপাটি ভাব। প্রায় সবাই স্কুল-কলেজে যায়। অনেকেই কৃষিকাজ ছেড়ে ব্যবসা-চাকরি-আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, গ্রামের বেশকিছু মেয়ে কলেজেও পড়াশোনা করে। এ গ্রামের মেয়েদের এখন আর বাল্যবিবাহ হয় না।

(ক) সামাজিক পরিবর্তন কী? ১
(খ) সামাজিক পরিবর্তনের চারটি উদাহরণ লিখুন। ২
(গ) সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো কি কি? ৩
(ঘ) সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

প্রাজ্ঞ তার দাদুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। রাতে দাদুর কাছে সে গল্প শুনতে চাইল। দাদু তার শৈশবের কথা শোনালেন। তখন, গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না, টিভি, ফ্রিজ মোবাইল ফোনের নাম মানুষ জানত না। অধিকাংশ পরিবার ছিল বেশ বড়। সেখানে বাবা-মা ছাড়াও দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, চাচাতো ভাই-বোন সবাই একত্রে বসবাস করত। পাড়া-প্রতিবেশী, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী একে অপরকে সহযোগিতা করত। তখন গ্রামে কোনো রাস্তা ছিল না। মানুষ হেঁটে, নৌকায় কিংবা পাল্কিতে করে চলাফেরা করত। শহরের সাথে গ্রামের তেমন যোগাযোগ ছিল না। প্রাজ্ঞ দাদুর বাস্তব জীবনের গল্প শুনে অবাক হয়ে গেল।

(ক) উদ্দীপকে দাদুর শৈশব ও প্রৌঢ়ত্বের ব্যবধান আসলে কী? ১
(খ) সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়? ২
(গ) সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো লিখুন। ৩
(ঘ) সামাজিক পরিবর্তন সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করে– ব্যাখ্যা করুন। ৪

ইউনিট ১৫

সামাজিক সমস্যা
Social problems

ভূমিকা : বিশ্বের কোনো সমাজই পুরোপুরি সমস্যামুক্ত নয়। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের সমাজে যেমন বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান ছিল, তেমনি আধুনিক সমাজেও নানা ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশের সমাজে একধরনের সমস্যা রয়েছে। আবার শিল্পোন্নত দেশের সমাজও কোনো না কোনো সমস্যায় আক্রান্ত। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও অনগ্রসর দেশ। এদেশের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা তথা দারিদ্র্য। অধিক জনসংখ্যাও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। নিরক্ষরতা এবং কর্মমুখী শিক্ষার অভাব বেকাত্ব বৃদ্ধি করছে। সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি সামাজিক শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। অপসংস্কৃতি ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে কিশোর-তরুণরা অনেক ক্ষেত্রে বিপথগামী হচ্ছে। জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আসক্তি সমাজে অস্থিরতা অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করছে। এসবই আমাদের সামাজিক সমস্যা। এসব সমস্যার নানা কারণ যেমন আছে, তেমনি আছে এর প্রতিকার। বর্তমান ইউনিটে সামাজিক সমস্যা, এর কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৫.১ : সামাজিক সমস্যা
পাঠ-১৫.২ : সামাজিক সমস্যার কারণ
পাঠ-১৫.৩ : সামাজিক সমস্যার ধরন
পাঠ-১৫.৪ : সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায়

পাঠ-১৫.১ সামাজিক সমস্যা
Social problems

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক সমস্যা কী?

সমাজে মানুষ কতকগুলো সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি সব সময় সঠিকভাবে কার্যকর থাকে না। কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যাতে সমাজের একটি বড় অংশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষ বিপন্ন বোধ করে। সমাজে কোনো বিষয়ে এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হলে তাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্ষতিকর, অস্বস্তিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ পরিস্থিতি।

সমাজবিজ্ঞানী হর্টনের (P. B. Horton) মতে, সামাজিক সমস্যা বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যা সমষ্টিগতভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজন হয়।

স্যামুয়েল কোয়েনিগ (Samuel Koenig) বলেছেন, সামাজিক সমস্যা হলো এমন ধরনের পরিস্থিতি যা সমাজ তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা কল্যাণের প্রতি হুমকিস্বরূপ এবং যে কারণে এগুলোর লাঘব বা উচ্ছেদের প্রয়োজন হয়।

ডেভিড ড্রেসলার বলেছেন, সামাজিক সমস্যা হল মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এমন একটি অবস্থা, যাকে সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত বলে মনে করে এবং প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা দূরীকরণে কর্মতৎপর হয়।

সুতরাং সামাজিক সমস্যা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত জীবন যাপনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ও সামাজিক অগ্রগতির প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশ। সামাজিক সমস্যা কোনো তাৎক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী বিষয় নয়। এটি অনেকটা দীর্ঘমেয়াদি, তবে সমাধানযোগ্য। তবে একটি সমস্যার সমাধান হলে আবার নতুন আরেকটি সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে।

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে থাকেন। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন:

১। অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর: সামাজিক সমস্যা এমন একটি অবস্থা যা মানুষের প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি করে এবং সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা স্ফীতি ইত্যাদি।

২। সমাজের অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করে: কোনো সামাজিক নাজুকতা যখন সমাজের অনেক মানুষকে প্রভাবিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ করে কেবল তখনই তাকে সামাজিক সমস্যারূপে গণ্য করা হয়।

৩। বস্তুগত ও মনোগত দিক: সামাজিক সমস্যার দুটো দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে বস্তুগত অপরটি মনোগত দিক। সমস্যার বস্তুগত দিক বলতে যা মানুষের বৈষয়িক ক্ষতি সাধন করে। ফলে মানুষের বাঞ্ছিত জীবনযাপন ব্যাহত হয়। যেমন দরিদ্রতার ফলে মৌলিক চাহিদাসমূহ যথাযথভাবে পূরণ হয় না। সমস্যার মনোগত দিক বলতে যা মানুষের মনে হতাশা, ক্ষোভ, উত্তেজনা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। দরিদ্রতার ফলে মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে দরিদ্র মানুষের মনে দুঃখ, হতাশা, ক্ষোভ ইত্যাদি জন্মে, যা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪। জনগণের সচেতনতা ও পরিবর্তনের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা: সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, কোনো ক্ষতিকর অবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ মানুষ সচেতন না হলে তার সমাধান সম্ভব নয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনো সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচনা করা যায়। তবে কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, সমাজের অধিকাংশ মানুষ সমাজের ক্ষতিকর অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ও তার মোকাবেলার জন্য সচেষ্ট না হলেও তা এক ধরনের সমস্যা। যেমন–একশ' বছর আগে এদেশের মানুষ নিরক্ষরতা সম্পর্কে সচেতন ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরক্ষরতা একটি সামাজিক সমস্যা ছিল।

৫। সমাধান যোগ্যতা: সামাজিক সমস্যা সাধারণত সামাজিক পরিবেশ থেকেই উদ্ভূত। ফলে সমস্যার কারণ নির্ণয় করে এর সমাধান দেয়া সম্ভব। সমাধান সম্ভব নয়– এমন কোনো বিষয়কে সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচনা করা যায় না। যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক সামাজিক সমস্যা নয়।

৬। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা: সমাজের বিভিন্ন বিষয়গুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই সামাজিক সমস্যাগুলোও একটি অপরটি দ্বারা প্রভাবিত। যেমন দরিদ্রতার ফলে স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। আবার স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি কর্মক্ষমতা হারিয়ে দারিদ্র্যের চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৭। সমাজ থেকে উদ্ভূত: সামাজিক সমস্যা বিধি-নির্ধারিত দুর্যোগ কিংবা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট কোনো পরিস্থিতি নয়। প্রতিটি সামাজিক সমস্যা ঐ সমাজ থেকেই উদ্ভূত এবং এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত বাস্তব কারণ থাকে। এ কারণসমূহ প্রধানত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। সমাজবিজ্ঞানীগণের মতে, সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে অপরাগতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে সামাজিক সমস্যা জন্মলাভ করে।

৮। স্থায়িত্ব: সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর স্থায়িত্ব। সামাজিক সমস্যা চিরস্থায়ী না হলেও একটানা এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। ক্ষণস্থায়ী এবং অনিয়মিত কোনো সামাজিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাকে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমেই সামাজিক সমস্যা নিরূপণ করতে হবে। তবে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক সমস্যায়ও পরিবর্তন আসতে পারে। পরিবর্তন হতে পারে সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যে। এটিই সমাজের নিরন্তর বাস্তবতা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সমস্যার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজের এক অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। উন্নত কিংবা দরিদ্র, শিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর, আধুনিক কিংবা অনগ্রসর সব সমাজেই সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সময় ও স্থানভেদে সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি আলাদা। সামাজিক সমস্যাসমূহ সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকেই উদ্ভূত। সমাজে নাজুকতা তৈরি করলেও এসব সমস্যা সমাধানযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়?

(ক) দারিদ্র্য (খ) বাল্যবিবাহ (গ) বিদ্যুৎসঙ্কট (ঘ) নিরক্ষরতা

২। সামাজিক সমস্যা সমাজের–

(ক) খুব অল্পসংখ্যা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে (খ) অধিকাংশ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে

(গ) সব মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে (ঘ) কোনো মানুষকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে না

পাঠ-১৫.২ সামাজিক সমস্যার কারণ
Causes of Social problems

উদ্দেশ্য **এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- সামাজিক সমস্যার কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যার কারণ।

সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি, তেমনি এর কারণও বহুমুখী। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কতগুলো কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো:

১। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা: বাংলাদেশ প্রায় ২১৫ বছর ঔপনিবেশিক শাসকদের অধীনে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাদের শাসনকালকে দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্য এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে নানাভাবে বাধাগ্রস্থ করেছে। ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয় তাতে সমাজে নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, জীবন-বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সমস্যার মূলে রয়েছে দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা।

২। মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণ: বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা। ২০১৬ সালে দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র ছিল যাদের পক্ষে মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়নি। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অভাবে সমাজে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আবার বৈধ উপায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অবৈধ উপায় যেমন পতিতাবৃত্তি, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি অবলম্বন নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ জনসংখ্যার আধিক্য। বাংলাদেশের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং তা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমান্তরালভাবে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি বহু সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগবলয়ে অবস্থিত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, নদীর ভাঙ্গন, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগে প্রতি বছরই দেশের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, পতিতাবৃত্তি, নৈতিক অধঃপতন, অতিমাত্রায় নগরমুখিতা (Urban migration), বস্তিসমস্যা ইত্যাদি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়।

৫। শিল্পায়ন ও নগরায়ন: অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সমাজ জীবনে নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবে পরিবারের ভাঙ্গন, কিশোর অপরাধ, সামাজিক বন্ধনে শিথিলতা, পতিতাবৃত্তি, বস্তিসমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

৬। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা: স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই বাংলাদেশে নানা ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন দেশে সামারিক শাসন বিদ্যমান থাকায় অধিকাংশ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নানাবিধ রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে সমাজে অপশক্তিসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এতে করে সন্ত্রাস, সম্পদ আত্মসাৎ, ঘুষ, কালোবাজারী ও চোরাচালানী, জঙ্গিবাদ-মৌলবাদী অপতৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল।

৭। সমস্যার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও প্রতিক্রিয়া: সমাজের প্রায় প্রতিটি প্রিতিষ্ঠানই পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। ফলে একটি সমস্যা অপর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্য সমস্যাকে জটিল করে তোলে। যেমন, দারিদ্র্যের ফলে নিরক্ষরতাসহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি নিরক্ষরতা ও অন্যান্য সমস্যাও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

৮। সম্পদের অসম বণ্টন: সম্পদের অসম বণ্টন সামাজিক সমস্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বাংলাদেশের মোট সম্পদের সিংহভাগ হাতেগোনা কিছু মানুষ ভোগ করে। বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষ আরো দরিদ্র হচ্ছে এবং ধনীর সাথে দরিদ্র মানুষের বৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পদের এ অসম বণ্টনের ফলেও নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

৯। অপসংস্কৃতির প্রভাব: আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মুক্ত গণ্যমাধ্যমের কল্যাণে আমাদের সংস্কৃতিতে অপসংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব পড়েছে। বিদেশী সিনেমা ও সিরিয়ালের অশ্লিলতা, পর্ণোগ্রাফি, প্রতারণা, সন্ত্রাসী তৎপরতা, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন ইত্যাদি আমাদের কিশোর ও তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করছে। তাদের নানা কার্যক্রম ও আচার-আচরণে সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

১০। আন্তর্জাতিক চক্র: বাংলাদেশের সব সমস্যা শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্টি হয়নি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারণেও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন অস্ত্র, সন্ত্রাস, মাদক ও স্বর্ণ চোরাচালান অভ্যন্তরীণ সমাজকাঠামো নানাভাবে প্রভাবিত করছে। এসব সমস্যার অনুষঙ্গ হিসেবে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-খারাবি, যৌনাচার ইত্যাদি অপরাধও বেড়ে চলেছে।

১১। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার: নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যে কোনো সমাজের জন্যই চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের প্রায় ৫০ ভাগ লোক নিরক্ষর, অসচেতন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এ কারণে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, যৌতুক প্রথাসহ বহু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

অনেক ক্ষেত্রে একটি সমস্যা নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন অধিক জনসংখ্যা কিংবা দারিদ্র্য আরো অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। বস্তুত সামাজিক সমস্যার কারণ বহুমুখী। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এছাড়া ছোট্ট ভূখণ্ডে বিশাল জনগোষ্ঠী, তাদের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে। অপসংস্কৃতি এবং আকাশসংস্কৃতিও সমাজে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্যার কারণ?

(ক) সম্পদের অসম বণ্টন (খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

(গ) পরিবেশ দূষণ (ঘ) ক ও খ উভয়।

২। অপসংস্কৃতির প্রভাবে–

(ক) সমাজে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে (খ) বেকারত্ব বাড়ছে

(গ) কিশোর-তরুণরা বিপথগামী হচ্ছে (ঘ) মাদকাসক্তি বাড়ছে

পাঠ-১৫.৩ সামাজিক সমস্যার ধরন
Types of Social problems

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যার ধরন।

সামাজিক সমস্যার ধরন (Types of Social problems)

সব সমাজের সামাজিক সমস্যা এক ও অভিন্ন নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় বৃদ্ধবয়সের নিঃসঙ্গ জীবন, বিবাবহবিচ্ছেদ বা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সেখানকার বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য এশিয়া অপেক্ষা ভিন্নতর। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারতসহ এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সামাজিক সমস্যার ধরন, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। এখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ক) দারিদ্র্য (Poverty): দারিদ্র্য হচ্ছে অর্থনীতির একটি নেতিবাচক অবস্থা। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, অসচ্ছলতা ও অক্ষমতা হলো দারিদ্র্য। আভিধানিক অর্থে, 'দারিদ্র্য' বলতে অভাব বা অনটনকেই বুঝায়। দারিদ্র্য মানে মৌলিক সামর্থ্যের অভাব। ন্যূনতম খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করতে না পারা হচ্ছে দারিদ্র্য। আয়ের স্বল্পতা, জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থতা, নিরাপত্তাহীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগের অভাবের মাধ্যমে দারিদ্র্যের প্রকাশ ঘটে। দারিদ্র্য পরিমাপে এবং এর স্বরূপ বিশ্লেষণে 'দারিদ্র্য সীমা' ধারণাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যারা দৈনিক ২১১২ ক্যালরির কম খাবার পায় তারা দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করে। আর যারা ১৬০০ ক্যালরিরও কম খাবার পায় তারা চরম দারিদ্র্যের শিকার। সমাজবিজ্ঞানী গিলিনের মতে, দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যাতে কোনো ব্যক্তি তার সমাজের অন্যদের সমমানে জীবন যাপন করতে পারে না এবং সে কারণে কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জনে অক্ষম। বস্তুত দারিদ্র্য নিরঙ্কুশভাবে কেবল আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত নয়। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা হচ্ছে দারিদ্র্য। বস্তুত দারিদ্র্য হচ্ছে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সম্পদ, শিক্ষা এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতা।

খ) বেকারত্ব (Unemployment): সাধারণত কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বেকারত্ব বলা হয়। কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক কাজ না করে অলস-অবসর সময় কাটায় তবে তাকে বেকার বলা যায় না। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান না হওয়াকে বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা হল বেকারত্ব। পঙ্গু, অক্ষম, কাজ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির কর্মহীনতা বেকারত্বের আওতায় পড়ে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মক্ষম মানুষ ছুটিছাটা বাদ দিয়ে যদি প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ পায়, তবে তাকে কর্মে নিযুক্ত ধরা যাবে। এর বাইরে যারা পড়েন তারা বেকার, অর্ধবেকার বা ছদ্মবেকার।

গ) মাদকাসক্তি (Drug addiction): মাদক দ্রব্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে মাদকাসক্তি। তরল মদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের হিরোইন, ইয়াবাসহ এলকোহল সমৃদ্ধ যে কোনো দ্রব্যের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আসক্তি বা আগ্রহকে মাদকাসক্তি বলে। গাঁজা, চরস যেমন নেশাদ্রব্য হিসেবে পরিচিত এবং ব্যবহৃত হয় তেমনি ফেনসিডিলসহ কিছু ঔষধও নেশাদ্রব্য হিসেবে বহুলপ্রচলিত। পথশিশু বা বস্তির দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা অনেকসময় পলিথিনের মধ্যে জুতার আঠা লাগিয়ে নেশা করে। টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে নেশার কথাও শোনা যায়। উপকরণ যা ই হোক না কেনো, কোনো কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নেশাদ্রব্য গ্রহণের বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাকে মাদকাসক্তি বলে।

ঘ) জনসংখ্যা সমস্যা (Population problem): সাধারণভাবে জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কোনো দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও চাহিদার তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়া। জনসংখ্যা তখনই সমস্যা যখন এটি কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে

ব্যাহত করে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাস এর মতে, কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় বেশি হলে তা জনসংখ্যা সমস্যা বা জনসংখ্যাস্ফীতি বলে। মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা। এর ফলে একটি দেশের মোট সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য থাকে। অধিক জনসংখ্যা দেশের আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবে কেবল জনসংখ্যার আধিক্যই সমস্যা সৃষ্টি করে না, কোনো দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যাও সমস্যার কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি তাই এসব দেশে জনসংখ্যাস্ফীতিই অন্যতম সামাজিক সমস্যা। অন্যদিকে কানাডা, জার্মানি, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক কম। ফলে এসব দেশে স্বল্প জনসংখ্যাই জনসংখ্যা সমস্যা।

ঙ) দুর্নীতি (Corruption): সাধারণ অর্থে দুর্নীতি হচ্ছে সততা, নীতি বা নৈতিকতা পরিপন্থী কাজ। ব্যাক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে দুর্নীতি। বস্তুত দুর্নীতি প্রায়শ ক্ষমতার সাথে যুক্ত। যে দুর্নীতি করে সে কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার অধিকারী। তবে সব ক্ষমতাধর ব্যক্তিই দুর্নীতিবাজ নন। ঘুষ লেনদেন, সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, চাঁদাবাজী, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি দুর্নীতি বলে পরিগণিত।

বাংলাদেশে আরো অসংখ্য সামাজিক সমস্যা রয়েছে। সাম্প্রতিক কালের জঙ্গিবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মৌলবাদ মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি (ইভটিজিং) বা নারীর প্রতি বৈষম্যও দেশের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। যৌতুক এবং বাল্যবিবাহের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি হলেও সমাজ থেকে এখনো এ সমস্যা পুরোপুরি দূরীভুত হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও বন্ধ হয়নি ভিক্ষাবৃত্তি। বস্তুত বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি দেশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক নয়। স্বল্পায়তনের এ দেশটিতে ষোল কোটি মানুষের বসবাস দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, বাসস্থান সঙ্কট ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাকে আরো তীব্র করে তুলেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

স্থান ও কালভেদে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো সমস্যা মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কিত; যেমন দারিদ্র্য। আবার কোনো কোনো সমস্যা জীবন-মান তথা ভালোভাবে বেঁচে থাকার সাথে সম্পর্কিত; যেমন দুর্নীতি। মাদকাসক্তির মত সমস্যা সমাজে অশান্তি ও নৈরাজ্য তৈরি করে। জনসংখ্যা সমস্যা আরো অনেক সমস্যাকে জটিল করে তোলে। যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি একটি সমাজের অনগ্রসরতার পরিচায়ক। সামগ্রিকভাবে প্রতিটি সামাজিক সমস্যাই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এসব সমস্যা নিরসন করতে না পারলে কোনো সমাজই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দৈনিক কত ক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণ করলে তাকে হতদরিদ্র বলা হয়?

(ক) ২২০০ ক্যালোরির কম (খ) ২০০০ ক্যালোরির কম

(গ) ১৮০০ ক্যালোরির কম (ঘ) ১৬০০ ক্যালোরির কম

২। ‘কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় বেশি হলে তা হবে জনসংখ্যা সমস্যা’– কে বলেছেন?

(ক) টমাস ম্যালথাস (খ) সিগমুন্ড ফ্রয়েড

(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

পাঠ-১৫.৪ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায়
Way-out of Preventing Social Problems

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায়, আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগের গুরুত্ব।

সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায় (Way-out of Preventing Social Problems)

সামাজিক সমস্যার যেমন বিভিন্ন ধরন রয়েছে, তেমনি এগুলো প্রতিরোধের উপায়ও পৃথক। দারিদ্র এবং মাদকাসক্তি, দুর্নীতি কিংবা জনসংখ্যা সমস্যা অভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী এর প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ করা আবশ্যক। তবে সামগ্রিকভাবে সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে। সব সমস্যাই সমাজ থেকে উদ্ভুত এবং তা সমাজের মানুষকেই প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্থ করে। এখানে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের কিছু সাধারণ উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১। সামাজিক গবেষণা: সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক তথ্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সামাজিক সমস্য প্রতিরোধের উপায় বের করা যায়। বিদ্যমান সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা, ঝুঁকি, সবলতা, দুর্বলতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সামাজিক সমস্যা নিরসনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব।

২। কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও সেবাখাতের সম্প্রসারণ: দারিদ্র্য নিরসন, বেকারত্ব হ্রাস এবং মাদকাসক্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান অপরিহার্য। এজন্য কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও সেবাখাতের সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য ছাড়াও অর্থকরী ফসল, শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে কৃষি উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন অপরিহার্য। যে দেশে যতবেশি শিল্পায়ন হয়েছে সে দেশ ততবেশি উন্নত। শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানুষের আয় বৃদ্ধি দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। পরিবহন, ব্যাংক-বীমা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন সেবাখাতের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন কেবল দারিদ্র্য নিরসন করবে না, দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৩। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার: আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে দারিদ্র্য নিরসন করা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার, আহরণ এবং পরিপূর্ণ ব্যবহার দেশের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। যেমন, বঙ্গোপসাগরে বিরাট মৎস্যভাণ্ডার, দেশের উর্বর ভূমি, জলাশয়, গ্যাসসহ খনিজ সম্পদের কার্যকর ও সমন্বিত ব্যবহার দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪। জনশক্তির উন্নয়ন ও সবার জন্য কর্মসংস্থান: দেশের বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম লোকের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে উৎপাদনশীল জনশক্তিতে পরিণত করা যায়। দেশে-বিদেশে এদের কর্মসংস্থান হলে দেশের দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে। নারীসহ কর্মক্ষম সবার জন্য শিক্ষা এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে অনেক সামাজিক সমস্যা হ্রাস পাবে।

৫। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: অক্ষম, অসহায়, বেকার এবং বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতির শিকার নির্ভরশীল মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান দারিদ্র্য-বিনাসী কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সরকারের ‘একটিবাড়ি একটি খামার’, ‘আশ্রয়ন’ বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, দুস্থ নারী, দরিদ্র গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী জন্য ভাতা ইত্যাদি কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক। এছাড়া ভিক্ষুক, বিকলাঙ্গ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থান তৈরি করে সমাজের মূলধারায় পুনর্বাসন করা করা হলে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৬। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম এবং উপার্জনক্ষম করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। দেশে-বিদেশে যেখানেই হোক, মানসম্মত মজুরির জন্য বিশেষ দক্ষতা থাকা জরুরি। এজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষভাবে দক্ষ করে তুলতে পারলে সামাজিক সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

৭। গণতন্ত্র ও সুশাসন: নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র দেশের অনেক সামাজিক সমস্যা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেকোনো দেশ ও সমাজের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

৮। জনসচেতনতা: অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য জনসচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সচেতনতা পরিবারে যেমন অপরিহার্য, তেমনি সমাজেও। মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, অধিক জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যা সমাধানে জনসচেতনতা অপরিহার্য।

৯। সামাজিক আন্দোলন: সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক আন্দোলন একটি কার্যকর উপায়। সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐকবদ্ধভাবে কোনো সমস্যা প্রতিরোধে সোচ্চার হলে সফলতা অনিবার্য। দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সমস্যা নিরসনে সামাজিক আন্দোলনই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

১০। আইনের কঠোর প্রয়োগ: কিছু সামাজিক সমস্যা সমাজ ও আইনের পরিপন্থী। অর্থাৎ এ ধরনের সমস্যা যার বা যাদের দ্বারা সংঘটিত হবে তাদেরকে আইনের আওতায় শাস্তি পেতে হবে। দুর্নীতি, মাদকসেবন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক লেনদেন ইত্যাদি প্রতিরোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর।

সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন ও বিধিবিধান প্রয়াগের গুরুত্ব

১৫.৩ নম্বর পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এসব সমস্যাকে মোটাদাগে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ক) কিছু সমস্যা দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ এ ধরনের সমস্যা নিমজ্জিত হতে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুব বেশি ভূমিকা রাখে না। মানুষ অনেকটা পরিস্থিতির শিকার হয়। যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব। খ) কিছু সমস্যা মানুষ নিজেই তৈরি করে এবং এগুলো সামাজিক রীতিনীতি এমনকি আইনের পরিপন্থী। অর্থাৎ এমন কিছু সামাজিক সমস্যা রয়েছে যেগুলো সমাজের জন্য অবাঞ্ছিত এবং মানুষের আচরণের সাথে সম্পর্কিত। মানুষ ইচ্ছা করলেই এগুলো পরিহার করতে পারে এবং সেটিই কাম্য। যেমন মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। এ ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন এবং বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়। কেউ আইন অমান্য করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। অর্থাৎ যেসব সামাজিক সমস্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেসব সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন এবং বিধিবিধান অত্যন্ত কার্যকর।

দুর্নীতি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক আদান-প্রদান, প্রকাশ্যে মাদকসেবন বা মাতলামি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে কেবল জনসচেতনতা যথেষ্ট নয়। আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যা প্রতিরোধ করা জরুরি। দুর্নীতিবাজের শাস্তি না হলে এর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। মাদকদ্রব্য বহন, বিপনন, সেবন প্রতিটি পর্যায়ে আইনের কঠোর প্রয়োগ হলে মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়। বাল্যবিবাহ, যৌতুক লেনদেন, নারী নির্যাতন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনগত প্রতিকার অপরিহার্য। নিরক্ষর, অসচেতন কিংবা বিশেষ পরিস্থিতির শিকার যেকোনো অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে আগ্রহী হতে পারেন। কাউন্সেলিং করেও তাদেরকে অনেক সময় নিবৃত করা যায় না। কিন্তু যদি বলা হয়, এটি বেআইনী, পুলিশ এসে আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, বিচারে এক বছরের জেল হতে পারে তবে বাল্যবিবাহ থেকে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা বিরত থাকতে পারেন। যৌতুক বা মাদক সেবনের ক্ষেত্রেও এ প্রক্রিয়াটি কার্যকর।

যেসব সামাজিক সমস্য মানুষের আচরণের সাথে যুক্ত সেগুলো প্রতিরোধের জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ জরুরি। আইনের মাধ্যমে সমস্যাটিকে প্রথমে অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর আইন অমান্য করে অপরাধ সংঘটিত হলে সে জন্য অপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড প্রদান করা হতে পারে। যেমন নির্ধারিত স্থানে (পাবলিক প্লেসে) প্রকাশ্যে ধূমপান এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত প্রকাশ্যে ধূমপানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, ততদিন অন্যের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ধূমপায়ীরা প্রকাশ্যে ধূমপান থেকে বিরত হননি। দুর্নীতি, মাদকসেবন, যৌতুক লেনদেন, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরূপ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। মানুষ স্বভাবত 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম'। কেবল ভালো কথায় দুষ্টু মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা যায় না। এ জন্যই আইন করে অপরাধের শাস্তি বিধানের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায়গুলো একটি ছকে লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক সমস্যা সমাজের এক অনিবার্য বাস্তবতা। তবে এটি দুর্জয় নয়। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ বা দূর করতে অনেক কার্যকর উপায় রয়েছে। সমাজের মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে কোনো সমস্যাই স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারে না। সমস্যা নিয়ে গবেষণা, সমস্যার কারণ নিরূপণ, প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন, শিক্ষা, সচেতনতা, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমস্যা প্রতিরোধে সরকারের সদিচ্ছা থাকতে হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শাস্তির বিধান করে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্য নিরসনে অধিকতর কার্যকর?

(ক) অকঠামো উন্নয়ন (খ) শিক্ষা ও জনসচেতনতা

(গ) আইন ও বিধিবিধান (ঘ) খ ও গ উভয়

২। কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ বেশি কার্যকর?

(ক) যেসব সমস্যা দ্বারা মানুষ আক্রান্ত (খ) যেসব সমস্যার সাথে মানুষের আচরণ এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা যুক্ত

(গ) যেকোনো সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেই (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১৫.১ :** ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১৫.২ :** ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১৫.৩ :** ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১৫.৪ :** ১। ঘ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

কুলসুম-উমর আলি দম্পতির সাত ছেলেমেয়ে। উমর আলি ক্ষুদ্র ব্যবসা করে। কুলসুমও নানাভাবে সংসারে সাহায্য করে। কিন্তু তাদের ‘নুন আনতে পান্তা ফুরায়’ অবস্থার অবসান হয়নি। তাদের ছেলে-মেয়েরা কেউই স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। বড় এবং মেজ ছেলে চেষ্টা করেও ভালো কাজের সন্ধান পাচ্ছে না। উমর আলি তার বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে। যৌতুক দিতে না পারায় অনেক নির্যাতনের পর মেয়েটি আবার বাবার বাড়ি ফেরৎ চলে এসেছে। সবার ছোট মেয়েটি ভীষণ রোগা। উমর আলির স্ত্রীরও শরীর-স্বাস্থ্য ভালো নেই। অসুস্থ স্ত্রী এবং স্বামী পরিত্যাক্তা মেয়ের নামে সে ভিজিডি-ভিজিএফ কার্ডের জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গ্রামের মেম্বারকে দুই হাজার টাকা দিতে না পারায় সে কার্ডও উমর আলি করাতে পারেনি। সবমিলিয়ে উমর আলি এক দিশেহারা অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

(ক) সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ১
(খ) উদ্দীপকটিকে কয় ধরনের সামাজিক সমস্যা বর্ণিত হয়েছে? কি কি? ২
(গ) সামাজিক সমস্যার পাঁচটি কারণ লিখুন? ৩
(ঘ) সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। নিচের চিত্রোদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

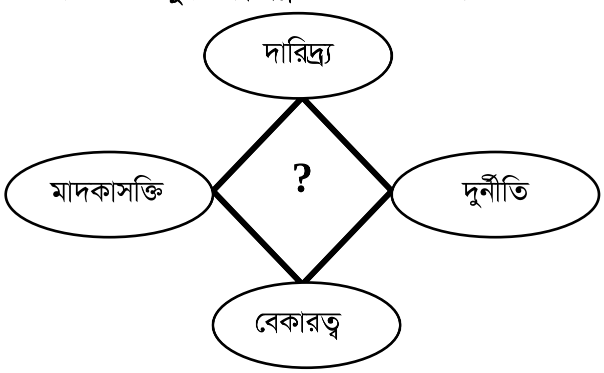

(ক) প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থলে কী লিখতে হবে? ১
(খ) সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। ২
(গ) বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলো কি কি? ৩
(ঘ) সামাজিক সমস্যার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪